আদিবাসী লোককথা

দ্বিতীয় খণ্ড

আদিবাসী লোককথা

দ্বিতীয় খণ্ড

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

পরিবেশক
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ : ২৫ মার্চ ১৯৫৮

প্রকাশক
অরুণ ঠাকুর
গীতা প্রকাশনী
৫৪/১ সি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০০৪

মুদ্রাকর
জি. আর. টি প্রিণ্টার্স,
৫৪/১ সি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০০৪

প্রচ্ছদপট
শংকর দাস

শ্রীপুলকেশ বিশ্বাসকে

যার উদার সাহচর্যে প্রথম আদিবাসী-সান্নিধ্যে এসেছিলাম

এই লেখকের অন্যান্য বই

আদিবাসী লোককথা (প্রথম খণ্ড)

লোকসমাজ ও আগুনের লোককথা

লোকসমাজ ও পশুকথা

আদিবাসী লোকসাহিত্যে বিদ্রোহী মন

নানান দেশের লোককথা

দশদিগন্তের পশুকথা

টুসু : ইতিহাসে ও সংগীতে (সম্পাদিত)

সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব

প্রস্তাবনা

আদিবাসী লোককথা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। এই খণ্ডে ফিলিপাইনস্, মাইক্রোনেশিয়া, মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার সাতাশটি আদিবাসী লোককথা সংকলিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের সমস্ত লোককথাই প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ের অন্তর্গত। প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে আফ্রিকা মহাদেশ ও ভারতের আদিবাসী লোককথা এবং তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে আমেরিকা মহাদেশের আদিবাসীদের লোককথা।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পরে আড়াই বছর কেটে গিয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার লোককথা সংগ্রহ করতে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার সংগ্রহের উৎস হল লোককথার পুরনো সংকলন। এগুলি সবই ইংরেজি ভাষায় অনূদিত। পুরনো সংকলনের ওপরে নির্ভর করেছি, কেননা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এইসব দ্বীপময় এলাকায় নানাভাবে বহির্বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়তে শুরু করে। আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির আদানপ্রদান খুবই কাম্য, এঁদের মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার অভিপ্রেত। তবু পুরনো সংগ্রহের ওপরে বেশি নির্ভর করেছি। কেননা, পুরনো কালের ঐতিহ্যের কিছু পরিচয় অন্তত পাওয়া যাবে এইসব গল্পে, সামাজিক-অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনার রেশ রয়ে গিয়েছে এইসব লোককথায়। আমাদের গ্রন্থাগারগুলিতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী লোককথার সংকলন অতি অল্প। যদিবা লোককথা পাওয়া গেল, আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের তথ্য পাওয়া আরও কঠিন। এই কারণেই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে বেশ দেরি হল।

এই খণ্ডে যে সাতাশটি লোককথা রয়েছে, সেগুলি পৃথিবীর আর কোন্ কোন্ দেশের লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে সেগুলোর বিস্তৃত অনুসন্ধানে দেখেছি, একই লোককথার বিভিন্ন বিচিত্র রূপ। প্রচলিত অর্থে একে লোককথার 'মাইগ্রেশন' বলতে হয়, যদিও আধুনিক নৃবিজ্ঞানী 'মাইগ্রেশনের' তত্ত্বকে স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, অসম সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন ঐতিহ্যের মানুষ নিরপেক্ষভাবে

একইভাবে চিন্তা করেন যার বাস্তব প্রকাশ মৌখিক লোককথায়। তবে, নৃবিজ্ঞানীদের এই যুক্তি মেনে নিয়েও বলতে হয়, লোককথার মিল দেখে তুলনামূলক সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়েও এই খণ্ড প্রকাশে বেশ দেরি হল।

দ্বীপময় এলাকার এইসব লোককথায় ব্যাপকভাবে জাপান ও চীনের লোককথার গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি। সামন্তপ্রভুদের নির্যাতনে ও ভয়াবহ খাদ্যাভাবে কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই চীন-জাপানের লক্ষ লক্ষ মানুষ এইসব দ্বীপে আসতে থাকেন। যেমন হাজার বছর আগে মাওরি আদিবাসী পলিনেশিয়ার মধ্যাঞ্চল থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন সুদূর নিউজিল্যাণ্ডে। এই এলাকায় এভাবে নয়া বসত গড়ে উঠেছিল, একদিন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। চীন-জাপানের সেই ঐতিহ্য কি অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল? কিছু পরিমাণে যে হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে আবার লোককথার 'মাইগ্রেশন' তত্ত্বকে স্বীকার করতে হয় যা নৃবিজ্ঞানীদের ধারণায় সঠিক নয়। এই প্রশ্নটি আমাকে ভাবিয়েছে কিন্তু এর উত্তর দেবার মতো বৈদগ্ধ্য আমার নেই। গ্রন্থের ভূমিকায় এই এলাকায় মানুষের 'মাইগ্রেশন' বিষয়ে সাধ্যমতো আলোচনা করেছি। মনে হয়েছে, মানুষের মতো এমন যাযাবর প্রাণী আর কে আছে?

অবিভক্ত বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীগোপীনাথ সেন, অকাদেমি অব ফোকলোরের পল্লব সেনগুপ্ত, দুলাল চৌধুরী, দীনেন্দ্রকুমার সরকারের কাছ থেকে নিরন্তর অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তপন চক্রবর্তী ও সৃজন সেনের আন্তরিকতা স্মরণ করি। এঁরা সকলেই আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু।

আদিবাসীদের সম্পর্কে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা অতি সামান্য, শ্রদ্ধা সীমাহীন। তাঁদের উন্নত ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির কাছে আমাদের ঋণ অনেক। তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে একইভাবে জীবনযাপন করার তত্ত্বে আমি বিশ্বাসী নই। তাঁরা আধুনিক শিক্ষা লাভ করবেন, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তুলবেন আবার নিজেদের মহান ঐতিহ্য সম্পর্কেও সচেতন থাকবেন,—এই ধারণায় আমি বিশ্বাসী। সব দিক থেকে তাঁদেরও আধুনিক হয়ে উঠতে হবে। যেসব আদিবাসীর কাছে লোককথা শুনে উদ্দীপিত হয়েছি তাঁদের প্রণাম জানাই।

১৭/২৮ কে. পি. রায় লেন
কলকাতা-৭০০০৩১

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

ভূমিকা

ঃ রামধনুর কোলে আকাশকন্যা হিনা বসে রয়েছে। হঠাৎ তার গলার মুক্তোর মালার সুতো ছিঁড়ে গেল। মুক্তোগুলো অনেক নিচে ঘন নীল সাগরের বুকে ছড়িয়ে পড়ল। এক একটি মুক্তো জেগে উঠল দ্বীপ হয়ে, সাগরের বুকে অনেক দ্বীপ।

ঃ আকাশের দেবীর শ্বেতশুভ্র দুটি বুক টনটন করে উঠল। পবিত্র দুধে বুক দুটি ভরা। নিচের দিকে চেয়ে রয়েছে দেবী। বিন্দু বিন্দু দুধ ছড়িয়ে পড়ল সাগরে। এক এক বিন্দু দুধ জেগে উঠল দ্বীপ হয়ে, অনেক দ্বীপ।

ঃ আকাশকুমারী চেয়ে আছে নিচে অথৈ সাগরের পানে। বেদনায় চোখদুটি অশ্রুসজল। আহা! কোথাও মাটি নেই। ডাগর চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ল। অনেক। জেগে উঠল দ্বীপের পরে দ্বীপ।

ঃ সাদা মেঘের টুক্‌রো টুক্‌রো খণ্ড। আকাশের বুকে মেঘের খেলা। প্রতিচ্ছবি পড়েছে নিচের নীল সাগরজলে। কোথায় থাকবে মানুষ? কুয়াশাকুমারী মেঘখণ্ডগুলোকে পাঠিয়ে দিল সাগরের জলে। মেঘের আকারে দ্বীপ ভেসে উঠল। অনেক দ্বীপ।

ফিলিপাইন্‌স্‌ মাইক্রোনেশিয়া মেলানেশিয়া ও পলিনেশিয়া অর্থাৎ ওশিয়্যানিয়ার লোকপুরাণে এই এলাকার হাজার হাজার দ্বীপের জন্মকথা এইভাবে কাব্যময় ভাষায় বিধৃত হয়ে রয়েছে। দ্বীপময় এলাকার মানুষের কবিমনের অপরূপ পরিচয়। আজও পরব-উৎসবের সময় তাদের মিহি মিষ্টি সুরে ঝরে পড়ে এই কাব্যকথা, অতীতের মহান ঐতিহ্যের গাথা। অথচ হাজার প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মানুষের অমানবিক অবিচার-অত্যাচার আর বারবার বাসভূমি পালটানোর মতো দুঃসহ বেদনা তাদের সহ্য করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। তবু, ঐতিহ্যের আশ্চর্য সঞ্জীবনী শক্তি,—শত নির্মম পাষাণ-আঘাতেও সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করা যায় নি। অজেয় মানুষ অপরাজেয় লৌকিক ঐতিহ্যকে লালন করে চলেছেন।

রাতের আকাশে যেমন অসংখ্য তারা ফুটে ওঠে, ওশিয়্যানিয়ায় তেমনি অগুণতি দ্বীপের সমাহার। ব্যাপ্ত প্রশান্ত মহাসাগরের উদার বুকে বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দ্বীপময় ভূমিখণ্ড। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দ্বীপ নিউ গিনি আবার পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া এই এলাকাতেই রয়েছে।

তিরিশ লক্ষ বর্গ মাইল জুড়ে বিচিত্র গাছপালা-পশুপাখির দেশ অস্ট্রেলিয়া এই দ্বীপময় এলাকার বৈশিষ্ট্য বহন করছে না। অস্ট্রেলিয়ার পরিচয় আলাদাভাবে দিতে হবে।

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপময় জগৎ অন্য ধরনের। বিশাল উন্মুক্ত সাগর যা, পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে। বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলির মানুষকে এই সাগর যেমন বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে আবার তেমনি এক মানবিক সেতুবন্ধনে ঘনিষ্ঠও করে তুলেছে। সাগরের ঢেউ, প্রকৃতি, ঝড়ো আবহাওয়া, গাছপালা সামুদ্রিক খাদ্যদ্রব্য এলাকার মানুষকে প্রায় একই সংস্কৃতির সূত্রে আবদ্ধ করে রেখেছে। এখানেই রয়েছে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি দ্বীপ, আবার প্রবাল দ্বীপ। সাগরের পারে রয়েছে সবুজ বনানীতে ঢাকা পাহাড়-পর্বত। মেলানেশীয় নিউ আয়ারল্যাণ্ডের ৩৭০ মাইল দূরে সবচেয়ে কম জনবসতিপূর্ণ ক্ষুদ্রতম দ্বীপ কাপিন্‌গারান্‌গি রয়েছে। এর আয়তন আধ বর্গমাইলের সামান্য বেশি, সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে মাত্র দশ ফিট উঁচু। নিরক্ষবৃত্তের দশ ডিগ্রি দক্ষিণে দুটি বিচিত্র দ্বীপ রয়েছে। মাঝখানে সমুদ্রের ব্যবধান মাত্র পঁচিশ মাইল। দ্বীপদুটি হল মানিহিকি ও রাকাহান্‌গা। দুই দ্বীপের অধিবাসী একই জনগোষ্ঠী। পালা করে তারা এক এক দ্বীপে কিছুকালের জন্য থাকে। একটি দ্বীপ যখন জনশূন্য থাকে তখন সেখানে বেড়ে ওঠে শস্য-ফল-মূল। আবার তারা চলে আসে ছেড়ে-আসা দ্বীপে। ভুলে-যাওয়া সেই কোন্‌ কাল থেকে এই রীতি চলে আসছে।

ওশিয়্যানিয়াকে তিনটি ভৌগোলিক এলাকায় বিভক্ত করা যায়। মেলানেশীয় দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম বলয়, উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার মাইক্রোনেশীয় ছোট ছোট দ্বীপ এবং পলিনেশিয়া যার মধ্যে নিউজিল্যাণ্ড ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার অসংখ্য দ্বীপও যুক্ত রয়েছে। এইসব এলাকার মানুষজনের সাংস্কৃতিক-দেহগত-ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ

করলে দেখা যাবে, এক জটিল জনবিন্যাস ও বসতি। গোটা এলাকায় ঘটেছে ব্যাপক মাইগ্রেশন ও বিভিন্ন জনজাতির মিশ্রণ। কিভাবে ঘটল এই জটিল জনবিন্যাস ?

নৃবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, দুই থেকে আড়াই হাজার বছর আগে এক বিরাট জনগোষ্ঠী ইন্দোনেশিয়া থেকে মাইক্রোনেশিয়ার পথ বেয়ে পলিনেশীয় দ্বীপগুলিতে এসে উপস্থিত হয়। তাদেব আদি সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে এই এলাকায়। ধীরে ধীরে তারা গোটা এলাকায়, এমন কি বিচ্ছিন্নভাবে মেলানেশিয়ার কিছু দ্বীপেও, উপনিবেশ গড়ে তোলে। ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা এই মানুষদেব মূল কেন্দ্র ছিল বর্তমানের সোসাইটি দ্বীপ, লোকপুরাণের ভাষায় ওপোয়া বা হাওয়াইকি। এখান থেকেই পুরনো সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। ঐতিহ্য বহুকাল ধরে প্রায় একই পর্যায়ে ছিল। ইউরোপের সংস্পর্শে আসার আগে পযন্তও পলিনেশীয় ব্যবহারিক জীবনচর্যার মূল কাঠামো ছিল নব্য প্রস্তর যুগেব বস্তুগত সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা। অথচ পুরনো ঐতিহ্যের মহান সম্পদ তাবা ধবে রেখেছিল তাদের মৌখিক সাহিত্যে। মাঝখানে কোনো বিপর্যয়ে তাদেব মানসিক অগ্রগতি বোধহয় ব্যাহত হয়েছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে জনগোষ্ঠী এসেই এই বিশাল এলাকা বসতিপূর্ণ করে তুলল এ ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছিল ঠিকই, তাদেব উন্নত সংস্কৃতিব প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়েছিল ঠিকই,—কিন্তু দ্বীপময় এলাকায়ও কিছু মানুষ, আদি বাসিন্দা ছিল। মিশ্র সংস্কৃতি তাই গড়ে উঠতে পেরেছিল, যেমন ঘটেছে মাওরিদের ক্ষেত্রে। তবে, এটা আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবীর যে কয়েকটি এলাকায় সবচেয়ে শেষে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে তার মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার এই অংশ অন্যতম। আর এও সত্য, সংগঠিতভাবে এখানে মাইগ্রেশন হয়নি, বরং বিক্ষিপ্তভাবে ধীরে ধীরে জনজাতিরা এখানে এসেছে।

ইতিহাসের যেটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ মিলেছে তাতে বলা যায়, প্রথম উপনিবেশ-বাদীরা হল কৃষ্ণকায় খাটো কুঞ্চিত-কেশ নেগ্রিটো গোষ্ঠী ও হালকা দেহবর্ণ বিশিষ্ট ঢেউ-খেলানো চুল যাদের সেই আইনু গোষ্ঠীর মানুষ। অস্ট্রেলিয়া, নিউ গিনি ও মেলানেশিয়াব কিছু এলাকা ছাড়া ওশিয়্যানিয়ার মানুষ সাধারণত কৃষিজীবী। তারা ছোট ছোট ভূমিখণ্ডে মিষ্টি আলু, চুবড়ি আলু জাতীয় শস্য ফলায়। তারা কুকুর-শুয়োর-মুরগী পোষে। যদিও মজার ব্যাপার,

সব দ্বীপে এখনও এসব পোষা জন্তু পৌঁছয় নি। যেমন নিউজিল্যাণ্ডের মাওরিদের মধ্যে শুয়োর কিংবা মুরগী এখনও অজানা প্রাণী।

এর পরবর্তী কালে এই এলাকায় পৌঁছয় হালকা রঙের অসট্রোনেশীয়, ককেশীয়-মঙ্গোলীয় মিশ্রণজাত জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রভাব এলাকায় সুদূরপ্রসারী হয়েছে। এরাই সমুদ্র-পোতের জটিল কারিগরীবিদ্যা তাদের শেখায়। আজকের ওশিয়ানিয়ার ভাষাগত বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক কাঠামো এদেরই সৃষ্টি। এরা মাইক্রোনেশিয়ায়ও বসতি গড়ে তোলে। এত সব জনজাতির মিলনের ফলেই জটিল জনবিন্যাস গড়ে ওঠে।

দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে নতুন বসতি গড়ে তোলার পেছনে কাজ করেছিল জনসংখ্যার আধিক্য, যুদ্ধে পরাজয়, ক্ষমতার লড়াই, শাসক দলের অত্যাচার, সুদূরের নেশা। এদের মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্যেও এসবের হদিস পাওয়া যাচ্ছে। কারণ যাই হোক না কেন, যখন তারা নতুন দ্বীপে পাড়ি জমাল, সেখানকার আদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলন বা সংঘর্ষের অবসানে এক নতুন জীবন গড়ে তুলল। অন্য দ্বীপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক অভিনব জীবন-কাঠামো গড়ে তুলল। বহু শতাব্দী ধরে চলল তাদের এই প্রায় একই ধরনের জীবনযাপন। চিন্তায় বয়ে যেতে লাগল পুরনো ঐতিহ্যের স্মৃতি। নতুন কোনো জনগোষ্ঠী এসে যদি তাদের বিতাড়িত করত, তবে আবার অকূল দরিয়ায় নতুন বসতির সন্ধান চলত। যদি বিতাড়িত না করত, তবে আর একটি সংস্কৃতি মিলেমিশে যেত।

এমনি করে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ভাঙা-গড়া চলল। অনেকাংশে স্থিতিও এসে গিয়েছিল। এমন সময় এল নতুন অভিযাত্রী দল। পুরনো কাল হল শেষ। এল ইউরোপীয় অভিযানকারী। প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে এলেন মাজেল্যান। ১৫২১ খ্রীস্টাব্দে তিনি নোঙর ফেললেন মাইক্রোনেশিয়ার উত্তরে মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের গুয়াম দ্বীপে। নতুন রক্তাক্ত বিষাদময় ইতিহাস শুরু হল।

মাইক্রোনেশিয়া

মাইক্রোনেশিয়ার অর্থ ছোট দ্বীপপুঞ্জ। চারটি দ্বীপপুঞ্জের গুচ্ছ নিয়ে মাইক্রোনেশিয়া। মারিয়ানা, ক্যারোলিন, মার্শাল ও গিলবার্ট। মাইক্রো-নেশিয়ার চারপাশের এলাকা বরাবর একটি রেখা টানলে সেটা দেখতে হবে

ডিম্বাকৃতির মতো। এর উত্তর দিকে কাসান, মিনামি তোরি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণে মেলানেশিয়া, পূর্বদিকে ফিলিপাইনস্ ও পশ্চিমে পলিনেশিয়া।

ম্যাজেলান যখন প্রথম এখানে আসেন তখন এখানকার আদি বাসিন্দা বলতে ছামোরো আদিবাসী। এরা থাকত মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে। ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে এই এলাকায় স্পেনের সাত্যকার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। তখন ছামোরো আদিবাসীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। ১৭১০ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ মাত্র ৪২ বছর পরে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র সাড়ে তিন হাজারে। শত শত বর্ষের সামুদ্রিক ঝড় যে প্রাণহানি ঘটাতে পারেনি, নতুন উপনিবেশবাদীদের বর্বর হত্যাকাণ্ড তাই সম্ভব করে তুলল। ছামোরোরা পাশের ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জে পালিয়ে গেল এবং কোনোরকমে টিকে থাকল। এর কিছুকালের মধ্যেই গুয়াম দ্বীপসহ মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ জনমানবহীন হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের শেষদিকে আবার বসতি শুরু হয়। অল্প সংখ্যক ছামোরো, ফিলিপিনো, স্পেনীয় এবং জাপানীরা গড়ে তোলে এক মিশ্র সংস্কৃতি। এই এলাকা হয়ে উঠল স্পেন, জার্মানী, জাপান, গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। অফুরন্ত সামুদ্রিক তিমি ঝিনুক-শঙ্খ, ফসফেট, নারকেল ও মাছের যোগান এদের লোভ বাড়িয়ে দিল। অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে মাইক্রোনেশিয়া যেন ব্যবসার মৃগয়াক্ষেত্র। তারা গড়ে তুলল সমুদ্র বন্দর, বিমানবন্দর ও কেব্‌ল্‌ স্টেশন। ছামোরো আদিবাসীদের মতো এমন বিপর্যয়ের মুখে আর কাউকে পড়তে হয়নি।১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে পর্যন্ত কয়েকটি ছোট দ্বীপ এদের থাবার বাইরে উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু এই সময়েই সব দ্বীপ তাদের লুণ্ঠনের আওতায় এল, এমন কি অতি ক্ষুদ্র বলয়াকৃতি বিকিনি প্রবাল দ্বীপ পর্যন্ত। আদিবাসী সংস্কৃতি ধ্বংসের কাজটি সম্পূর্ণ হল।

মাইক্রোনেশীয় লোকবথা

সাড়ে তিনশ' বছর ধরে এই এলাকার আদিবাসীদের সংস্কৃতির ওপরে প্রচণ্ড বিপর্যয়কর আঘাত এসেছে। ক্ষতি হয়েছে অনেক। তবু ঐতিহ্য একেবারে নিশ্চিহ্ন করা যায়নি। লৌকিক সংস্কৃতির প্রাণশক্তি এমনই দুর্বার। লুণ্ঠনকারীরা যেমন একটি দেশে আসে তেমনি তাদের পথ বেয়ে কিছু মহৎ মানুষও আসেন। এদের হৃদয় উদার, চিন্তা মানবিক। এদের অক্লান্ত

পরিশ্রমেই আদি বাসিন্দাদের সংস্কৃতি ও মৌখিক ঐতিহ্যের পরিচয় আমরা পাই। সব পরাধীন দেশেই এইসব উদার মানুষের সাক্ষাৎ মিলেছে।

মাইক্রোনেশিয়ার আদিবাসীদের লোককথার বিশাল ভাণ্ডারের বেশির ভাগই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছে। তবু প্রথম দিকের কিছু মহৎ ভ্রমণকারী, মিশনারী ও প্রশাসকের চেষ্টায় অনেক লোককথা সংগৃহীত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় অসাধারণ দক্ষ প্রশাসক স্যার আর্থার গ্রিম্ব্ল্-এর। গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মৌখিক সাহিত্যকে তিনি পরম যত্নে নথিভুক্ত করে যান।২ পরবর্তী কালে আদিবাসীদের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন সি. আই. এম. এ অর্থাৎ কো-অর্ডিনেটিং ইনভেস্টিগেশন অব মাইক্রোনেশিয়ান অ্যানথ্রোপলজি।

কিন্তু আদিবাসীদের সংস্কৃতি বিশেষ করে তাদের লোকপুরাণ সংগ্রহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন জার্মান ক্যাথলিক মিশনারী ও জার্মান বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীদল। এরা ১৯০৮-১০ সালের মধ্যে ব্যাপক সমীক্ষা ও সংগ্রহের কাজ করেন এবং অনেকগুলি খণ্ড প্রকাশ করেন। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে ভাইকিং ফাণ্ডও গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করে অনেককিছু সংগ্রহ করেন। এছাড়া আর. বি. ডিক্সন, ক্যাথারিন লুওমালা, এল. টমসন ও পি. এল. বোলিগ বিংশ শতাব্দীতে এই এলাকার সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রামাণিক সব গ্রন্থ লিখেছেন।

অন্য এলাকার সাংস্কৃতিক প্রভাব ও রক্তের মিশ্রণ ঘটলেও এখনও এক লক্ষের ওপর মানুষ আদিবাসী সংস্কৃতিকে তাদের ঐতিহ্যে পালন করে চলেছেন। এদের ভাষা মালয়ী-পলিনেশীয় ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত. মিশ্রণের ফলে স্পষ্ট দেহগত কোনো বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে না। তবু পলিনেশীয়-মেলানেশীয় জনগোষ্ঠি থেকে এদের আলাদাভাবে চেনা যায়।

মাইক্রোনেশীয় লোককথার যে সব সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে লোকপুরাণের গল্পই বেশি। এর ফলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, তাদের সমাজের মৌখিক ঐতিহ্য লোকপুরাণকেই আন্তরিকভাবে লালন করেছে। রূপকথা-পশুকথা-নীতিকথা-কিংবদন্তির গল্প তুলনায় কম। অনেকে মনে করেন, বহিরাগত সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে রূপকথা-পশুকথা জাতীয় গল্প. তারা ভুলে গিয়েছেন, আবার নতুন লোককথা সৃষ্টির মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু বাইরের আঘাত যত প্রবল হয়েছে নিজেদের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে তারা লোকপুরাণকে বেশি বেশি করে আঁকড়ে

করেছেন। কেননা, লোকপুরাণের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার লুকিয়ে থাকে। মানুষ যত বিপদের মুখোমুখী হয়, ঐতিহ্যগত ধর্মীয় ভাবনায় তত আকৃষ্ট হয়, এর মাধ্যমেই সে বাঁচবার পথ খোঁজে।

মাইক্রোনেশীয় লোকপুরাণে ইন্দোনেশীয় লোকপুরাণের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। ইন্দোনেশীয় এলাকা থেকে বহু শতাব্দী আগে তারা বর্তমানের এইসব এলাকায় এসেছিলেন, এই তত্ত্ব কিছুটা পরিমাণে যে সত্য তা বোঝা যায়। কেননা, কোনো জনগোষ্ঠীর লোকপুরাণের সঙ্গে অন্য জনগোষ্ঠির লোকপুরাণের সাদৃশ্য কম থাকে, অন্তত লোককথার অন্য বিভাগের তুলনায়।

প্রসঙ্গত, একটি আশ্চর্য সাদৃশ্যের কথা অনেককে বিস্মিত করেছে। মাইক্রোনেশিয়ায় একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকপুরাণ হল 'শুশুক কন্যা'। নানা রূপে গল্পটি বলা হয়। উলিথি দ্বীপের মানুষ এইভাবে গল্পটি বলেন ঃ দুটি শুশুক কন্যা দূর আকাশ কিংবা গভীর সমুদ্র থেকে তীরে উঠে আসত। তীরভূমিতে মানুষজন নাচত আর সেই নাচ দেখতে তাদের খুব ভালো লাগত। প্রতি রাতে ঝোপের মধ্যে তারা লেজ দুটোকে লুকিয়ে রেখে নাচ দেখত। বালির ওপরে অদ্ভুত পদচিহ্ন দেখে একজন মানুষ লুকিয়ে তাদের খোঁজ পায়, আর চতুর্থ রাত্রে সে একটি লেজ চুরি করে যাতে একটি শুশুক কন্যা আর ফিরে যেতে না পারে। বাধ্য হয়ে কন্যা তাকে বিয়ে করে। স্বামী লেজটিকে বরগার মধ্যে লুকিয়ে রাখে। তাদের দুটি সন্তান হয়। একদিন শুশুক কন্যা দেখে, বরগা থেকে কয়েকটি ছারপোকা নিচে পড়ল। বরগার আড়াল থেকে সে লেজ খুঁজে পেল। সে ফিরে চলল গভীর সমুদ্রের পথে। যাওয়ার আগে সে সন্তানদের সাবধান করে দিয়ে গেল,—বাছা, তোমরা কখনও শুশুকের মাংস খাবে না।

এই সরল গল্পটির সন্ধান মিলেছে ভারতীয় ঋগ্বেদে। এক বিস্ময়কর মিল। ৩০০০ বছর আগের ঋগ্বেদের গল্প কিভাবে এখানে মৌখিক ঐতিহ্যে ধরা রইল তার উত্তর আজও মেলেনি। এই গল্পে খাদ্যবিষয়ক ট্যাবু ও সামাজিক প্রথার উল্লেখ রয়েছে। এই গল্প শুধু এই এলাকায় নয়, গোটা ওশিয়্যানিয়া, এমন কি অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যেও শোনা যাবে। তবে কি ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে যাযাবর মানুষের অকূল দরিয়ায় পাড়ি জমানো সেই সুদূর কালেই শুরু হয়েছিল? লোকসংস্কৃতিবিদ উইলিয়াম লেসা এই ধারণাই পোষণ করেন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ে তিনিরাউ, হিনে, মাওই, পুনতান ও রূপেকে কেন্দ্র করে অসংখ্য লোকপুরাণ রয়েছে। উচ্চারণের কিছু তফাৎ সত্ত্বেও এরা মাইক্রোনেশীয় লোকপুরাণেও খুব প্রাধান্য পেয়েছে।

মৃত্যুর পরে মানুষ ও পশুপাখির আত্মা, সৃষ্টিতত্ত্ব, অশুভ শক্তি দলনকারী স্বর্গীয় শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য লোকপুরাণ রয়েছে।

মাইক্রোনেশীয় আদিবাসী অসাধারণ দক্ষ নৌযাত্রী। সমুদ্রের বুকে নৌকা নিয়ে তারা বহু বহু দূরে চলে যায়। রহস্যময় সমুদ্র, সামুদ্রিক ঝড, উত্তাল ঢেউ তাদেব কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। তাই রূপকথার অধিকাংশ বিষয়বস্তু এই সমুদ্র ও সমুদ্রযাত্রা। অবশ্য, এই বলয়ের অধিকাংশ আদিবাসীদের রূপকথার প্রিয় বিষয় হল রহস্যময় সমুদ্র। আর রয়েছে পুরুষ ও স্ত্রী দৈত্যেব রূপকথা। এরা সবসময়ে খুব বোকা অথচ দেহে রয়েছে অমিত শক্তি। এরা মাঝে মধ্যে গোটা গ্রামের মানুষকে খেয়ে ফেলে, কেমন করে বেঁচে যায় একজন গর্ভবতী নারী। তার সন্তান শেষ পর্যন্ত দৈত্যকে নিধন করে। অনেক রূপকথায় রয়েছে পশুমাতা বা পশুধাত্রীর কথা। এরা মানবিক চেতনায় মানুষেব সন্তানকে লালন করে। তবে এই সন্তান সচরাচর হয় কন্যা। কোন্ এক অজানা দ্বীপ থেকে আসে এক ছেলে, কন্যাকে সে বিয়ে করে। আবার এই ধরনের রূপকথায় বিষাদময় পরিণতির কথাও আছে। ভুল করে সেই ছেলে পশুধাত্রী ও কন্যাকে হত্যাও করে বসে। তারপরে অনুশোচনায় আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার বিষয়টি এই এলাকার বহু গল্পে রয়েছে, এই বিষয়টি ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে। কেননা, আদিবাসী কিংবা অন্য লোকসমাজের লোককথায় আত্মহত্যার বিষয়টি প্রায় বিরল। সংহত সমাজে বিচ্ছিন্ন মানসিকতার স্থান নেই, সমাজে আত্মহত্যাও নেই, তাই লোককথায়ও আত্মহত্যার কাহিনী অনুপস্থিত। পশুমাতা বা পশুধাত্রী সাধারণত ঈল বা বাইন মাছ অথবা গিরগিটি। বাইন মাছ এই এলাকায় অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। গোষ্ঠির সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।৩

শুধুমাত্র মানুষকে কেন্দ্র করেও অনেক রূপকথা আছে। এই ধরনের প্রায় সব রূপকথায় একসঙ্গে দুটি চরিত্র সমান প্রাধান্য পায়,—দুই ভাই, দুই বোন, স্বামীস্ত্রী, দুই ছেলে বন্ধু, দুই মেয়ে বন্ধু। যেসব রূপকথায় দুই ভাইয়ের গল্প রয়েছে সেখানে ছোট ভাই দয়ালু ও ভাগ্যবান আর বড় ভাই নিষ্ঠুর ও উদ্ধত।

মাইক্রোনেশিয়ায় আর এক ধরনের লোককথায় দূর দূর দেশের কাল্পনিক অভিযানের গল্প রয়েছে। একটি কাহিনীর সূত্র ধরে আরেকটি

কাহিনী, এইভাবে কাহিনী এগিয়ে চলে। রোন্‌গারিক নামে একজন দুঃসাহসী বিশ্বস্ত অভিযাত্রীর কাহিনী খুব জনপ্রিয়। পালুয়েলাপের দুই ছেলে। বড় ছেলে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে ছোট ছেলে রোন্‌গারিক। তার বিচিত্র অভিযানের কাহিনীতে পূর্ণ এই লোককথার মালা।

মাওরি আদিবাসী ঃ অকূল দরিয়ার ঐতিহ্য

নীল সাগরের তীরভূমি। ঢেউ-এর পরে ঢেউ ভেঙে এগিয়ে আসছে কয়েকটি ছিপ্‌ নৌকো। নৌকোয় অনেক মাছ, সোনালী রোদে রুপোলী আভা। তীরভূমিতে দাঁড়িয়ে উচ্ছল বৌ-মেয়ে-মায়েরা। গান গাইছে,—আনন্দের গান। যুবক ছেলে স্বামী বাবা অনেক মাছ নিয়ে ফিরেছে। আরও আনন্দ,—উত্তাল সাগর থেকে প্রিয়জন নিরাপদে ফিরে এসেছে।

হে কোয়া কাই! হে কোয়া কাই!
হে পাপা তেরেতেরে! হে পাপা তেরেতেরে!
এই........ই....ই এই....

এই গান গায় মাওরি আদিবাসী মেয়েরা। ভুলে-যাওয়া সেই কোন্‌ সুদূর কাল থেকে তারা থাকে নিউজিল্যাণ্ডে। নিউজিল্যাণ্ডে ইউরোপের মানুষ উপনিবেশ গড়বার পরে তাদের নিজেদের দেশে আজ তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠি। এমন দিন আগে ছিল না। বড় করুণ আর দুঃসহ আজকের জীবন। নয়া উপনিবেশ তো এই সেদিনের কথা, মৌখিক ঐতিহ্যে বিধৃত রয়েছে পুরনো দিনের স্মরণীয় গাথা। কেমন ছিল সেই সংস্কৃতি?

নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর দ্বীপের পূর্ব সাগরতীরে মাওরি আদিবাসীদের এক গোষ্ঠি বাস করে। এরা হল তাকিতুমু গোষ্ঠী। এরাই সবচেয়ে অকৃত্রিমভাবে প্রাচীন ঐতিহ্যকে লালন করে চলেছে। মাওরিদের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের কথা জানতে হলে এদের কাছ থেকেই আজ তা জানতে হবে।

পলিনেশিয়া থেকে মৌখিক ঐতিহ্যের নানা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা। পলিনেশিয়ার হাজার হাজার দ্বীপের বিচিত্র উপকরণ বিশ্লেষণ করে দুটি অসাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে। এক,

এই জাতিগোষ্ঠীর জীবন কেটেছে দীর্ঘ লড়াই, সমুদ্রযাত্রা ও নয়া বসতি গড়ার মধ্য দিয়ে। লড়াই বেধেছে দ্বীপে দ্বীপে, পরাজিত হয়ে কিংবা খাদ্যের অন্বেষণে দ্বীপ ছেড়ে যেতে হয়েছে, সমুদ্রই একমাত্র পথ, পথের শেষ হয়েছে নতুন দ্বীপে নতুন উপনিবেশে। আজ তারা যেখানে রয়েছে সেখানেও একদিন তারা পরবাসী ছিল। দুই, নিউজিল্যাণ্ডের বর্তমান মাওরি আদিবাসীরাও পরবাসী, নতুন উপনিবেশের নতুন বসতি একদিন মাতৃভূমি হয়ে উঠল।

তাকিতুমু মৌখিক ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে আমরা জানতে পারি, এই মাওরিদের আদি জন্মভূমি ছিল সুদূর পশ্চিম দিকে। এই জন্মভূমির নাম ছিল উরু। যুদ্ধ শুরু হল, গোষ্ঠীবিরোধ চরমে উঠল, তখন পুহি-রান্গিরান্গি নামে একজন গোষ্ঠীপতির নেতৃত্বে তারা পুবদিকে এগিয়ে চলল। অসংখ্য লম্বা লম্বা নৌকোয় চলেছে অসংখ্য অভিযাত্রীর দল, এক উষ্ণতর আবহাওয়া অঞ্চলের দিকে। মন মানছে না নতুন দ্বীপে। বড় গরম। সেই চঞ্চল মুহূর্তে একজন সমুদ্র-অভিযাত্রী তু-তে-রান্গি আওয়া তাদের এক স্বপ্নরাজ্যের কথা জানাল। সে দেখে এসেছে সাগরতীরের সবুজ রাজ্য। আরও পুবে পাড়ি দিতে হবে। তু-তে আরও বলল, সে স্বপ্নরাজ্যের নাম ইরিহিয়া। অফুরন্ত খাদ্য সেখানে। সেখানকার মানুষগুলো রোগামতন, শান্ত স্বভাবের, তাদের গায়ের রঙ কালো। আর রয়েছে বিস্ময়কর একটি গাছের ছোট ছোট শস্য। তাতে রক্ত নেই, রস নেই। তাই সেগুলো দেবপূজায় উৎসর্গ করা হয়।

সামাজিক ইতিহাসের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে এই কাহিনীর মধ্যে। তারা দেশ ছেড়েছিল যুদ্ধের জন্য, খাদ্যাভাবের জন্য। বসতি গড়ল সেখানে যেখানে রয়েছে অফুরন্ত খাদ্যের যোগান, যেখানকার মানুষ শান্ত স্বভাবের। আবহমান কালের মানুষের এই একই সামাজিক ইতিহাস। মানুষের চেয়ে যাযাবর আর কোন্ প্রাণী আছে?

তারা এল ইরিহিয়া এলাকায়। তাদের আদি বাসভূমির তুলনায় এখানেও গরম বেশি। তবু তেমন নয়। সবই সয়ে যায় ধীরে ধীরে, যদি পেট থাকে ভর্তি। গরম এলাকা বলে তারা ইরিহিয়াকে ইরিরান্গি-ও বলত,—সূর্যের তেজ প্রবল বলেই এই নতুন নাম। এখানকার আদি কালো মানুষজনের সঙ্গেই এরা থাকতে লাগল। এদের অনেকেই ছিল যাযাবর, নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। দুই জনগোষ্ঠী মিলে গেল। চেহারায় তার প্রভাব পড়ল। এ-ও

ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কাহিনীর মধ্যে রক্ত-মিশ্রণের স্মৃতি সুপ্ত রয়েছে। পৃথিবীর কোনো জনগোষ্ঠীতেই বোধহয় এক রক্ত নেই। যাযাবর মানুষের স্বাভাবিক পরিণতি।

অন্য একটি কাহিনীও আছে। এর মাধ্যও ঐতিহাসিক সত্য রয়েছে। মাওরি জনগোষ্ঠী ইরিহিয়াতে পৌছল, কিন্তু সহজে সেখানে বসতি গড়ে তুলতে পারেনি। কেননা, ইরিহিয়াতে কোপুরা-তাহি নামে এক সর্দার ছিল. তার অধীনে ছিল পাঁচশ ছোট ছোট সর্দার। তাদের জনবল এত বিপুল ছিল যে, তীরভূমির বালুকণার মতো তাদের সংখ্যা। তাদের সঙ্গে মাওরিদের বিরোধ বাধল, তীব্র লড়াই শুরু হল। শেষ পর্যন্ত সন্ধি হল,—মীমাংসায় স্থির হল সবাই একসঙ্গেই থাকবে। সবাই থাকতে লাগল। মানবসমাজের ইতিহাসে বহুবার ঘটে-যাওয়া ঐতিহাসিক সত্য। কাহিনীতে আরও বলা হয়েছে, এইসব যুদ্ধ ও বিরোধে কিছু মানুষ বিরক্ত হয়ে আরও পুবের দিকে রওনা ছিল। তারাও সংখ্যায় কম নয়। আবার অকূল দরিয়ায় যাত্রা। ভারত মহাসাগরের বুক বেয়ে জাভা সুমাত্রার পাশ দিয়ে সে পথ আরও পুবের দিকে।

অভিযানের এই পর্বে একটি ভাষাগত সাদৃশ্য পণ্ডিতজনকে বিহ্বল করে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। দেশের নাম ইরিহিয়া, সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন ভারতবর্ষের নাম ব্রীহিয়া। মাওরি অভিযাত্রীদল কি ব্রীহিয়ার উচ্চারণ করত ইরিহিয়া বলে? মাওরিদের প্রধান খাদ্য চাল, তারা বলে আরি। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের দ্রাবিড়রা চালকে বলে আরি। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধানকে বলা হত ব্রীহি আর ব্রীহিক হল ধান্যবিশিষ্ট। ব্রীহিয়া দেশের নাম কি ব্রীহি বা ব্রীহিক থেকে এসেছে?[৪] তাহলে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে কি মাওরিদের কোনো পূর্ব-বন্ধন ছিল? প্রাচীন ভারতীয় মানুষও ছিল অকূল দরিয়ার মাঝি। সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে অজানা ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাবে একদিন। সেদিন নতুন করে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান চর্চা শুরু হবে।

যারা এভাবে উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল, সমুদ্র ও জলযান সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কত গভীর ও ব্যাপক ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। মাওরি লোকপুরাণে রয়েছে, ইরিহিয়ায় সংঘর্ষের পরে কিছু মাওরি আরও পুবের দিকে এগিয়ে চলল। চলছে, চলছে,—এগারো দিন এগারো রাত কেটে গেল। শেষকালে তারা বনে ঘেরা এক ডাঙা দেখতে পেল। সেখানে তারা নতুন বসতি গড়ে তুলল। সে দেশের নাম তাওহিতি-রোয়া। এই

কাহিনীতেই রয়েছে অভিযানের অভিজ্ঞতার কথা ও নৌকোর বিবরণ। সামুদ্রিক প্রকৃতির কথাও রয়েছে। ঝড়ো বাতাসে ঢেউয়ের তাণ্ডবের মধ্যে তারা কি ধরনের হাল-দাঁড় ব্যবহার করত তাও বলা হয়েছে। আকাশের তারা দেখে কিভাবে রাতের অন্ধকারে তারা দিক নির্ণয় করত সে তথ্যও রয়েছে। লোকপুরাণের মধ্যেও বিজ্ঞানভিত্তিক এসব বর্ণনা কাহিনীর আকারে তারা বলেছে। সমুদ্রের পোকা না হলে, সমুদ্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে, জ্যোতির্বিদ্যার প্রাথমিক পাঠ জানা না থাকলে মূল বাসভূমি থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে পৌছনো সম্ভব হত না।

যাত্রার শেষ কিন্তু এখানেই নয়। কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে কিছু মাওরি আবার জলে নৌকো ভাসিয়ে দিল। আরও পুবে। কিছু রয়ে গেল সেই দ্বীপেই। আবার সমুদ্র-যাত্রা। এবার পৌছল তাওহিতি-নুই দেশে। মাওরি সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ এস. পারসি স্মিথ মনে করেন, তাওহিতি-রোয়া হল বর্তমানের সুমাত্রা ও তাওহিতি-নুই হল বর্তমানের জাভা।

অশান্ত যাযাবর মাওরি জনগোষ্ঠী তাওহিতি নুই দ্বীপেও বেশিদিন থাকল না। কয়েক পুরুষ পরে একটি অংশ আবার সমুদ্র যাত্রা করল। রক্তে বুঝি অভিযানের নেশা। তারা পৌছল আহু, মাওই ও হাওয়াই-কি দ্বীপে। বেশ কিছুকাল তাদের স্থিতি হয়েছিল এই তিন দ্বীপে। পারসি স্মিথ বলেছেন, এই তিনটি দ্বীপের বর্তমান নাম হল আহু, মাওই ও হাওয়াই। লোকপুরাণের নামের সঙ্গে বর্তমানের নামের হুবহু মিল। হাওয়াই দ্বীপমালার মধ্যে এগুলো রয়েছে।

আজ আর বলা সম্ভব নয়, কিভাবে কোন্ সঠিক পথে এই দুর্ধর্ষ অভিযাত্রী দল প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু লোকপুরাণে বিবৃত এই অভিযানকে আজগুবি গল্পকথা বলেও তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না।[৫] কেননা, আজও আমরা মেলানেশীয় অঞ্চলে বহু পলিনেশীয় উপনিবেশ দেখতে পাই, দেখতে পাই ছোট ছোট জনগোষ্ঠি যারা পলিনেশিয়া থেকে এত দূরের দ্বীপে বাস করেও পলিনেশীয় ভাষায় কথা বলছে। এইসব জনগোষ্ঠিকে আজও দেখতে পাওয়া যাবে ফুটুনা, টিকোপিয়া, রেনেল, ওন্টোংগ প্রভৃতি দ্বীপে। এমন কি ক্যারোলিন-এর দক্ষিণে নুকুওরো দ্বীপেও। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে না এলে পলিনেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এমন মিল রইবে কেন?

আজ যারা এইসব দ্বীপে পলিনেশীয় সংস্কৃতির মানুষ, তারা নিশ্চয়ই সেই অভিযাত্রীদের উত্তরপুরুষ।

মনে হয়, পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় ঢোকার পরে অভিযাত্রীদল দুটি বা তিনটি পথে এগিয়ে গিয়েছিল। সামোয়া ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জের তীরভূমি থেকে অসংখ্য সমুদ্রযাত্রা করে তারা এইসব দ্বীপে পৌঁছয়। কম্পাস নেই, ধাতুর ব্যবহার জানা নেই, অন্তত নৌকোয় ধাতুর ব্যবহার করে নি,—অথচ কি সাহসিক অভিযান। খাদ্য-অন্বেষণের মর্মান্তিক আগ্রহ বোধহয় প্রাণীকে সাহসী করে তোলে! তাদের যদি লিপি থাকত, তারা যদি সেদিনের অভিযানের ইতিহাস লিখে যেতে পারত, যদি অবিস্মরণীয় সাগর-পাড়ির মানচিত্র আঁকতে জানত, পথের হদিস লিপিবদ্ধ করতে জানত,—তবে পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপের অভিযানকারীদের এত পরিশ্রম করতে হত না।

পলিনেশিয়ার এইসব মানুষের সর্বশেষ আশ্রয়ভূমি নিউজিল্যাণ্ড। অস্ট্রেলিয়া তাসমানিয়ার কোল ছুঁয়ে আরও পূর্ব সমুদ্রতীরে তাদের শেষ যাত্রা। অবশ্য এটাও অনুমান-নির্ভর। পলিনেশীয় এলাকা থেকে, সেখানকার দ্বীপপুঞ্জ থেকে সুদূর পূর্বে এই দ্বীপপুঞ্জে এসে একদলের স্থিতি হল। আজ শুধু এরাই মাওরি নামে খ্যাত। বোধহয় অন্তহীন দুঃসাহসিক কষ্টকর সমুদ্রযাত্রার এখানেই পূর্ণচ্ছেদ।

মাওরি আদিবাসীর তাকিতুমি ঐতিহ্যে বলা হয়েছে, বীর অভিযাত্রী কুপে নতুন দ্বীপ নিউজিল্যাণ্ডের আবিষ্কর্তা। সে পূর্ব-পলিনেশিয়ার বাসিন্দা, নতুন দ্বীপে এলো কেমন করে?

কুপে ও নগাহুয়ে 'সোসাইটি' দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দা। দুটি নৌকোয় তারা রওনা দিল। চলতে চলতে তারা নিউজিল্যাণ্ডের সুদূর উত্তর ভূমিখণ্ডে পৌঁছল। অল্পকাল সেখানে থেকে তারা অনেক দক্ষিণে নেমে এসে পূর্ব তীরে চলে গেল। গ্রেট ব্যারিয়ার দ্বীপ হল তাদের আওটেয়া দ্বীপ আর উত্তর ভূমিখণ্ড হল তাদের আওটেয়া-রোয়া। এ নামেই তারা দ্বীপ দুটিকে ডাকে। এই দুজন অভিযাত্রী যখন উত্তর অন্তরীপ অঞ্চলে যাচ্ছিল, তখন প্রথমে দেখতে পায় আকাশে এক খণ্ড সাদা মেঘ, তারপরেই নজরে পড়ে স্থলের ব্যাপ্তি। সাদা মেঘ তাদের ভাষায় আওটেয়া, সেই থেকে স্থানের নাম হল আওটেয়া। এখানকার 'ক্যাসল পয়েন্ট' ও 'পালিসার' উপসাগরে পৌঁছে

তারা এল 'ওয়েলিংটন' বন্দরে। এখানকার সোমেস ও ওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের নাম তাদের ভাষায় মাটিউ এবং মাকারো। এই দুই নামে কুপের দুজন প্রিয় আত্মীয় ছিল। এখান থেকে তারা গেল পোরি-রুয়া এলাকায়, বর্তমানের সিনক্লেয়ার হেড-এর কাছাকাছি। তারপরে পাড়ি দিল দক্ষিণ দ্বীপে। আরাহুরাতে তারা সবুজ পাথরের সন্ধান পেল। লোকপুরাণে বলা হয়েছে, এসব এলাকায় তখন কোনো মানুষজন ছিল না। তাই অভিযাত্রী দুজন আবার পূর্ব-পলিনেশিয়ায় ফিরে আসে। সে কোন্ কালে? মাওরি আদিবাসী বলে, তা জানি না, আমাদের আসার অনেক অনেক কাল আগে।

কুপে ও ন্গাহুয়ের পরের অভিযাত্রী হল তোই। সে-ও পূর্বদিকের সাগরপথে নিউজিল্যাণ্ডে পৌঁছল। সে এসে দেখল, উত্তর দ্বীপে কালো রঙের মানুষদের বসতি রয়েছে। তারা বেশ অনুন্নত বলে তোই এর মনে হল। কুপে এইসব এলাকায় কোনো মানুষ দেখেনি। তোই দেখল অনেক মানুষ। তাহলে দুজনের অভিযানের মাঝখানে কি এরা এসেছিল? মাওরি লোকপুরাণে আছে, এরাও কোনো অজানা দ্বীপ থেকে সাগরে পাড়ি দিয়েছিল, সমুদ্র-ঝড়ে দিশেহারা হয়ে এইসব দ্বীপে ছিট্‌কে পড়ে। স্বেচ্ছায় তারা এসব দ্বীপে আসেনি। এরা বোধহয় এসেছিল বর্তমানের মেলানেশিয়ার নিউ হেব্রাইডিস দ্বীপ থেকে। অস্ট্রেলিয়া কিংবা তাসমানিয়া থেকে কোনোভাবেই এরা আসতে পারে না। কেননা, সমুদ্র পাড়ি দেবার মতো নৌকো তারা বানাতে জানে না। মাওরিরা এইসব মানুষের বিবরণ দিয়েছে এইভাবে: এদের বোঁচা নাক, স্ফীত নাসারন্ধ্র, ঘন চুল, অশান্ত চাহনি। এরা রোগামতন, পোশাক পরে অতি সামান্য। এই দৈহিক বিবরণ থেকে আংশিকভাবে মনে হয়, এরা মেলানেশীয় জনগোষ্ঠি। কিন্তু মেলানেশীয়রা রোগামতন নয়, এরা তুলনামূলকভাবে উজ্জ্বল রঙের। অনেকে মনে করেন, এই গোষ্ঠি পলিনেশীয়-মেলানেশীয় মিশ্রিত জনজাতি।

যাইহোক, তোই নিউজিল্যাণ্ডে উপনিবেশ গড়বার পর থেকে শুরু হল পলিনেশীয় মানুষদের আসা। দলে দলে। আগে যারা এসেছিল, নতুন-আসা দলের সঙ্গে কখনও মিলন কখনও বিরোধ চলতে লাগল। পলিনেশিয়া থেকে এসেছে পুরুষই বেশি। সমুদ্রের অত ধকল কি সব মেয়ে সইতে পারে? বৌ চাই। আগে আসা অন্য জনগোঠির অনেক মেয়ে তাদের বৌ হল। এর স্বাভাবিক পরিণতিতে আগে আসা মানুষজন একদিন প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে

আক্রমণ করল মাওরিদের। কিন্তু তারা পারবে কেন উন্নত মাওরিদের সঙ্গে? নিঃশেষ হয়ে গেল পুরুষেরা। সামান্য কিছু মানুষ পালিয়ে গেল তীরভূমি থেকে অনেক দূরে গহন অরণ্যে। শেষ পর্যন্ত তাদের সামান্য কয়েকজন ছিল চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জে। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দেও তাদের কয়েকজন উত্তরপুরুষ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বেঁচে ছিল। আজ আর তাদের কেউ নেই, যেমন নেই তাসমানিয়ার আদিবাসীদের। তাসমানিয়ার শেষতম আদিবাসী মারা গিয়েছেন ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে।

নব্য প্রস্তরযুগের সমুদ্র-অভিযাত্রীদের মতোই পলিনেশীয়রা এক বিস্ময়কর সমুদ্রজয়ী জনজাতি। সাগররাজ্যের এক ব্যাপক এলাকা তারা চষে বেরিয়েছে। আদি তীরভূমি থেকে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে। অনেক সামুদ্রিক ঝড় সমাজের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, বহু প্রতিকূলতা আছড়ে পড়েছে সংস্কৃতির ওপরে,—তবু নিজস্ব এক বলিষ্ঠ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে তারা আজও বহন করে চলেছে। অকূল দরিয়ায় যারা এভাবে পথ চলেছে, অকূল দরিয়ার ঐতিহ্যকে তারা সহজে ভুলবে কেমন করে?

মাওরি লোককথা

সুদূর কাল থেকে মৌখিক ঐতিহ্যে বয়ে আসা এই স্মৃতি মাওরি লোককথাকে লালন করে এসেছে। মাওরিদের সমস্ত লোককথার জাতিগত পরিচয়জ্ঞাপক একটি নাম দেওয়া হয়ে থাকে, তাহ হল—'কোরেরো পুরাকাউ'। এদের বেশির ভাগেরই সন্ধান মিলবে পলিনেশীয় দেশগুলিতে, যা থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাদের আদি বাসভূমির কথা। পলিনেশীয় রূপকথা পশুকথা লোকপুরাণ কিংবদন্তির হুবহু রূপগুলি মাওরিদের মধ্যে রয়েছে। আবার দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতার ফলে কিছু নতুন লোককথারও উৎসার ঘটেছে, যা একান্তই নিউজিল্যাণ্ডের সীমানায় আবদ্ধ। বিশেষ করে, ঐতিহ্যবাহী লোকপুরাণগুলির আদি উৎস যে পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ তাতে সন্দেহ নেই। 'জার্নাল অব দ্য পলিনেশিয়ান সোসাইটি'র তৃতীয় খণ্ডে অনেক লোকপুরাণের সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ রয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় পলিনেশীয় স্থানগুলির কিছু নামসহ এইসব লোকপুরাণ মাওরিদের মৌখিক ঐতিহ্যে স্থায়িভাবে রয়ে গিয়েছে।

আদিবাসী লোকসমাজের বিশেষত্ব হল, তাদের লোককথা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-পরবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।৬ যেমন হিন্দুদের ব্রতকথার গল্পগুলি। বিশেষ বিশেষ সময়ে এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। মাওরিদেরও এই একই বিশ্বজনীন ঐতিহ্য। শীতকালেই তাদের অধিকাংশ উৎসব-পরব আর শীতের গোধূলি-সন্ধ্যায় পবিত্র আগুন জ্বালিয়ে তারা এইসব লোককথা বলে চলে। অফুরন্ত সে ভাণ্ডার। শ্রুতির মাধ্যমে উত্তরপুরুষ বাঁচিয়ে রাখে লোককথার ভাণ্ডার।

এইসব লোককথার বিষয়গুলো হল: সৃষ্টি বিষয়ক লোকপুরাণ—রামধনু-বনভূমি সূর্য-তারা-নক্ষত্র মানুষ-পশুপাখি-সাগরের জন্ম হল কিভাবে, পৌরাণিক মানুষ-খেকো দৈত্য-দানো, দৈত্য-দানো নিধনকারী অপরাজেয় মানুষ, সমুদ্রজয়ী একাকী বীর পুরুষ, অপরূপা পরীর দল, কথা-বলা যাদু-জানা উপকারী পশুপাখি, চলন্ত পাহাড়-বনানী, নীতিকথা, পশুকথা। মাওরি আদি-বাসী সমাজে ব্যাভিচারের কোনো লোককথা নেই, সমাজে যেমন নেই ব্যাভি-চারের স্থান। আশ্চর্য নিষ্কলুষ সমাজবন্ধন। এইসব লোককথার মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক সত্যকথন রয়েছে। যেমন, ন্গাহুয়ের কাহিনী। ইনি একজন পলিনেশীয় অভিযাত্রী, তিনি সুদূর পলিনেশিয়া থেকে নিউজিল্যাণ্ডে এসে সবুজ পাথর আবিষ্কার করেছিলেন। আবার ফিরে গিয়েছিলেন পূর্ব পলিনেশিয়ায়। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এইভাবে রাতা, হুইরো প্রভৃতি অভিযাত্রীর কথাও লোকপুরাণে রয়েছে। মাওরিরা বিদ্যুৎ-ঝড়-ধূমকেতুতে চেতন-ধর্ম আরোপ করে লোকপুরাণে নাম দিয়েছে টাওহাকি-হোয়াইতিরি-ওয়াহিয়েরোওয়া,—এরাও ঐতিহাসিক চরিত্র।

মাওরি আদিবাসী স্বপ্নের ফলাফলে গভীরভাবে বিশ্বাসী। তাই স্বপ্নকে ঘিরে তাদের অসংখ্য লোককথা রয়েছে। এই স্বপ্ন তাদের জীবনাচরণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে বলেই মৌখিক ঐতিহ্যে স্বপ্নের স্থানও বেশ ব্যাপক। যুদ্ধ-প্রসঙ্গে স্বপ্নদেখার প্রভাব বেশি। তাই যুদ্ধ-সংক্রান্ত লোককথায় স্বপ্ন বেশি বেশি স্থান করে নিয়েছে।

হাজার বছরের ওপরে হল মাওরি আদিবাসী আদি বাসভূমি 'রাইয়াতিয়া' বা 'হাওয়াইকি' ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিল অজানা দ্বীপের পথে ;—এতদিনের ঐতিহ্য, আদি বাসভূমির স্মৃতি যে আজও তারা তাদের লোককথায় ধরে

রেখেছে, এটাই বিস্ময়ের। প্রতিটি মহান জাতিগোষ্ঠীর এই ঐতিহ্যপ্রিয়তাই হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও তাকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

মেলানেশিয়া

ফিলিপাইনস্ দ্বীপপুঞ্জের পূর্বদিকে, মাইক্রোনেশিয়ার দক্ষিণে, অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে ও পলিনেশিয়ার পশ্চিমে অসংখ্য দ্বীপের মালায় গাঁথা মেলানেশিয়া এলাকা। ঘন বনানীতে আবৃত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এই মেলানেশিয়াকে তিনটি প্রধান ভৌগোলিক ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম নিউ গিনি। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দ্বীপ, প্রাচীনকালে যে দ্বীপ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে অনুমান করা হয়। দ্বিতীয়, বিসমার্ক, সোলোমোন, সান্টা ক্রুজ, ব্যাংক, নিউ হেব্রাইডিস, লয়্যালটি ও নিউ ক্যালেডোনিয়া দ্বীপপুঞ্জের সমাহার। এইসব দ্বীপ মূলত আগ্নেয়গিরি প্রবণ। তৃতীয়, পলিনেশিয়ার পশ্চিম সীমান্ত এলাকার ফিজি দ্বীপপুঞ্জ।

বিচিত্র সংস্কৃতি ও দৈহিক কাঠামোগত বিভিন্নতা রয়েছে এই এলাকায়। তাই এখানকার আদি জনবসতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যদিও দীর্ঘদিনের মিশ্রণের ফলে একের প্রভাব পড়েছে অন্য গোষ্ঠীর ওপরে। এলাকার সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দা হল নিউ গিনির অভ্যন্তরে অরণ্য এলাকার নেগ্রিটো মানুষ। এদের লোককথার কোনো পরিচয় আজও জানা যায় নি। পরবর্তী স্তরে এল পাপুয়া আদিবাসী। এরাই নিউ গিনির বেশির ভাগ অংশ দখল করে নেয়। পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলির মানুষজনের সঙ্গেও মেলামেশা চলতে থাকে। আর মধ্যবর্তী এলাকায় থাকে ওশিয়্যানিক নিগ্রয়েড। এরা মালয়ী পলিনেশীয় ভাষায় কথা বলে। মেলানেশিয়ার মাঝখানের সমস্ত দ্বীপেই এদের প্রাধান্য। এরা আবার নিউ গিনির তীরভূমির পূর্ব অংশে গিয়েও বসবাস শুরু করে। নৃবিজ্ঞানীরা নিউ গিনিকে মূল মেলানেশিয়া থেকে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি এলাকা বলে গণ্য করেন, কেননা এখানে মূলত পাপুয়া আদিবাসীদেরই বাস। নিউ গিনির বিশাল আকৃতিও এই স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়।

মেলানেশিয়ার অধিকাংশ আদিবাসী কৃষিজীবী। অতি সহজ 'পুরনো' পদ্ধতিতে তারা চাষ করে। তবে গভীর অরণ্য এলাকায় কিছু কিছু গোষ্ঠী

আজও আধা যাযাবর। কুকুর, মুরগী ও শুয়োর গৃহপালিত পশু। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় বাইরের জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে, সংস্কৃতির ওপরেও তার প্রভাব পড়েছে। ভাষাগত বৈচিত্র্যও দেখা দিচ্ছে।

ম্যাজেলানের পথ বেয়ে এল ইউরোপীয় অভিযাত্রী দল। সামুদ্রিক ঝড়, ঢেউ-এর তাণ্ডব যে বিপর্যয় ঘটাতে পারে নি এদের সামাজিক জীবনে, তাই ঘটে গেল ইউরোপীয়দের হাতে। ওশিয়্যানিয়ার অন্য এলাকায় যা ঘটেছে সেই একই নিষ্ঠুরতা বর্বরতা ও রক্তপাতের ইতিহাস এখানেও গোষ্ঠীজীবনে মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিল। ম্যাজেলানের দেশের এক অভিযাত্রী আলভারো মেনডানা ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে সোলোমন দ্বীপপুঞ্জে আদিবাসীদের রক্তে বন্যা বইয়ে দিল। শিকারী যেমন 'বীভৎস আনন্দে' পশুশিকার করে, ইনি সেই আনন্দে আদিবাসী হত্যা করতেন। অথচ ইনি নাকি ছিলেন খুব ভক্তিমান খ্রীস্টান। এই মেনডানা যখন পলিনেশিয়ার মারকুইসাস দ্বীপপুঞ্জে অহিংসার প্রতীক ক্রস স্থাপন করেন সেই মুহূর্তে দুশো আদিবাসীকে হত্যা করেছিলেন। এই এলাকায় ম্যাজেলান বা মেনডানা একজন দুজন আসে নি, এসেছে একের পর এক। এই নতুন সুসভ্য মানুষেরা আর একটি নতুন জিনিসের আমদানি করল যা আদিবাসী সমাজে আগে ছিল না। নতুন নতুন রোগ, সবচেয়ে সাংঘাতিক বসন্ত ও সিফিলিস। অত্যাচার তো অত্যাচারেই শেষ হয়, মৃত্যুর পরে আর সহ্য করতে হয় না। কিন্তু এই রোগ পুরুষ পরম্পরায় বয়ে চলে, জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনকেই ওলোটপালট করে দেয়।৭ ওশিয়্যানিয়ার সর্বত্রই এই একই করুণ ইতিহাস।

এইসব বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে কিছু জনগোষ্ঠী সুদূর দুর্গম পাহাড়ী বনাঞ্চলে আশ্রয় নেয়। বিশেষ করে নিউ গিনিতে। তারা আজও বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই বসবাস করছে।

মেলানেশীয় লোককথা

মেলানেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোককথার বিশাল ভাণ্ডার আজও পুরোপুরি সংকলিত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে সাংস্কৃতিক মিশ্রণের ফলে অনেক লোককথা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, চেষ্টা করলেও আজ আর তার সন্ধান পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রথম কাজ করেন

আর. এইচ. কডরিঙ্গটন। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে তিনি মেলানেশীয় আদিবাসী সম্পর্কে তথ্যবহুল গ্রন্থ লেখেন। এছাড়া ১৯০৭ সালে এল. ফিসন, ১৯১০ সালে সি. এল. সেলিগম্যান, ১৯১১ সালে জি. ল্যাণ্ডম্যান, ১৯২৬ সালে সি. বি. হ্যাম্‌ফ্রেস ও জি. সি. হুইলার ও ১৯৩৩ সালে এইচ. পাউডারমেকার মেলানেশিয়ার ওপরে অসাধারণ সব গ্রন্থ লিখেছেন। জার্মান মিশনারী ও নৃবিজ্ঞানীরাও ১৯০৫-১০ সালের মধ্যে অনেক তথ্য ও লোককথা সংগ্রহ করেন।

মাইক্রোনেশিয়ার মতো এই এলাকাতেও সবচেয়ে বেশি সংগৃহীত হয়েছে আদিবাসী লোকপুরাণ। মানুষের জন্ম কিভাবে হল এই বিষয় নিয়ে প্রতিটি দ্বীপেই প্রায় ভিন্ন ভিন্ন লোকপুরাণ রয়েছে। এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও, মেলামেশা ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এই একই বিষয়ে কয়েক শ' লোকপুরাণ সংগৃহীত হয়েছে। মানুষ জন্মেছে আকাশ থেকে, নরম মাটির তলদেশ থেকে, গাছের বাকল থেকে, মাটি থেকে, বালি থেকে, পাথর থেকে, জমাট রক্ত থেকে, ডিম থেকে, লতা থেকে,—মানুষ জন্মেছে সবচেয়ে পরে: এইসব ধারণা বিভিন্ন আদিবাসীর লোকপুরাণে রয়েছে। তবে প্রথমে যে এই পৃথিবীতে সূর্য-চন্দ্র-আকাশ-সমুদ্র-পশুপাখি-মানুষ ছিল না, এই চিন্তা সকলের মধ্যেই রয়েছে। এসব যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিও কোনো একক স্রষ্টা নন। বিভিন্ন স্রষ্টার ইচ্ছায় এসবের জন্ম। এইসব স্রষ্টা হলেন, নিউ গিনির রোরোভাষী আদিবাসীর ওরা য়োভে মারাই, কিওয়াই পাপুয়াদের মারুনোগেরে, ফিজির কালোউ ভু, ওরোকোলো আদিবাসীর ইভো ও উকাইপু প্রভৃতি। লোকপুরাণের মধ্যে যেসব টোটেম-এর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তার অধিকাংশই সামুদ্রিক প্রাণী কিংবা তীরভূমির গাছগাছালি।

অধিকাংশ লোকপুরাণে রয়েছে, স্রষ্টা আগে সৃষ্টি করেছেন পুরুষকে, তারপরে পুরুষের নিঃসঙ্গতায় ব্যথিত হয়ে সৃষ্টি করলেন নারীকে। অথচ এই নারীই অনেক কিছু সৃষ্টি করল। আসলে সে অনেক কিছু গোপন রাখত, পরে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ ইচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে সমাজকে দেয়। যেমন আগুন। নারী তার দেহের গোপন অঙ্গের ভেতরে আগুন লুকিয়ে রাখত। পরে বাধ্য হয়ে সে সকলকে আগুন জ্বালাতে শেখাল। গাছগাছালি সম্পর্কে যেসব লোকপুরাণ রয়েছে তা উর্বরতাতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা থেকে জন্মেছে। নারকেল গাছের জন্ম নিয়ে অগুনতি লোকপুরাণ রয়েছে। বাইন মাছ বা সাপের মাথা মাটিতে পুঁতে রাখার পরেই নারকেল গাছের জন্ম।

মেলানেশিয়ার রূপকথা-পশুকথাগুলি আকারে খুব ছোট, কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত। গল্পের শেষে দু-একটি বাক্যে থাকে অনন্য চমক, বিস্ময়কর বিশ্লেষণ। মেলানেশিয়ার পূর্ব দিকের দ্বীপগুলিতে বিশেষ করে ভানুয়া লেভু, ভানুনা, আমব্রিম, পাইনস্, রোতুমা প্রভৃতি দ্বীপে অনাথ বালকের অসংখ্য রূপকথা পাওয়া গিয়েছে। শিশু অবস্থায় সে মাতাপিতাকে হারিয়েছে, পাড়ার ছেলেদের কাছে খারাপ ব্যবহার পেয়েছে, অনেক প্রতিকূলতা সহ্য করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গোষ্ঠীর সর্বময় কর্তা হতে পেরেছে। 'ছোট্ট অনাথ' নামে একটি রূপকথা সংগ্রহ করেছেন আর. এইচ. কডরিঙ্গটন। ইউরোপীয় সিণ্ডেরেলা রূপকথার সঙ্গে যার আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে।

মেলানেশিয়ায় পাওয়া গিয়েছে অনেক পরীকথা। এগুলোকে তারা বলে কুকোয়ানেবু। বর্ষার সন্ধ্যায় এগুলো বলা হয়। এর সঙ্গে জাদুর ধারণা মিশে আছে। সব গল্পের শেষে কথক ও শ্রোতারা বলে ওঠে,—খুব উর্বরা জমি, খুব উর্বর ফসল। বর্ষার সঙ্গে ফসলের সম্পর্কের জন্যই এই সময়ে এইসব গল্প বলা হয়। আর রয়েছে এক ধরনের কিংবদন্তি যেগুলো এককালে সত্যি ঘটেছিল বলে তাদের বিশ্বাস। কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা সত্যিই এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে। এই গল্পগুলির নাম লিবোগুও। কোনো ঐতিহাসিক স্থানে কিংবা সমুদ্র যাত্রার সময়ে এগুলো বলা হয়।

মেলানেশিয়ার উপকূল বরাবর দ্বীপগুলিতে মাইক্রোনেশিয়া, পলিনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার লোককথার কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়ে, কিন্তু দূরবর্তী এলাকায় সাদৃশ্য খুব কম। যেটুকু আছে তাও মেলানেশীয় জনগোষ্ঠী নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের করে নিয়েছে। লোককথার মিল সবচেয়ে বেশি রয়েছে নিউ ক্যালেডোনিয়া, ফিজি, বোগেনভিল, কানিয়েট, ওনটোঙ্গ জাভা প্রভৃতি দ্বীপে। সবই সীমান্ত এলাকার দ্বীপ।

পলিনেশিয়া

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাংস্কৃতিক বলয়ের একেবারে পূর্ব প্রান্তে পলিনেশিয়া। বিশাল ত্রিকোণ আকৃতির এই এলাকা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে নিউজিল্যাণ্ড এবং ইসটার দ্বীপ থেকে সামোয়া ও টোংগা দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই এলাকার বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে হাওয়াই বা স্যাণ্ডউইচ, ফিনিক্স, সামোয়া,

নিউজিল্যাণ্ড, সোসাইটি, মারকুইসাস, তুয়ামোতু, অসট্রাল, কুক ও টোংগো প্রধান। বিশাল এলাকা সত্ত্বেও, এক দ্বীপের সঙ্গে অন্য দ্বীপের ব্যবধান সত্ত্বেও এখানকার সংস্কৃতি উল্লেখযোগ্যভাবে সমগোত্রীয়। এদের মৌখিক ভাষা মালয়ী-পলিনেশীয় ভাষা, উপভাষায় সামান্য কিছু বিভিন্নতা অবশ্য রয়েছে। সংস্কৃতির এই মিলের কারণ হিসেবে নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, এখানকার বিপুল জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ দু হাজার থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ইন্দোনেশিয়া থেকে মাইক্রোনেশিয়ার সমুদ্র পথ বেয়ে এখানে পৌছয়। একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তারা বহন করে এনেছিল, তারপরে দ্বীপে দ্বীপে নতুন উপনিবেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। নতুন উপনিবেশে একাত্ম হয়ে যাওয়ার পরে শত শত বৎসর কেটেছে নিরুদ্বেগে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া অন্য উদ্বেগ ছিল না।

পলিনেশীয় জনগোষ্ঠীর পৌরাণিক আদি বাসভূমির নাম হাওয়াইকি। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন, হাওয়াইকি হল সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের রাইয়াতিয়া দ্বীপের ওপোয়া এলাকা। এখানেই তাদের সংস্কৃতির একটি কাঠামো গড়ে উঠেছিল, এবং তারপরেই তারা ছড়িয়ে পড়ে পলিনেশিয়ার চারদিকে। ৩০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই দ্বীপগুলিতে জনবসতি গড়ে ওঠে আর জীবনেও স্থিতি আসে।

তারপর বহু শত বছর পরে এল ভয়াবহ বিপর্যয়। এল ইউরোপীয় অভিযাত্রীদল। অন্য জায়গায় যেমন এখানেও তেমনি একই চিত্র। একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। পলিনেশিয়ার একেবারে পূর্ব প্রান্তে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ ইস্টার। ১৮৬০ সালে কয়েক হাজার আদিবাসীকে শেষ চালান দেওয়া হল সুদূর চিলিতে। এমন সময় শুরু হল ভয়াবহ বসন্ত রোগ। শেষ পর্যন্ত দ্বীপের আদিবাসী সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র ৬০০ তে। আদিবাসী সর্দার, পুরোহিত ও প্রধানেরা সবাই মৃত কিংবা নিহত। ১৮৬৮ সালে বাকি সবাই খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিতে বাধ্য হল। এই বিপর্যয়ের মধ্যে একমাত্র ভরসা মিশনারীরা। তারা মানবতা ভ্রাতৃত্ব সামাজিক স্থিতি সবই চান, কিন্তু এ চাওয়ার ওপরে আর একটু বেশি চান—তা হল They too wanted something, they wanted soul. নতুন শক্তিশালী সভ্য শ্বেতবর্ণের দেবতা আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত দেবতাদের হটিয়ে দিল। কালের বিবর্তনে স্বাভাবিক শিক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই 'উত্তরণ' ঘটলে কিছু বলার নেই,

কিন্তু যখন নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে ঐতিহ্য ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় তখনই দেখা দেয় জনগোষ্ঠীর জীবনে সামাজিক বিপর্যয়।

লোকসংস্কৃতির প্রাণ বড় বিস্ময়কর। তাই শত ঝড়ো প্রতিকূলতার মধ্যেও বেঁচে থাকে, যেমন গুল্ম বাঁচে পাহাড়ী ফাটলে কিংবা বরফ ঢাকা মাটিতে। পলিনেশিয়াতেও উজ্জ্বলভাবে বেঁচে আছে সেখানকার আদিবাসী সংস্কৃতি। মৌখিক ঐতিহ্য হারিয়ে গিয়েছে অনেক, যা আছে তার ভাণ্ডারও অসীম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপ আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন এইসব দ্বীপে বেশি পরিমাণে আসতে শুরু করে। আর তখন থেকেই এদের সম্পর্কে সত্যিকার গবেষণা শুরু হয়, শুরু হয় লোককথার সংগ্রহ। নানা বর্ণ, জাতি, সংস্কৃতির মানুষ আজ এখানে এক মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও ওশিয়্যানিয়া সম্পর্কে বাইরের জগতের জ্ঞান ছিল খুব সীমিত, যেটুকু ছিল তাও ভ্রান্তিতে পূর্ণ।৮ লুণ্ঠনের মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবেই ছিল তার পরিচয়।

পলিনেশীয় লোককথা

পলিনেশীয় জনগোষ্ঠী যেখানেই বসতি গড়ে তুলেছে সেখানেই মৌখিক ঐতিহ্যকে পরম যত্নে লালন করেছে। হাওয়াই বা নিউজিল্যাণ্ডের মতো ঘন জনবসতি এলাকাতে যেমন তেমনি আবার সুদূরের ছোট নির্জন দ্বীপ ইস্টারেও একই মৌখিক ঐতিহ্যের সন্ধান মিলবে। চারণ কবি, কথক কিংবা পুরোহিত একই ধরনের প্রাচীন সংগীত-লোককথা বলে যান। এই উত্তরাধিকারকে পলিনেশীয় জনগোষ্ঠী বলে 'ঐতিহ্যের রাত্রি।' সমস্ত দিনের কাজকর্মের শেষে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার উজাড় করে দেয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা, আর শ্রোতা নবীন বংশধরেরা। শুনতে পাওয়া যাবে বামধনু কন্যা হিনা, মাউই, তিনিরাউ, আকাশবিহারী তাওহাকি, নৌকাবিহারী রাজার কথা। এইসব লোককথার কাহিনী একদিন উৎসারিত হয়েছিল তাদের আদি বাসভূমিতে, পৌরাণিক হাওয়াইকিতে,—দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও একই ঐতিহ্য বয়ে চলেছে। বিস্ময়কর সাদৃশ্য। বিচ্ছিন্ন দূর দূর দ্বীপের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক একতা তাদের দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে।

ওশিয়্যানিয়া এলাকার লোককথা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি গবেষণা হয়েছে পলিনেশিয়ার লোককথাকে ঘিরে। অসংখ্য মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ডাবলু এলিস, ১৮৫৫ সালে জি. গ্রে, ১৮৭৬ সালে ডাবলু ডাবলু গিল. ১৮৮৭ সালে জে, হোয়াইট, ১৮৯১ সালে ই. ট্রেগিয়ার, ১৯০২ ৬ সালে এ, ক্র্যামার, ১৯০৭ সালে টি, জি, থ্রুম, ১৯.৬ সালে আর. বি. ডিক্সন, ১৯০৮ সালে টি. হেনরি, ১৯৭০ সালে এম. বেকউইথ পলিনেশিয়ার সংস্কৃতি ও লোককথা বিষয়ে অসাধারণ সব গ্রন্থ লিখেছেন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই এলাকা সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে এবং অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে এই এলাকার সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ অনেক ঘনিষ্ঠ হয়, সাংস্কৃতিক আদান প্রদান বেড়ে যায়। কিন্তু তবু আশ্চর্য মমতায় দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা তাদের লোককথাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এর প্রধানতম কারণ হল, এদের লোককথার সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। নৌকা তৈরির সময় এরা গান করেন, লোককথা বলেন। নৌকা তৈরিতে দরকার অসাধারণ দক্ষতা। কিন্তু এরা বিশ্বাস করেন, শুধুমাত্র দক্ষতা বা কারিগরী জ্ঞান থাকলেই চলবে না। তাই বৃদ্ধ যখন তরুণকে নৌকা তৈরির কলা কৌশল শেখান তখন একই সঙ্গে শেখান নৌকাকে কেন্দ্র করে যে লোকপুরাণ রয়েছে, যে আচার রয়েছে. যে অতি লৌকিক আর্শীবাদ রয়েছে। অর্থাৎ কারিগরী জ্ঞান ও ধর্মীয় ধ্যানধারণা একসঙ্গে শিক্ষা করতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে লোকসংস্কৃতির এই অনুশীলন করতে হয় বলে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আদিবাসী জীবন থেকে তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিবিক্ত হতে পারেনি। গাছ কাটা কিংবা গাছ থেকে নারকেল পাড়ার মতো অতি সাধারণ ঘটনাও আচার-অনুষ্ঠান পালন না করে সম্পন্ন করা হয় না। সেই আচার পালনের সময়ও লোকপুরাণ বলা হয়। বীর রাতা সঠিকভাবে আচার পালন না করে একটি গাছ কেটেছিল। পরের দিন কাঠ সংগ্রহ করতে এসে দেখে গাছ তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। পরপর কয়েকদিন একই ঘটনা ঘটে। শেষকালে রাতা বনদেবতার পুজো দিয়ে নৌকা তৈরির কাঠ সংগ্রহ করতে পারে। এই ধরনের লোকবিশ্বাস তাদের জীবনাচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ের অন্যান্য এলাকার মতো পলিনেশিয়াতেও সবচেয়ে বেশি সংগৃহীত হয়েছে লোকপুরাণ। আবার লোকপুরাণের

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল হিনা ও মাওই। এই গ্রন্থের শেষ লোককথাটি ও তার লোককথা পরিচয় অংশে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। দেবতা-দেবী-আত্মা-ভূত-প্রেত-অশুভ শক্তির সঙ্গে তাদের চিন্তা-চেতনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এদের ঘিরেই অসংখ্য লোকপুরাণের উৎসার। লতাপাতা আকাশ রামধনু সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি বিষয়ে নানা ধরনের সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণ রয়েছে।

অভিযানের কাহিনী নিয়ে রয়েছে অসংখ্য রূপকথা। এই জাতীয় রূপকথার নায়ক রাতা। গল্পের মালা গাঁথা হয়েছে এই বীর সমুদ্রযাত্রীকে ঘিরে। রাতাই নৌকা তৈরিতে সবচেয়ে দক্ষ। এই রূপকথার সঙ্গে লোকপুরাণের মেজাজ কোথাও কোথাও মিশে গিয়েছে, কেননা রাতা হল পৌরাণিক চরিত্র। যেহেতু অধিকাংশ দ্বীপে আদিবাসীরা অন্য দ্বীপ থেকে এসে বসতি গড়ে তোলে, তাই রূপকথার বিষয়বস্তুতে অভিযান সমুদ্র-ঝড় সামুদ্রিক প্রাণী তীরভূমিতে অসহায়া কন্যা প্রভৃতির কথা বারবার ঘুরেফিরে এসেছে।

রূপকথার নায়কেরা অনেক সময়েই অমিত শক্তির অধিকারী, কোনো ভালো কাজ করবার ফলে সে এই ক্ষমতা পেয়েছে দেবতার কাছে। তাদের জন্মও বড় অদ্ভুত। হয় তারা জন্মেছে ডিম থেকে কিংবা কোনো গাছ বা পাথর থেকে। প্রথমে তাদের দেহ মানুষের মতো থাকে না, পরে মানুষের আকৃতি পাবার পরে তারা পাতানো দাদু দিদিমার কাছে বড় হয়। এইসব নায়ক আবার অনেক সময় হয় জন্ম ট্যাটন। ইওয়া নামে একজন রূপকথার নায়কের গল্প রয়েছে যে মায়ের পেটে থাকতেই চুরিবিদ্যা শিখেছিল। তার ছিল একটি যাদু দাঁড়, নৌকোয় বসে চারটি আঘাত করলেই সে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যেতে পারত। ওনো নামে একজন দক্ষ জেলের কথাও আছে। তার সম্পর্কেও রয়েছে অসংখ্য রূপকথা।

পশুকথার খুব পরিচিত নায়ক নায়িকা হল সামুদ্রিক পাখি, কচ্ছপ, তিমি, চিংড়ি, শুয়োর ও মুরগী। পৃথিবীর অন্যান্য পশুকথার সঙ্গে একই সাদৃশ্য রয়েছে, তা হল শক্তিহীন ছোট্ট পশুপাখি সবসময়েই জয়ী হবে, দেহের বলে নয়, বুদ্ধি কৌশলে।

পলিনেশিয়ার লোককথার বৈশিষ্ট্য হল, দ্বীপময় এলাকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে

থাকা সত্ত্বেও তাদের মৌখিক ঐতিহ্যের আশ্চর্য মিল। একই উত্তরাধিকার রয়েছে বলেই এটা সম্ভবপর হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া

১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে ১৩মে ইংলণ্ডের বন্দর থেকে ক্যাপ্টেন আর্থার ফিলিপ ৬টি কিশোর ও ৫টি কিশোরীসহ ৭৭১ জন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীকে নিয়ে রওনা হলেন, অস্ট্রেলিয়ার তীরভূমিতে পৌঁছলেন ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি। এ দেশ হয়ে উঠল স্বাভাবিক উন্মুক্ত জেলখানা। ইউরোপীয় বসতি গড়ে উঠতে লাগল, তিরিশ হাজার বছরের বিচ্ছিন্ন সামাজিক জীবনের অবসান ঘটল। এই সময়ে এই মহাদেশের আদিবাসী সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ। কিন্তু এই সংখ্যা বিস্ময়করভাবে কমতে থাকে পরবর্তী বছরগুলোতে। জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ সেই এক অমানবিক আচরণ ও রোগ।৯ অথচ আগে তাদের মধ্যে এই ধরনের কোনো রোগ ছিল না।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সমুদ্র-যাত্রার যে প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় তা এই মহাদেশকে কেন্দ্র করেই। আদিবাসীদের জ্বালানো কাঠকয়লার রেডিয়ো-কারবন পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে এরা তিরিশ হাজার বছর আগে এই মহাদেশে এসেছে। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়ার পথ বেয়ে তারা এখানে আসে। কিছু বিজ্ঞানী দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়দের সঙ্গে এই মহাদেশের আদিবাসীদের নানাবিধ মিল দেখে বিস্মিত হয়েছেন। রুশ বিজ্ঞানী আলেকজান্দার কনদ্রাতভ 'লেমুরিয়ার রহস্য' আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য উপস্থাপন করেছেন। যাইহোক, এরাই যে পৃথিবীর আদি সমুদ্রযাত্রী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এখানকার আদিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ৫০০টি ভাষা ও ৬০০টি উপভাষা প্রচলিত ছিল। অনেক গোষ্ঠী আবার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সময় এক বিশেষ ভাষা ব্যবহার করত যা দৈনন্দিন জীবনে কোনোভাবেই উচ্চারিত হত না। এখনও বহু ভাষা ব্যবহৃত হয়। তবে পশ্চিম মরুভূমি এলাকার কয়েকটি উপভাষাই বর্তমানে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

আদিবাসী পুরুষেরা প্রধানত শিকারী ও মৎস্যজীবী আর নারী ও শিশুরা ফলমূল সংগ্রহ করে। ক্যাঙারু, এমু, পোসাম, সাপ প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার

ধরা হয় ফাঁদ ও জাল পেতে, গর্ত খুঁড়ে কিংবা বুমেরাং দিয়ে। এখানকার আদিবাসীদের এক আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে। পদচিহ্ন, গাছের ভাঙা ডাল, পায়ের আঘাতে সরে যাওয়া পাথর অথবা হাওয়ায় গন্ধ পেয়ে তারা বলে দিতে পারে কোন জন্তু চলে গিয়েছে। খুব ছেলেবেলা থেকে তাদের এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। পাথরের অস্ত্র তৈরিতে এখানকার প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠী অত্যন্ত দক্ষ।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী লোককথা

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ব্রিটিশ ও ডাচ অভিযাত্রীরা দলে দলে এই 'জীবন্ত জীবাশ্মের প্রাকৃতিক যাদুঘরে' আসতে শুরু করে। আর উনিশ শতকের শেষদিকে এখানকার আদিবাসী সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান, গবেষণা ও গ্রন্থপ্রকাশ শুরু হয়। আদিবাসী সংস্কৃতি ও তাদের লোককথা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৮৯৭ সালে কে. এল. পার্কার, ১৯০৪ সালে এ. এইচ. হোউইট, ১৯০৫ সালে এ. গেনেপ, ১৯১৬ সালে আর. বি. ডিক্সন, ১৯২৭ সালে বি. স্পেন্সার ও এফ. জে. গিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে আরও ব্যাপক গবেষণা হয়।

এই ক্ষুদ্রতম মহাদেশের আদিবাসীদের লোককথায় পশু সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে রয়েছে। এদের লোকপুরাণেও পশু অগ্রাধিকার পেয়েছে। এমু, গিরগিটি, ক্যাঙারু, ডিম-পাড়া স্তন্যপায়ী প্লাটিপাস প্রভৃতি জন্তু লোকাচার ও লোককথার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

লোককথার পাত্রপাত্রী ভিন্ন হলেও অস্ট্রেলিয়ার অসংখ্য লোককথায় পলিনেশীয় মাওই লোকপুরাণ, মেলানেশীয় বুদ্ধিমান ও নির্বোধ ভাইদের গল্প কিংবা ইন্দোনেশিয়ার ট্যাটনের গল্পের সঙ্গে প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। হয়তো পুরনো কালের ঐতিহ্যের রেশ রয়ে গিয়েছে।

লোকপুরাণে যে সব নায়ক-নায়িকা তাদের পূর্বপুরুষ বলে চিহ্নিত হয় তারা একসময় ছিল মানুষ কিংবা মানুষ ও গাছ বা মানুষ ও পশুর মিশ্রিত রূপ। এইসব চরিত্রকে কেন্দ্র করে 'অনন্ত স্বপ্নের' অগুণতি লোককথা প্রতিটি গোষ্ঠীতেই রয়েছে। দুটি মানুষ 'ওয়াতি কুত্জারা'র অনন্ত স্বপ্নের সবচেয়ে জনপ্রিয়।

লোকাচারের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত যে সব লোককথা রয়েছে সেগুলো বলা হয় বিশেষ বিশেষ সময়ে। তা ছাড়া অন্যান্য লোককথা যে কোনো সময়েই বলা হয়। কেউ শুনতে চাইলেই লোককথা বলা হয়। দৈনন্দিন কাজের মতোই লোককথা বলাও যেন বয়স্কদের একটা কাজ।

আদিবাসী লোককথায় আদি মাতার অসংখ্য কাহিনী রয়েছে। আর্ন্‌হেম এলাকার পশ্চিমে যে সব আদিবাসী রয়েছে তারা আদি মাতা সম্পর্কে বলে, আদি মাতা পূর্ব সমুদ্রের পথ বেয়ে এসেছিল, তার দেহ থেকে সে গাছগাছালি প্রাণী সৃষ্টি করল এবং চারিদিকে তাদের ছড়িয়ে দিল। সে প্রতিটি গোষ্ঠির জন্য আলাদা আলাদা ভাষা শিখিয়ে দিল। এই আদি মাতাকে নিয়ে আলাওয়া ও আবাওা আদিবাসী গানের ভঙ্গিতে লোককথাও শুনিয়ে থাকে। আবার সব সময় গর্ভবতী থাকে এমন দুই বোনের গল্পও আছে, তারা উর্বরতাতান্ত্রিক ধারণার প্রতীক। তারাও মা।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী আজও সবচেয়ে প্রাচীন জীবনধারা বয়ে চলেছে। অধিকাংশ গোষ্ঠিই এখনও বৃহত্তর জনজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করে। অনাহার-অপুষ্টি-খাদ্যাভাব-খরা প্রভৃতি তাদের নিত্যসঙ্গী। অথচ লোককথার যে উন্নত ভাণ্ডার তাদের মৌখিক ঐতিহ্যে লালিত হয়ে আজও বহমান রয়েছে তা বিস্ময়কর। অপরাজেয় মানুষ তার লৌকিক সংস্কৃতিকে যে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সংস্কৃতি।

লোককথার মাইগ্রেশন

মেলানেশিয়া মাইক্রোনেশিয়া পলিনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার লোককথায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নিয়েও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে, এইসব এলাকায় যেমন জনবসতির মাইগ্রেশন ঘটেছে ব্যাপকভাবে, তেমনি লোককথাও নতুন নতুন রূপে কিংবা কখনও একইভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ফিলিপাইন্‌স্‌-এর লোককথার সঙ্গে সাদৃশ্য খুব বেশি। লোককথার এই মাইগ্রেশন বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্যও যথেষ্ট।

একদল সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী মনে করেন, এইসব লোককথা নিরপেক্ষ-

ভাবেই লোকসমাজে গড়ে উঠেছে, কোনো মাইগ্রেশন-এর প্রয়োজন হয়নি। পৃথিবীতে মানব-সমাজের অসম সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে। বিকাশের এইসব স্তরে মানুষ সার্বজনীন কতকগুলি অভিজ্ঞতা অর্জন করে। আর এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে মৌখিক সাহিত্যে রূপ দিতে গিয়ে তারা সদৃশ চিন্তাকেই প্রতিফলিত করে। সকল সমাজের অভিজ্ঞতাই মূলত এক, তাই লোককথার মাধ্যমে একই কাহিনী রূপ পায়। পার্থক্য শুধু পাত্রপাত্রীর নামে। তারা বলেন, বিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কহীন অবস্থাতেই এইসব লোককথার জন্ম হয়েছে। পৃথিবীর বহু এলাকার লোককথার জন্ম-ইতিহাস সম্পর্কে এই তত্ত্ব নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক।

কিন্তু যেসব এলাকায় মানুষের নতুনভাবে বসতি গড়ে তোলার ইতিহাস অত্যন্ত স্পষ্ট, সেখানে আক্ষরিক অর্থেই লোককথার মাইগ্রেশন হয়েছে। আজকের পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ত্রিনিদাদ, লিওয়ার্ড, বারবাডোস, ভার্জিন. টোবাগো, জ্যামাইকা প্রভৃতি দ্বীপের অধিকাংশ বাসিন্দা এককালে এসেছিল আফ্রিকা থেকে। খনি-নদী-বাগিচা ও ক্ষেতে কাজের জন্য শত-সহস্র ক্রীতদাস আমদানি করতে হয়েছিল। এরা এসেছিল আফ্রিকার কঙ্গো, ক্যামেরুন, দাহোমে, সেনেগাল, কেনিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে। তারা আজ স্বদেশভূমি থেকে অনেক দূরে. তাদের আদি ধর্ম ও ভাষা তারা ভুলে গিয়েছে। নতুত পরিবেশে নতুন মানুষ। কিন্তু তাদের লোককথা বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, আফ্রিকার লোককথা কিছুটা ভিন্নভাবে তারা বলে চলে। ঐতিহ্য মিশে রয়েছে চিন্তা-চেতনায়। এই এলাকায় আক্ষরিকভাবেই লোককথার মাইগ্রেশন ঘটেছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও এই একই ঘটনা ঘটেছে। সেখানকার আফ্রো-আমেরিকান জনগণের লোককথা বিশ্লেষণ করেও দেখা গিয়েছে, আফ্রিকার লোককথা নানাভাবে তাদের বর্তমান লোককথার ভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছে। আমেরিকাতে আক্ষরিক অর্থেই আফ্রিকার জনসমাজের মাইগ্রেশন ঘটেছে, তাই লোককথাও এসেছে মৌখিক ঐতিহ্য হিসেবে। আমেরিকার লোককথায় শুধু আফ্রিকার প্রভাব নয়, আরও ব্যাপক প্রভাব ঘটেছে। সম্প্রতি নৃবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, চারটি পথে আমেরিকায় লোককথার মাইগ্রেশন হয়েছে।১০

আসলে, পঞ্চদশ শতক থেকে পৃথিবীর চতুর্দিকে যখন ইবরোপীয় অভিযাত্রী দল জাহাজে চেপে নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হল তখন

থেকেই লোকসমাজের নতুন বসতি সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হল। আর তাই এই সময় থেকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষের যাতায়াত সম্পর্কেও আমরা বিস্তৃতভাবে জানতে পারলাম। বিশেষ করে, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস চালানের মধ্য দিয়ে যে মাইগ্রেশন ঘটল তার সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। আর স্বাভাবিকভাবেই লোককথাও এল নতুন দেশে।

কিন্তু সেই সুদূর কালে মানুষ যে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় নতুন বসতি গড়ে তুলেছিল তার তো কোনো লিখিত ইতিহাস নেই। তাই মাইগ্রেশন যে ঘটেছে সেটা প্রমাণ করাও বড় সহজ নয়। যদিও ভাষা-সংস্কৃতি-আচার-পুজো-পার্বণ-জীবাশ্ম-লোককথা প্রভৃতির ওপরে নির্ভর করে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মিলেছে, তবু সন্দেহ থেকেই যায়। ওশিয়্যানিয়া এলাকায় যে মানুষ ও তার মৌখিক ঐতিহ্যের মাইগ্রেশন ঘটেছে সে বিষয়ে আজ আর কারও কোনো সন্দেহ নেই। তবে তিরিশ হাজার বছর আগেকার এই ইতিহাসটি আজও যথাযথভাবে লিখিত হয়নি।

মাইগ্রেশন ঘটে দুভাবে। বাধ্যতামূলক দেশত্যাগ। পূর্ব ভারতীয় ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকা প্রভৃতি এলাকায় যে বিপুল সংখ্যক এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষ রয়েছে, তাদের এই নতুন বসতিতে আনা হয়েছে জোর করে। এই বাধ্যতামূলক মাইগ্রেশনের ফলে তারা তাদের মাতৃভাষা ভুলতে বাধ্য হয়েছে, নিজস্ব ধর্ম ত্যাগ করে বেশির ভাগ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছে, আর নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। নতুন দেশে নতুন মাতৃভাষা গ্রহণ করে নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে প্রায় একাত্ম হয়ে উঠেছে। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে লোককথার পুরনো রেশ অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু তা খণ্ডিত। বর্তমান পরিবেশে সেই আদি লোককথার মূল রূপটি আবিষ্কার করা তাই বেশ কষ্টকর।

আর একটি হল স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ। অবশ্য এখানেও কিছুটা বাধ্যবাধকতা থাকে। যুদ্ধে-পরাজয়-বন্যা-খরা-খাদ্যাভাব প্রভৃতি কারণে এই দেশত্যাগ ঘটে। তবে কোনো গোষ্ঠী জোর করে দেশত্যাগে বাধ্য করায় না। ওশিয়্যানিয়া এলাকায় ঘটেছে এই ধরনের দেশত্যাগ। ইন্দোনেশীয় অঞ্চল বা ভারতের দক্ষিণ এলাকা যেখান থেকেই দলে দলে মানুষ মাইক্রোনেশিয়া মেলানেশিয়া পলিনেশিয়া অস্ট্রেলিয়ায় যাক না কেন তারা গিয়েছে স্বেচ্ছায়। ফলে, তাদের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি-আচার-পার্বণ প্রভৃতি বিসর্জন দিতে হয়নি। কালের প্রভাবে, নানা জাতির সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক মিশ্রণের ফলে তাদের ভাষা-

সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটেছে কিন্তু একেবারে ত্যাগ করতে হয়নি। তাই পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ কিংবা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যারা এল তাদের মাতৃভাষা আজ ইংরেজি, ধর্মও আলাদা। কিন্তু ওশিয়্যানিয়া কিংবা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের বৃহত্তর অংশই পুরনো ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। নানা প্রতিকূল ঢেউ আছড়ে পড়লেও তাদের নিজস্বতাকে একেবারে মুছে দিতে পারেনি। মাইগ্রেশন আলোচনার সময় এই দুটি ভিন্ন রূপকে মনে রাখতে হবে।

আসলে লোকসংস্কৃতি কখনও বিলুপ্ত হয় না, তা বিবর্তিত হয়, নতুন সামাজিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিবেশে নতুনতর রূপ নেয়, নতুনভাবে সৃষ্টি হয়। সামাজিক প্রয়োজনেই লোকসংস্কৃতির কিছু কিছু অংশ হারিয়ে যায়, শুকিয়ে যায়, লোকমানসে সেগুলো অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু মূল বিষয়ের পরম্পরা বা ধারা কখনই একেবারে বিলুপ্ত হতে পারে না। সামাজিক সম্পর্কে মানুষ যেখানে আবদ্ধ, সেখানেই লোকসংস্কৃতির উর্বর ক্ষেত্র। আদিবাসী জনসমাজ সবচেয়ে বেশি প্রতিকূলতা সহ্য করেছে, সবচেয়ে নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করেছে,—এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য রয়েছে, তারা প্রতিকূল আঘাতকে প্রতিহত করেছে বারবার। যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েও আবার পথ চলেছে। তাই আদিবাসী সংস্কৃতি বেঁচে থাকবে বহতা নদীর মতো, সুউচ্চ পর্বতের মতো, সবুজ বনানীর মতো, সহজ সুরের গানের মতো। যে মানুষ এই সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে, সে মানুষ যতদিন থাকবে, এই সংস্কৃতিও ততদিন আপন প্রাণময় অস্তিত্ব সগর্বে ঘোষণা করবে।

১. No other Micronesians suffered from the unwanted attentions of Europeans quite so rapidly or drastically as the Chamorro, but the strategic position of most of their islands meant that freebooters, whalers, blackbirders and traders were inevitably followed by the official claim-staking of both European and Asian nations. Oceanic Mythology : Roslyn Poignant. Page 7o.

২. Myths from the Gilbert Islands : A. Grimble. 1922

৩. Micronesians protect eels with a severe tabu. Eels,

malevolent or friendly, are important in myths, particularly those about clan origins. Katharine Luomala : Micronesian Mythology. The Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend, Ed. by Maria Leach, page 719

৪. As to the name of Irihia, it is of interest to remember that Vrihia was an ancient Sanskrit name for India, and that this name can be pronounced by the Maori as Irihia or Wirihia. The word Ari. the name of a very important food-supply of Irihia, is the Dravidian word for rice, and it may be compared to Vari, Wari, Pari etc , all of which denote rice. An old Sanskrit name for rice was Vrihi, which may possibly have been the origin of the name Vrihia. Again Mr. S. Percy Smith has shown in his work Hawaiki that Hawaiki-te-Varinga is mentioned in Rorotongan tradition as a name for the homeland and here again this Vari = rice word appears

The Maori as he was : Elsdon Best. 2nd Ed. Pages 18-19.

৫. Maori traditional history deals in large part with this migration and subsequent events. Ancient history of the Maori : J. White. Page 37.

৬. Religion also has played a mighty role everywhere in the encouragement of the narrative art, for the religious mind has tried to understand beginnings and for ages has told stories of ancient days and sacred beings. Often whole cosmologies have unfolded themselves in these legends, and hierarchies of gods and heroes.

The Folktale : Stith Thompson, 1922. Pages 5-6

৭. European Civilization brought in its train other evils no less deadly than murder. Of these the worst was disease.

These peoples, who had adjusted their life very exacty to physical conditions, were immune from most diseases so long as they were left alone. Their bodies hardended by life in the open air, and sustained by the crude food to which they had been accustomed for centuries, were quite unable to withstand the ailments brought by the whites. C. M. Bowra: Primitive song. The New American Library. Page 34.

৮. Our information with respect to the domestic institutions of the inhabitants of Polynesia Micronesia and the Papuan Islands is stili limited and imperfect........An exposition of their institutions, inventions and discoveries, and moral and mental traits, would supply one of the great needs of anthropological science. Lewis Henry Morgan: Ancient society. Indian Ed. Pages 386-7.

৯. Numbers declined dramatically with the colonization of Australia, sometimes without direct contact with the white man. Whole groups vanished within a few years due to introduced diseases and conflicts: Australian Aboriginal culture, The Australian Unesco committee for Museums, Second

১০, It abstracts in four channels, from Europe across the North Atlantic. from Africa across the South Atlantic, from Northeast Asia via the Bering Strait, and from Southeast Asia across the South Pacific.

It extends from the first migralions of Mongoloids from Asia, centuries before Columbus, to very recent centuries, The migration of Folktales: Francis Lee Utley. Current Anthropology, A journal of the University of Chicago.

যে গল্পের শেষ নেই

ছোট ছোট উঁচু-নিচু পাহাড়। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে এক নদী। নদীর দুপারে দুটি গ্রাম। চওড়া নদী, টল্‌টলে জল। দু গাঁয়ে থাকে ইঁদুর। অনেক অনেক ইঁদুর। পাহাড়ের কোলে, গাছের কোটরে তাদের সুন্দর বাড়ি। কোনো দুঃখ নেই।

সব দিন সমান যায় না। একবার গাঁয়ে হল প্রচণ্ড খরা। সব ফসল জ্বলে গেল, সব ফল ছোটতেই ঝরে পড়ল, সরস বিট-গাজর মাটিতেই শুকিয়ে গেল। খাবার মতো কিছুই রইল না। নদীর জল খেয়ে তো আর বেঁচে থাকা যায় না?

পাতা-ঝরা এক গাছের নিচে সভা বসল। বুড়োরা বলল, আমরা অনেক দেখেছি। ফসল হতে আরও এক বছর লাগবে। না খেয়ে বেঁচে থাকা যাবে না। ছোটরা তো আগে মরবে। চল, অন্য গাঁয়ে যাই। নদীর ওপারে অন্য গাঁয়ে। সুদিন এলে আবার ফিরে আসব।

বিশাল এক ডিঙিতে তারা উঠল। সবাই উঠল। ডিঙি ভেসে চলেছে। তাদের চোখে জল, তবু নতুন আশায় বুক নাচছে। খিদে আর কত সহ্য করা যায়!

মাঝ নদীতে ডিঙি। ওপার থেকে আর একটা ডিঙি এসেছে মাঝ নদীতে। কোথায় চলেছ? ওপারে। এপারে ভীষণ খরা। সব কিছু পুড়ে গিয়েছে। কিছু নেই খাবার। তা, তোমরা? তোমরা চলেছ কোথায়? ওপারে। এপারে সব শেষ। সব ফসল নষ্ট। কিছু নেই খাবার।

কথা নেই কারও মুখে। নদীর দুপারে দু গাঁয়ে একই অবস্থা। ওপারে গিয়ে লাভ নেই, এপারে এসে লাভ নেই। তাহলে? বাঁচার কোনো পথ নেই। শুকিয়ে মরে কোনো লাভ নেই। সবাই মিলে ঠিক করল, সুন্দর ঠাণ্ডা টল্‌টলে জলে ডুবে মরবে। সেই ভালো।

একটা ইঁদুর চু চু করে কাঁদল, লাফ দিল জলে। হাবুডুবু খেল। তলিয়ে গেল জলে। আর একটা ইঁদুর চু চু করে কাঁদল, লাফ দিল জলে। হাবুডুবু খেল। তলিয়ে গেল জলে। আর একটা ইঁদুর চু চু····· আর একটা ইঁদুর·······আর একটা·······আর·······

আমরা এলাম কোথা থেকে

আজ আমরা সবাই এই পৃথিবীতে বাস করছি। আমরা দ্বীপে দ্বীপে থাকি। কিন্তু এমনটা চিরকাল ছিল না। আমরা তখন আকাশের ওপাশে থাকতাম। সব মানুষ ওখানেই থাকত।

একবার আমাদের সর্দারের মেয়ের খুব অসুখ করল। সে অসুখ আর সারেই না। কত বদ্যি, কত ওঝা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শেষকালে এক নুয়ে-পড়া বুড়ো ওঝা বলল, 'মেয়ের অসুখ সারবে। তবে ওভাবে নয়। বুনো ডুমুর গাছের শেকড়ের মধ্যে মেয়ের রোগ সারাবার উপায় রয়েছে। ডুমুর গাছের গোড়ার মাটি সরিয়ে ফেল, নিচের শেকড়ে হাত ছোঁয়ালেই মেয়ের অসুখ সেরে যাবে।'

কয়েকজন যুবক লেগে গেল বুনো ডুমুর গাছের গোড়ার মাটি সরাতে। অনেক নিচে শেকড়। মাটি উঠছে, মাটি উঠছে, ওরা নিচু হচ্ছে, আরও নিচু। নিচের শেকড় বেরিয়ে পড়ল।

বাবা মেয়েকে ধরে ধরে গাছের গোড়ায় নিয়ে এল। মেয়ে নিচু হয়ে শেকড় স্পর্শ করতে গেল। হাত পেল না। আরও নিচু হতে হবে। মেয়ে মাথা নুইয়ে পিঠ বেঁকিয়ে আরও নিচু হল। হাত ছোঁয়াল শেকড়ে। কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে গর্তে ঢুকে গেল। ঝুরোঝুরো আলগা মাটি, মেয়ে পিছলে গেল। গর্তে পড়ে গেল।

আকাশের ফুটো দিয়ে মেয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে। সবাই হাহাকার করে উঠল। কিন্তু কিছুই করার নেই। পড়ছে শুকনো পাতার মতো উলটে-পালটে নিচে পড়ছে। মেয়ে আর বাঁচবে না। কেন না, আকাশের নিচে শুধুই জল। দাঁড়াবার কোনো ঠাঁই নেই। আর ওপর থেকে অত জোরে নিচে পড়লে, জলে আঘাত পেয়েই মেয়ে মরে যাবে। হায়! হায়! হায়!

এমন সময় দুটো বুনো হাঁস উড়ে যাচ্ছিল। তারা মেয়েকে দেখতে পেল। চমকে উঠল। প্রাণ কেঁদে উঠল। গলা লম্বা করে পা দুটো পেছনে সোজা করে তারা উড়ে এল মেয়ের কাছে। গলা নিচে নামিয়েই দুটো হাঁস মেয়ের

দেহের নিচে নেমে এল। মেয়ে এখন হাঁস দুটির পিঠে শুয়ে রয়েছে। তারা নামছে, নামছে, —নিচের জলের দিকে নামছে।

নিচে জলের ওপরে ভেসে রয়েছে বিশাল কচ্ছপ। মুখ তুলে সে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। মেয়ে নামছে বুনো হাঁসের নরম পিঠে। কচ্ছপ তাড়াতাড়ি সব সাঁতারু জন্তুকে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে সভা বসে গেল। সবাই তাকাল আকাশের দিকে। বলল, 'যেমন করে হোক মেয়েকে বাঁচাতেই হবে। তাকে আশ্রয় দিতেই হবে। আহা, আকাশের ওপাশের মেয়ে।' তাদের প্রাণ কেঁদে উঠল।

দলপতি কচ্ছপ সোনা ব্যাঙকে আদেশ করল, 'সোনা ব্যাঙ, জলের নিচে ডুব দাও। নিচে, অনেক নিচে চলে যাও। জলের তলায় অনেক গাছ আছে। সেই গাছেব গোড়া থেকে কাদা তুলে আনো। দেরি করবে না।'

সোনা ব্যাঙ একবাব ওপরে মেয়ের দিকে তাকাল, তারপর জলে ডুব দিল। জলে কয়েকটা বুদ্‌বুদ্‌ দেখা গেল, আবার শান্ত হল জল। সবাই তাকিয়ে বয়েছে জলের সেইখানটায়, যেখানে সোনা ব্যাঙ ডুব দিয়েছিল। তাদের প্রাণ কাঁদছে। ভস্‌ করে সোনা ব্যাঙ জলে মাথা তুলল। না, সে পারেনি। জলের নিচে গাছের গোড়া থেকে কাদা তুলে আনতে পারেনি।

দলপতি কচ্ছপ শুশুককে আদেশ দিল, 'জলের নিচে গাছের গোড়া থেকে কাদা নিয়ে এস। দেরি করবে না।' আদেশ পেয়ে পাছা উল্‌টিয়ে শুশুক জলের নিচে ডুব দিল। তাদের প্রাণ কাঁদছে। ওপরের মেয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসছে।

কিছুটা জল ছল্‌কে পড়ল। জলের গর্তে মুখ তুলল শুশুক। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে। না, সে পারেনি। জলের নিচে গাছের গোড়া থেকে কাদা তুলে আনতে পারেনি।

শেষকালে কোলা ব্যাঙ নিজে থেকেই বলল, 'আমি চেষ্টা করে দেখি। কাদা তুলে আনতে পারি কিনা।'

একথা শুনেই সাঁতারু জন্তুরা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তারা কোলা ব্যাঙকে উৎসাহ দিল। কিন্তু বিশাল কচ্ছপ চুপ করে রইল। গম্ভীর হয়ে বলল, 'কোলা ব্যাঙ, বেশ তুমি চেষ্টা করে দেখ। মনে হয় তুমি পারবে। যে ভাগ্যবান সে-ই পারবে।' তাদের প্রাণ কাঁদছে।

কোলা ব্যাঙ বুক ফুলিয়ে গলা ফুলিয়ে জোরে নিঃশ্বাস টেনে নিল, তারপর

মুখ-চোখ বন্ধ করে জলের নিচে ডুব দিল। নিচে, আরও নিচে। পেছনের পা দুটো লম্বা করে মাথা নিচু করে কোলা ব্যাঙ নিচে নেমে যাচ্ছে। দম আটকে আসছে, বুক ফেটে যাচ্ছে, চোখ বেরিয়ে আসতে চাইছে। তবু কোলা ব্যাঙ হাল ছাড়েনি। সবাই চেয়ে আছে সেইখানটায়, যেখানকার জলে ডুব দিয়েছে কোলা ব্যাঙ। জলের ওপরে কয়েকটা বুদ্‌বুদ্‌ ফেটে গেল। কোলা ব্যাঙের মাথা জেগে উঠল জলের ওপরে। আহ্., কি আনন্দ। কোলা ব্যাঙের মুখে কিছুটা চক্‌চকে বালি। কোলা ব্যাঙ পেরেছে।

বালি নিয়ে কোলা ব্যাঙ বিশাল কচ্ছপের ঢালু পিঠে ছড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল কচ্ছপের পিঠে গজিয়ে উঠল একটি দ্বীপ। সুন্দর দ্বীপ। এই দ্বীপটিই হল বোহোল্‌ দ্বীপ। জলের বুকে প্রথম ডাঙা। বুনো হাঁসের নরম পিঠ থেকে মেয়ে নামল এই দ্বীপে। মেয়ে বেঁচে থাকবে। তাদের প্রাণ শান্ত হল।

নাতি-নাতনিরা, খুব ভালো করে যদি কচ্ছপের পিঠ দেখ, তবে দেখবে আমাদের এই বোহোল্‌ দ্বীপের মতোই কচ্ছপের পিঠ। আসলে, কচ্ছপের পিঠই তো এই বোহোল্‌ দ্বীপ। কি মিল! এই মেয়েই আমাদের আদি মাতা। আমরা সবাই তার ছেলেমেয়ে। তখন থেকেই আমরা পৃথিবীতে থাকি, দ্বীপে দ্বীপে থাকি।

কিন্তু তখন আর এক বিপদ। মেয়ে শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। হাঁটুর মধ্যে মুখ রেখে মেয়ে বসে রয়েছে, মেয়ে কাঁপছে। তাদের প্রাণ আবার কেঁদে উঠল। তার আরও আলো চাই। পৃথিবীতে তখন এত আলো ছিল না। চাই আরও আলো। তবেই মেয়ের দেহ গরম হবে।

সব সাঁতারু জন্তু মিলে আবার সভায় বসল। অনেক সলা-পরামর্শ হল। ছোট্ট কচ্ছপ গলা নেড়ে বলল, 'আমি যদি আকাশে উঠতে পারতাম, তবে সব বিদ্যুৎ এক জায়গায় জড়ো করে অনেক আলো তৈরি করতাম। মেয়ের কষ্ট ঘুচত। শীতে এমন করে বসে থাকতে হত না।' সকলের প্রাণ কাঁদছে।

বিশাল কচ্ছপ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার। হয়তো তুমি পারবে। যে ভাগ্যবান সে-ই পারবে।'

এক পাশে সরে গিয়ে ছোট্ট কচ্ছপ চুপ করে বসে রইল। সে যেতে চায় দূর আকাশে। কিন্তু কেমন করে? কেমন করে দূর আকাশে যেতে হয় তা সে

জানে না। কিন্তু যেতে চায়। মেয়ের বড কষ্ট। আহা, ও কেমন অন্ধকারে জডসড হয়ে বসে রয়েছে। চারিদিকে কি অন্ধকার। মেয়ে তো আলোর দেশের মেয়ে। ধব্‌ধবে আকাশ, চম্‌কানো বিদ্যুৎ। সে পারবে কেন এই অন্ধকারে থাকতে ?

ভাবছে, ভাবছে, —ছোট্ট কচ্ছপ ভাবছে। বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে, আর কষ্টে মাথা নিচু করে নিচ্ছে। শেষকালে খোলের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে নিল। কোনো আশা নেই, আকাশে উঠবার কোনো পথ নেই।

হঠাৎ আকাশে মেঘগুলো কেমন ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল। কেমন এধার ওধার সরে সরে যাচ্ছে। নিচে নেমে আসছে। হাওয়া বইছে এলোমেলো। দ্বীপের চারপাশের জলে ঢেউ, প্রবল ঢেউ। ভীষণ ঝড। শোঁ শোঁ শব্দ। জল আছড়ে পডছে। দমকা হাওয়া। হঠাৎ এক দমকা ঝড়ো হাওয়ায় ছোট্ট কচ্ছপের দেহ মাটি থেকে ওপরে উঠল। হাওয়ার বেগে আকাশের দিকে চলেছে ছোট্ট কচ্ছপ। কোনো চেষ্টাই তাকে করতে হচ্ছে না। সে পৌছে গেল আকাশের রাজ্যে। আহ্‌, কি শান্তি! আর কষ্ট পাবে না আকাশের মেয়ে। অনেক আলো, দিনে আলো, রাতে আলো।

ছোট্ট কচ্ছপ অনেক বিদ্যুৎকে জড়ো করল, —অনেক অনেক অনেক। বেশি বিদ্যুৎ দিয়ে গড়ল একটা গোলাকার সুন্দর জিনিস, অল্প বিদ্যুৎ দিয়ে তৈরি করল আর একটা গোলাকার সুন্দর জিনিস। একটার মধ্যে বেশি, সাদা উজ্জ্বল আলো। অন্যটার আলো কম, নরম মিষ্টি আলো। একটা আলো দেবে একসময়, অন্যটা অন্যসময়। মেয়ে বাঁচবে, মেয়ে বেঁচে রইল।

এ দুটো হল সূর্য আর চন্দ্র। একটা দিনের আলো, আরেকটা রাতের আলো। সবসময় আলো। আকাশের আলো আমাদের দ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন থেকে ছড়িয়ে পডেছে।

ভুল খবর

অনেক অনেক কাল আগের কথা। অনেক পুরনো দিনের কথা। সেই পুরনো দিনে আমরা সবাই ছিলাম দাস, ক্রীতদাসও বলতে পার। দিন-রাতের সবটুকুই অন্যের জন্য বাঁধা ছিল। নিজের ইচ্ছে বলতে কিছুই ছিল না।

সেই পুরনো দিনে শুধু গোষ্ঠীপতি ছিল অন্যরকম। সে ক্রীতদাস ছিল না। থাকবে কেমন করে? আমরা যে তারই কাজকর্ম করতাম। সর্দারের সবকিছু করতাম। না করে উপায় ছিল না। কিন্তু এ জীবন আর ভালো লাগে না। বড কষ্টের। কতদিন ধরে চলবে এই ক্রীতদাসের জীবন?

একদিন সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে তারা সকলে পাশের বনে গেল। অনেক কথা হল। শেষকালে তারা ঠিক করল, একজন দূতকে পাঠাবে দেবতার কাছে। তিনিই শুধু বুঝবেন তাদের কষ্ট। দেবতা থাকেন ঐ দূর পাহাড়ের ওপারে, বন পেরিয়ে সেখানে যেতে হবে।

দূত হবে কুকুর। সেই সবসময়ের বন্ধু। কুকুর কখনও কথার খেলাপ করে না, সে বড় বিশ্বস্ত। তাছাড়া কুকুরের মতো গতি আর কার আছে? সে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে দূরের দেবতার কাছে। সেই তাহলে দূতের কাজ করুক।

বন্ধু কুকুরও রাজি। মানুষের উপকার করবে, এতে তার খুব আনন্দ। সে দৌড় দিল বন-বাদাড় পেরিয়ে। তাকে আর দেখা গেল না। গাঁয়ের মানুষ নিশ্চিন্ত হল। দেবতা এবার তাদের কষ্ট দূর করবেন।

এক গাঁয়ের পাশ দিয়ে কুকুর দৌড়ে যাচ্ছে। সে হাঁপিয়ে পড়েছে, জিব বেরিয়ে পড়েছে, ঘামে দেহের লোম ভিজে উঠেছে, অনেক আস্তে চলেছে সে। হঠাৎ খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে কুকুর দেখতে পেল, ঘরের মধ্যে বসে এক বুড়ি উনুনে কি যেন ফোটাচ্ছে। উনুনের মুখে শুকনো পাতা দিচ্ছে বুড়ি, হাঁড়ির চারপাশ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। রান্না করছে বুড়ি।

কুকুর থেমে পড়ল। বড্ড খিদে পেয়েছে। নাহয় একটু পরেই যাওয়া

যাবে। এত তাড়া কিসের ? একটু কিছু খেয়ে যাই। আর যদি সময় কিছু নষ্টই হয়, খেয়েদেয়ে আরও জোরে ছুটব নাহয়। দেহে জোর পাব, দম পাব। কুকুর দোরের সামনে বসে পড়ল। জিব চাট্‌ছে আর লেজ নাডছে। মাঝে মাঝে অশান্তিতে উঠে পডছে, আবার বসছে।

এমন সময় বুড়ি পেছন ফিরে তাকাল। দেখতে পেল কুকুরকে। তবে রে! উনুনে দেবার চেলা কাঠ নিয়ে তেড়ে গেল বুড়ি। কুঁই কুঁই করে কুকুর একটু দূরে সরে গেল। তার খিদে গেল আরও বেড়ে। বুড়ি ফিরে গেল ঘরে। আপদ যত সব!

আবার বুড়ি পেছন ফিরে তাকাল। দেখতে পেল কুকুরকে। আবার গেল তেড়ে। কুকুর আর একটু দূরে সরে গেল। বুড়ি ফিরে যেতেই সে আবার দোরের মুখে বসল। এমনি করে অনেকক্ষণ কেটে গেল। বুড়ি আর হাঁড়ি নামায় না উনুন থেকে। কুকুরও নড়ে না সেখান থেকে।

কুকুর তো ফিরছে না! কেন এত দেরি হচ্ছে? গাঁয়ের মানুষজন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এতক্ষণ তো কুকুরের ফেরা উচিত। একটা ছোট ছাগল-ছানা এ কথা শুনতে পেল। আহা! মানুষদের বড় কষ্ট। বন্ধু কুকুর শেষকালে এমন কাজ করল? না:, কাউকে বিশ্বাস নেই। সেই যাবে দেবতার কাছে। সেই পৌঁছে দেবে কষ্টের কথা, সে নিজেই যাবে দেবতার কাছে। একটু বেশি সময় হয়তো লাগবে। কিন্তু উপায় কি? ছাগল-ছানা রওনা দিল।

চলেছে, চলেছে, ছাগল-ছানা চলেছে। যত তাড়াতাড়ি পারে সে ছুটে চলেছে। বনের মধ্যে দিয়ে তাও চলা যায়, কিন্তু পাহাড়ী পথে বড়ই কষ্ট। পায়ে লাগে, হোঁচট খেতে হয়। তবু চলেছে ছাগল-ছানা। মানুষ কত আদর করে তাকে, তার উপকার সে করবে না?

এদিকে বসেই রয়েছে কুকুর। প্রচণ্ড খিদে, তার ওপরে লোভ। সে ভুলে গেল তার কাজের কথা। এমন সময় হাঁড়ির জল টগবগ করে ফুটে উঠল। কুকুরের চোখ গোলগোল হয়ে উঠল। বুড়ি গেল পাশের বড় ঘরে। কোলে তুলে আনল একটা বাচ্চা ছেলেকে। দাওয়ার ওপরে বসাল বাচ্চাটাকে। উনুনের ওপর থেকে হাঁড়িটা তুলে আনল। হাঁড়িটা রেখে আর একটা বড় হাঁড়ি নিয়ে এল। তাতে ঢেলে দিল কিছুটা ঠাণ্ডা জল। তারপরে......। কুকুর অবাক হল। মুখ দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে এল।

বুড়ি উনুন থেকে আনা হাঁড়িটা উপুড় করে দিল। গরম ধোঁয়া-ওঠা জল পড়ল নিচের বড় হাঁড়িতে। শুধুই ফুটন্ত জল। বুড়ি চান করাতে লাগল, বাচ্চাটা জল পেয়ে খল্‌বল্ করে উঠল। বুড়ি চান করাচ্ছে বাচ্চাটাকে।

কুকুর লাফিয়ে উঠল। হায়! কত সময় বয়ে গেল। কিছুই তো হল না। মনে পড়ল তার কাজের কথা। ভুলে গেল খিদের কথা। লজ্জা পেল সে। দৌড় দিল, ভীষণ দৌড়।

হঠাৎ পথে দেখা ছাগল-ছানার সঙ্গে। ছাগল-ছানা পাহাড়ী পথে নেমে আসছে, আস্তে আস্তে। বড় ক্লান্ত সে।

কুকুর বলল, 'ছাগল-ছানা, এই কষ্টের পথে তুমি কোথায় গিয়েছিলে? একা একা।'

ছাগল-ছানা কিছু বলতে চাইল। সে হাঁপাচ্ছে। দম নিয়ে বলল, 'বন্ধু, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

কুকুর মাথা নিচু করে নরম গলায় বলল, 'বন্ধু, অনেক দেরি হয়ে গেল। আমি যাচ্ছি দূর পাহাড়ের ওপারে। মানুষ পাঠিয়েছে আমাকে। দেবতার কাছে যাচ্ছি। একটা কথা বলতে হবে।'

ছাগল-ছানা বলল, 'তার আর দরকার নেই। আমিই গিয়েছিলাম দূর পাহাড়ে। মানুষের কথা আমি দেবতাকে বলে এসেছি। তুমি ফিরে যাও।'

কুকুর অবাক হল। কেমন আঁকুপাঁকু করতে লাগল। শেষে বলল, 'ছাগল-ছানা, দেবতার কাছে তুমি কি বললে?'

'কেন? ঠিক কথাই বলেছি। মানুষের বড় কষ্ট। মানুষ আর গোলামি করতে পারছে না। ক্রীতদাসের এই জীবন থেকে সে মুক্তি চায়। দেবতা তুমি মুক্তি দাও। মানুষ এই জীবন থেকে মুক্তি চায়, সে মৃত্যু চায়। মৃত্যুই ভালো। এ জীবনের বদলে মৃত্যু ভালো। দেবতা তাই দিলেন।'

একথা শুনে কুকুর কেমন যেন হয়ে গেল। তার পা কাঁপছে, বুকে যেন কি চেপে বসছে, চোখ ভিজে উঠছে, ঝাপসা হয়ে আসছে চারপাশ। সে বসে পড়ল।

এ কি সর্বনাশ করে এল ছাগল-ছানা! এ কি ভীষণ ভুল করে এল সে। ভুল প্রার্থনা, ভুল খবর। মানুষ তো এ মুক্তি চায়নি। অন্য মুক্তি চেয়েছিল। দেবতার কাছে গিয়ে ভুল শোধরাতে হবে।

শিকারীর হাত থেকে যেমনভাবে বর্শা ছুটে যায়, ধনুক থেকে যেমন তীর

ছুটে যায়, আকাশ থেকে যেমন বিদ্যুৎ ছুটে আসে,—কুকুর তেমনি গতিতে পাহাড়ে উঠতে লাগল। ওপারে পৌঁছে গেল কুকুর। দেবতার বাড়িতে। দেবতা বসে রয়েছেন কাঠের আসনে।

কুকুর কিছু বলতে গেল। দেবতা ধমকে উঠলেন। একটু আগেই মানুষের আর্জি শুনেছেন। মানুষ যা চেয়েছে, তিনি তাই দিয়েছেন। আবার কেন নতুন করে আর্জি? এত ঘন ঘন মানুষের কথা শোনা সম্ভব নয়। আর নতুন করে কিছু করাও অসম্ভব। দেবতা একবার যা বলেছেন, তাই সত্য হবে। তাকে পাল্টানো যাবে না। দেবতা নতুন করে কিছু শুনবেন না।

কুকুর অস্পষ্টভাবে কিছু যেন বলতে চাইল। দেবতা অন্য দিকে চেয়ে আছেন। তার সামনে কুকুর যে নত হয়ে বসে রয়েছে, দেবতা তা খেয়ালই করছেন না। কুকুর কয়েকবার বলতে চেষ্টা করল। ভয় পেল। পারল না। কুকুর ফিরে চলল।

বারবার হোঁচট খাচ্ছে কুকুর। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এ কি হল? বন্ধু মানুষের ভাগ্যে এ কি ঘটে গেল! তারই জন্য, তারই দোষে, তারই লোভে। সে কেমন করে ফিরে যাবে গাঁয়ে। সে যদি এখনই মারা যেত, অনেক ভালো হত। হায় দেবতা, তুমি এ কি করলে? দেবতারই বা দোষ কি?

সেদিন থেকে মানুষের মধ্যে মৃত্যু এল। আগে মানুষ মারা যেত না। ভুল খবরে মৃত্যু এল। আর আজও মানুষ ক্রীতদাস হয়েই রয়েছে। এ জীবন থেকে মুক্তি ঘটেনি। মৃত্যু হলে তবেই মুক্তি।

অতৃপ্ত হৃদয়

এ তো শুধু গল্প নয়! এ এক শোকগাথা। সেই কবে কোন্ অতীতে দুটি হৃদয় মিলতে চেয়েছিল, মিলন হয় নি। এ গান আজও আমরা গাই, বেদনার গান। আমাদের সমাজের সবাইকেই এই শোকগাথা জানতে হয়। বাছারা, তোমরাও শোন সেই বেদনার গান। তোমরাও বলবে।

ঐ পাহাড়ের নিচে একসময় ছিল এক মস্ত গ্রাম। আজ নেই। আজ ওখানে শুধুই মাঠ। ভেড়া চরে, মোষ চরে। সেই গ্রামে ছিল এক নামজাদা গোষ্ঠীপতি। মস্ত ধনী সে, বিশাল তার প্রাসাদ, অতুল সম্পদ। সেই প্রাসাদে ছিল অফুরন্ত সোনা-হীরে-রত্ন। কিন্তু সবচেয়ে দামী রত্ন ছিল একটি। সে গোষ্ঠীপতির মেয়ে। সব ধনরত্ন এক করলেও মেয়ের সমান হবে না। দুর্লভ সে বস্তু। বাবার তাই গর্বের শেষ ছিল না।

স্বর্গের সব সুন্দরী পরীদের মাঝখানে আমাদের মাটি-পাথরের পৃথিবীর মেয়েকে রেখে দিলেও তাকেই শুধু চোখে পড়বে। মেয়ের দেহের চামড়া ছিল গলে-পড়া মোমের মতো, আলুলায়িত কেশগুচ্ছের রঙ ছিল দাঁড়কাকের গলার পালকের মতো, ঠোঁটদুটি ছিল রক্তপদ্মের মতো, আর তার হেঁটে-যাওয়া ছিল কবিতার মতো, চোখের ভাষা ছিল মিষ্টি গানের মতো। এই ছিল আমাদের মেয়ে।

গ্রীষ্মকাল আমাদের বড় প্রিয়। মেয়ে সতেরোটি গ্রীষ্ম পেরিয়ে এসেছে। টল্‌টলে পবিত্র জলের মতো স্নিগ্ধ যৌবন। এমনটি বুঝি আর হয় না। একদিন। ফুলের বাগানে ফুলের সঙ্গে খেলা করছে মেয়ে। ফুল নড়ছে, গাছ নড়ছে, সেও এদিক-ওদিকে দুলছে। কে বেশি সুন্দর! ফুল না মেয়ে? বোধহয় মেয়েই।

বাগানের ওপার থেকে ভেসে এল অপরূপ সংগীত। একটি কিশোর গান গাইছে। পুরনো দিনের, হারিয়ে যাওয়া দিনের শোকগাথা। এ কি কণ্ঠ! এ কি সংগীত! হৃদয়ের সমস্ত বেদনা উজাড় করা সংগীত! কেন এই বেদনা?

মেয়ে মনে মনে বলল, 'এই সুন্দর সংগীত কে গাইছে? এমন কণ্ঠ কার? সে কোন্‌জন?' মেয়ে এল বাগানের ঐ দিকে, যেখান থেকে গান ভেসে আসছে। উঁকি দিয়ে বাগানের বাইরে দেখতে চাইল। পারল না। এমন ঘন লতা-পাতায় ছাওয়া বাগানের বেড়া যে কিছুই দেখা যায় না। এমন উঁচু বেড়া, ওপর দিয়েও দেখা যাবে না। মেয়ে গান শুনছে, যে গাইছে তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

বাগানের ফুল-লতা-পাতাবাহার মেয়ের বড় প্রিয়। ছেলেবেলা থেকেই সে বাগানে যায়। বাগান তার আর এক সখী। কিন্তু এদিন থেকে সময় পেলেই সে বাগানে আসে। বাগান তাকে টানে। না, ঠিক বাগান নয়, বাগানের ওপার থেকে যে গান ভেসে আসে সেই গান যেন মেয়েকে পাগল করে তুলেছে। এক অদেখা রহস্যময় শিল্পী তার মিষ্টি গানে সর্দারের মেয়ের মন চুরি করে নিয়েছে। এ ছাড়া তার আর কিছুই ভালো লাগে না। হায়, মেয়ে বোধহয় জানে না, এক অদেখা কিশোরের কাছে সে তার মনপ্রাণ দিয়ে বসে আছে। মেয়ে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

কাউকে বলতে পারে না। তার মনের জ্বালা-বেদনা-আকুতি সে কাউকেই জানাতে পারে না। গুমরে মরে নিজের মধ্যে। সে-ও তো কিশোরী! আর কত সহ্য করবে! একদিন মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। বিছানা নিল। রোগ বেড়ে চলে। একবারটি দেখতে চায় তার হৃদয়ের আপন প্রেমিককে। এই অজানা কিশোরকে একবার দেখলেই হয়তো সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

বাবাও পাগলের মতো হয়ে উঠল। আদরের মেয়ের এ কি হল? অনেক বদ্যি এল, ওঝা এল। অনেক মন্ত্রপড়া, অনেক শিকড়-বাকড় খাওয়া। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মেয়ে দিনেদিনে আরও রোগা হয়ে যেতে লাগল। শেষকালে ওঝা-বদ্যি সাদা চুলের মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমরা পারলাম না। এ রোগ আমরা সারাতে পারব না। আমাদের সব কৌশল, সব বিদ্যে, সব ওষুধ ব্যর্থ হল। এ রোগ অন্যরকম।' তারা মাথা নিচু করে চলে গেল। বাবা 'হায় হায়' করে উঠল।

দুঃখী বাবা বসে থাকে মেয়ের পাশে। মেয়ে কোনো কথা বলে না। একদিন বাবা মেয়ের হাত নিজের কাঁপাকাঁপা হাতের মধ্যে নিয়ে আদর করছে। হঠাৎ বাবা বলল, 'সোনা, আমার ছোট্ট সোনা, কি হয়েছে বল্‌তো? লজ্জা করিস না। বাবাকে লজ্জা করতে নেই। বল্‌...।'

মেয়ে ডাগর চোখে চেয়ে রইল বাবার দিকে। রক্তপদ্মের মতো সুন্দর পবিত্র মুখ লজ্জায় আরও রাঙা হল। চোখের ভাষায়ও কেমন লজ্জা-লজ্জা ভাব। মেয়ে মিষ্টি সুরে খুব আস্তে আস্তে সেই কথাটি বলল। সেই সংগীতের কথা, সেই অজানা কিশোরের কথা। বলেই মেয়ে চোখ নামিয়ে বাবার কোলে মুখ লুকিয়ে ফেলল।

বাবা ভাবল, সবই তো করা হল। তাহলে আর একটি কাজ করতে হবে। মেয়ের জন্য সর্দার সবই করতে পারে। এখন সেই রহস্যময় গায়ককে নিয়ে আসতে হবে মেয়ের পাশে। যেমন করেই হোক।

খুব বেশি চেষ্টা করতে হল না। কিশোরকে পাওয়া গেল। সে এই গাঁয়েরই ছেলে। মাঠে-মাঠে ভেড়া চরায়। তাকে সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। বাবা বলল, 'ওগো ছেলে, গাঁয়ের সর্দার হয়েও তোমার কাছে মিনতি করছি, একবার তুমি আমার বাড়িতে চল। আমার বাড়িতে রয়েছে একজন রোগী। সে তোমার গানে মুগ্ধ। সে তোমায় দেখতে চায়।' মেয়ের এমন অবস্থায় গাঁয়ের সর্দারও কেমন সাধারণ মানুষ হয়ে গিয়েছে। সে মিনতি জানাচ্ছে। সর্দার হলেও সে পিতা।

কিশোর কিছুই জানে না। কার রোগ, কেন রোগ। সে পবিত্র মনে সদারের সঙ্গে চলল। ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। স্বর্গের একটি পরী তার দিকে চেয়ে রয়েছে। পরী চেয়ে রয়েছে ঐ কিশোরের মুখপানে, যার কণ্ঠ তাকে পাগল করে তুলেছিল। এ মেয়েকে কিশোর কোনোদিন দেখেনি। এ কিশোরকে এ মেয়ে কোনোদিন দেখেনি। দুজনে চেয়ে রয়েছে, অপলক চোখে। এ কি মুখ! এ কি পবিত্র চাহনি! দুজনেরই। মাটির তলা থেকে যেন জেগে উঠল মৃত আত্মা। কিশোরকে দেখামাত্র মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠল। হাজারো ফুল পাপড়ি মেলল মেয়ের মুখে, বৃষ্টি-ধোয়া আকাশের নির্মলতা দেখা দিল মেয়ের দেহে।

কিন্তু এই সুন্দর পবিত্র মুখ এ কি সর্বনাশ ডেকে আনল? মেয়ে হল সুস্থ-সতেজ। আর সেদিন থেকে কিশোর বিছানা নিল। সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। দিনে দিনে কিশোর বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। সে ঐ পবিত্র মুখকে ভুলতে পারছে না। আর একটিবারমাত্র সে ঐ পরীকে দেখতে চায়।

কিশোর আরও অসুস্থ হয়ে পড়ল। আর বোধহয় তাকে বাঁচানো যাবে না।

তার বাবা ছেলের মুখ থেকে সব শুনল। চোখের জল মুছ্তে মুছ্তে গেল সর্দারের বাড়িতে। হাঁটু ভেঙে বসে হাত জোড় করে মিনতি জানাল, 'আমার ছেলের বোধহয় এবার ডাক এসেছে। ওগো সর্দার, আমাদের সর্দার, তোমার মেয়েকে একবার আমার ছেলের পাশে যেতে দাও। আমার নিবে-আসা ছেলের পাশে। দয়া কর।'

সর্দার গর্জে উঠল, 'সর্দারের মেয়ে যাবে রাখালের বিছানার পাশে? আমার মেয়ে যাবে রাখালের বাড়ি? সব মর্যাদা কি ভুলে গেলে? কাকে কি বলছ?'

কিশোর রাখালের বাবা কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বলল, 'একদিন তোমার মেয়ের পাশে আমার ছেলে এসেছিল। তেমনি, তেমনি একবার তোমার মেয়েকে যেতে দাও। এ সময় বংশের কথা ভাবতে নেই। ওগো সর্দার, আমিও যে পিতা।'

সর্দার কোনো কথা শুনল না। বাড়ির উঠোন থেকে রাখালের বাবাকে বের করে দিল। বাবা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এল।

ছেলে জানল আর কোনোদিন ঐ পবিত্র মুখ সে দেখতে পাবে না। তাকে দেখতে দেওয়া হবে না। আর একবার দেখলেই সে ধন্য হত। হয়তো বাঁচত। না, তা হবার উপায় নেই। কোথায় রাখাল আর কোথায় সর্দারের মেয়ে। পরের দিন ভোরবেলায় কিশোর মারা গেল।

কিশোরের পূর্ব-পুরুষেরা যেখানে মাটির নিচে শান্তিতে ঘুমিয়ে রয়েছে, কিশোরকেও নিয়ে যাওয়া হল সেখানে। সে-ও ঘুমিয়ে রইল মাটির নিচে। চিরকালের জন্য।

রাতের আঁধার নামে, মানুষজন বাড়ি ফেরে, চারিদিক নিঝুম। তখন মাটির তলা থেকে গান ভেসে আসে, বিষাদের গান, শোকগাথা। কখনও ভেসে আসে গভীর দীর্ঘশ্বাস, কখনও যন্ত্রণার আর্তনাদ। কখনও ভেসে আসে বুকফাটা কান্না, হাহাকার। কখনও ফিস্‌ফিস্ কথা,—ওগো, তোমরা একবার আমাকে দেখতে দাও। একবার। আমার প্রেমিকাকে। ঐ সুন্দর পবিত্র পরীকে। আমার প্রেমিকাকে।

চারিদিকে আতঙ্ক। সূর্য ডোবার পরে কেউ আর ওপথে যায় না। যদি চেপে ধরে ঐ অতৃপ্ত আত্মা! আশা-না-মেটা আত্মারা বড় ভয়ানক।

একদিন এক পুরোহিত চলেছে ঐ পথে। মুখে তার দেবতার নাম।

উদার আকাশের দিকে চেয়ে শান্ত পথে চলেছে পুরোহিত। হঠাৎ তার কানে এল এক হাহাকার ধ্বনি। শান্ত চিত্তে শব্দ লক্ষ্য করে সে এগিয়ে গেল। ভালোভাবে শুনল সেই হাহাকার। মনে মনে বলল, 'হায়, অতৃপ্ত আত্মা, তুমি চিরশান্তিতে ঘুমোতে পারছ না? সে কোন্‌জন? যাকে জীবনে না পেয়ে তুমি এভাবে কান্নায় ডুবে রয়েছ? এ আকুলতা কোন্ নিষ্ঠুর প্রাণের জন্য?'

গভীর রাতের অন্ধকারে নিঃসঙ্গ পুরোহিত মাটির তলা থেকে তুলে নিল সেই গায়ক হৃদয়টি। বুকে জড়িয়ে ধরল। পরম যত্নে, অশেষ প্রীতিতে। কাছেই পুরোহিতের ছোট্ট মন্দির। সেখানে এসে একটি সুন্দর পাত্রের মধ্যে রেখে দিল সেই হৃদয়কে। তারপরে মাথা নুইয়ে চোখ বন্ধ করে বলল, 'অতৃপ্ত হৃদয়, আজ থেকে আমার সমস্ত প্রার্থনা তোমাকেই করব, তোমার উদ্দেশেই আমি সব মন্ত্র উচ্চারণ করব। হয়তো তোমায় শান্তি দিতে পারব। একটি অতৃপ্ত হৃদয়কে ঘিরে আজ থেকে আমার সকল সাধনা।' আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি হয়, করুণা আর দয়ার এক বিরাট মেঘখণ্ড হল এই পুরোহিতের হৃদয়।

দিন যায়, রাত যায়, মাস বয়ে চলে। আকাশের চাঁদ নিজের পথ পাল্‌টায়। পুরোহিত সব মন্ত্র উচ্চারণ করে অতৃপ্ত হৃদয়কে ঘিরে। চিরশান্তি লাভ করুক এই হৃদয়,—পুরোহিতের সব সাধনা একে ঘিরেই. কিন্তু সব ব্যর্থ হল। হৃদয় শান্তি পেল না। পাত্রের মধ্যে প্রতিদিন হৃদয় কেঁদে ওঠে, হাহাকার করে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, গান গেয়ে ওঠে। বেদনার গান। কখনও ফিস্‌ফিস্ করে বলে,—একবার দেখতে দাও আমার প্রেমিকাকে। তার পবিত্র মুখ কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

শেষকালে একদিন সর্দারের মেয়ে এল সেই নির্জন মন্দিরে। তাদের বাড়িতে তাকে দেখাশোনা করে এক বুড়ি। তার সঙ্গে মেয়ে এল। আজ পুণ্য দিন। দেবতার পায়ে ধূপ জ্বালিয়ে প্রণাম করতে এসেছে মেয়ে।

নত হয়ে ধূপ জ্বালাচ্ছে মেয়ে। হঠাৎ চম্‌কে উঠল মেয়ে। ধূপকাঠি পড়ে গেল হাত থেকে। অতি-চেনা কার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে? খুব কাছ থেকে। কোথায় শুনেছি এ কণ্ঠ? কোথায়? কোথায়?

অপরূপ ভঙ্গিতে উঠে পড়ল মেয়ে। নিঃশব্দ পায়ে মন্দিরের মধ্যে হেঁটে চলল মেয়ে। এদিক থেকে ওদিকে। এগিয়ে গেল ঐদিকে, যেদিক থেকে

হৃদয়-নিঙড়ানো কণ্ঠ ভেসে আসছে। কিন্তু কেউ তো নেই? হঠাৎ সে পুরোহিতের ছোট্ট কুঠুরিতে ঢুকে পড়ল। মনে হয়, শব্দ আসছে ওখান থেকেই। দেখতে পেল, একটি পাটাতনের ওপরে বসানো রয়েছে একটি সুন্দর পাত্র। শুধু একটি পাত্র। অপরূপ কারুকাজ করা পাত্র। ঐ পাত্রের ভেতর থেকেই কি কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে? বেদনার হাহাকার?

হঠাৎ মন্দিরের চারপাশের গাছ থেকে অসংখ্য চড়ুই পাখি একসঙ্গে বলে উঠল, 'ওগো সুন্দরী মেয়ে, ওগো স্বর্গের পরী, একবার ঐ পাত্রের ভেতরে তাকাও, মুখ নিয়ে যাও পাত্রের ওপরে।'

এ কি? পাখিরা তাকে এই পাত্রের মধ্যে তাকাতে বলছে কেন? কোনো অমঙ্গল? কোন অশুভ ইঙ্গিত? কিংবা অন্যকিছু? এক মুহূর্তের জন্য মেয়ে দ্বিধা করল। কুণ্ঠায় বিব্রত হল। কিন্তু পর মুহূর্তেই মেয়ে এগিয়ে গেল পাত্রের কাছে। কম্পিত পদে, কম্পিত হৃদয়ে, বিস্মিত চোখে।

কাঁপাকাঁপা হাতে পাত্রের ঢাক্না তুলে ফেলল মেয়ে। আস্তে পাশে রেখে দিল। বুক কাঁপছে। প্রস্ফুটিত রক্তপদ্ম এগিয়ে এল পাত্রের ওপরে। পবিত্রতা ঝরে পড়ছে। আর সেই মুহূর্তে... ..

নিস্তব্ধ হল পাত্র। হাহাকার থেমে গেল। কান্না মিলিয়ে গেল। অতৃপ্ত হৃদয় যা চেয়েছিল তা পেল। একটিবারের দেখা। শেষবারের মতো দেখা। শান্তি, শান্তি, শান্তি চারিদিকে। রক্তপদ্ম তবু চেয়ে রয়েছে পাত্রের ভেতরে, রক্তপদ্মের পাপড়িতে কয়েক ফোঁটা শিশিরবিন্দু।

আমাদের ছোট বোন

সবুজ বনে-ঢাকা এক পাহাড়ী ঢালুতে ছিল এক গ্রাম। সেই গ্রামে থাকত একজন লোক আর তার বৌ। তাদের ছিল সাত মেয়ে। সবাইকেই কাজ করতে হত। খুব খাটতে হত। এতগুলো মুখ, এতগুলো পেট,— অনেক খাবার লাগত।

পাশেই ছিল এক খণ্ড জমি। সেই জমিতে তারা চাষ করত। এইরকম একবারের কথা। বাবা-মা চাষ করেছে সেই জমিতে। মাটি বেশ নরম হয়েছে। এখন বীজ বুনতে হবে। ধানের বীজ ছড়াতে হবে। বাবা-মা আর পারছে না। তাই মেয়েদের বলল, 'ভালোভাবে ধানের বীজ ছড়াও। সাবধানে পা ফেলবে।'

মেয়েরা এর আগে অনেক রকম কাজ করেছে। কিন্তু বীজ ছড়ানোর কাজ তেমন ভালোভাবে জানত না। আল্‌তোভাবে বীজ ছড়াতে হবে। নইলে ধান ভেঙে যাবে, তার খোসা উঠে যাবে। হলও তাই। ধানের খোসা গেল উঠে, ভেতরের চাল গেল ভেঙে। এ বীজ মাটিতে ছড়িয়ে লাভ কি? মা ভীষণ রেগে গেল। খুব বকাবকি করতে লাগল। কত ক্ষতি হয়ে গেল। এমনিতেই কত অভাব। কাজে একটুও মনোযোগ নেই। আরও কত কি বলল মা।

মা তো এমন করে আগে কখনও বকেনি। এমন কি অপরাধ করেছে তারা? ভীষণ অভিমান হল বড় মেয়ের। সে কেঁদে ফেলল। আচম্‌কা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। আর পাহাড়ী ঢালুতে গড়িয়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে পড়ছে সে। জমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল সে। পাক খেয়ে নেমে যাচ্ছে সে। পাহাড়ী শক্ত মাটিতে, কাঁটা ঝোপে, ঘাসের ছুঁচলো আঘাতে তার দেহ কেটে ছড়ে একাকার হয়ে গেল। রক্ত ঝরছে সারা দেহে। গলগল করে রক্ত পড়ছে। মেয়ে নিথর হয়ে গেল।

পরের দিন মেজ মেয়ে 'এমনি করেই ইচ্ছে ক'রে গড়িয়ে পড়ল। দিদির পথে। তারও একই দশা হল। শেষকালে সে-ও নিথর হয়ে গেল।

পর পর ছয় দিন ছয় মেয়ে এমনি করে পাহাড়ী ঢালুতে গড়িয়ে পড়ল। একজন হঠাৎ, অন্য পাঁচজন ইচ্ছে করে। সবাই শেষকালে নিথর হয়ে গেল।

ছোট মেয়েও ঠিক করল, দিদিরা যে পথে গিয়ে নিথর হয়ে গিয়েছে, সে-ও তাই করবে। দিদি যেখানে দাঁড়িয়েছিল ছোট বোন সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। কেউ নেই। কি সুন্দর দিন। নিথর হতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু দিদিরা কেউ তো সঙ্গী নেই! কি হবে বেঁচে থেকে? গড়িয়ে পড়ল ছোট বোন। কিন্তু পড়েই সে কেঁদে উঠল। হাত দিয়ে কিছু ধরতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। গড়িয়ে যাচ্ছে। কাঁদছে। দুহাতে কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইছে, পারছে না। ক্ষতবিক্ষত দেহে গড়িয়ে যাচ্ছে।

পাহাড়ী ঢালুর এক জায়গায় ছিল একটা মস্ত গাছ। ছোট বোনেব দেহ গিয়ে লাগল সেই গাছের গুঁড়িতে। আশ্চর্য, মেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথায় চলে গেল ছোট বোনের দেহ? আর কোনোদিন কেউ তার দেহ খুঁজে পায়নি। তার নিথর দেহ কেউ দেখেনি।

অল্পক্ষণ পরেই চারপাশে সুন্দর সব গাছ গজিয়ে উঠল। গাছে গাছে সুন্দর সব পাকা ফল ঝুলছে। ঠিক যে জায়গায় মেয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তারই চারপাশে এ সব ফলের গাছ। আগে ছিল না।

তার নরম দেহের নরম মাংস থেকে জন্মাল সাদা ধব্‌ধবে ধানের ছোট্ট ছোট্ট চারা,—এই ধান থেকেই আমাদের এখানে সবচেয়ে ভালো চাল হয়। তার কচি কচি হাড় থেকে জন্মাল সাধারণ চাল। অনেক হয়, আমাদের গোলা ভরে যায়। তার যকৃৎ থেকে জন্মাল কালো রঙের চাল। আর তার অপরূপ সুন্দর লাল রক্ত থেকে জন্মাল লাল রঙের চাল। ছোট মেয়ে যখন হাসত সবাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। এমন মিষ্টি হাসি, মুক্তোর মতো দাঁত। ঝিনুকের মধ্যে যেমন মুক্তো হাসে, তার হাসিভরা মুখেও মুক্তো ঝরত। তার মুক্তোর মতো দাঁত থেকে জন্মাল ভুট্টা। অনেক হয়, আমাদের গোলা ভরে যায়। মেয়ে ছিল মুক্তকেশী। মন ভরে যেত। মাথা-ভর্তি কালো চুলের রাশি। সেই মাথা থেকে জন্মাল নারকেল। অনেক অনেক হয়। আমাদের দ্বীপের চারপাশে।

আমাদের আদরের মেয়ে, ছোট বোন চলে গেল। আর কোনোদিন ফেরেনি। কিন্তু সে আমাদের অনেক দিয়ে গেল। প্রতিটি ফসলের পরবে তাই আমরা তার গান গাই। বেদনার গান, খুশির গান।

স্মৃতি-ঘেরা পাথর

সেকালের কথা সবাই ভুলে গিয়েছে। সেই ভুলে-যাওয়া কালে এক গাঁয়ে থাকত একটা লোক। সে ছিল খুব ধনী। তার ছিল এক মেয়ে। অমন ফুট্‌ফুটে সুন্দরী মেয়ে ঐ গাঁয়ে আর একটাও ছিল না। বাবা-মায়ের বড় আদরের মেয়ে সে।

মেয়ে বড় হল। মেয়ের বিয়ে ঠিক হল। দূরের গাঁয়ের এক অপরূপ সুন্দর ছেলের সঙ্গে। বিয়ের দিন ছেলের বাড়ি থেকে সুন্দর একটা পাল্‌কি এল। সেই পাল্‌কি চড়ে মেয়ে যাবে তার নতুন বাড়িতে।

মেয়ে রওনা হল পাল্‌কিতে চড়ে। দরজা খোলা। ভেতরে বসে রয়েছে বৌ, নতুন সাজে। আরও সুন্দর লাগছে তাকে। পাল্‌কির পাশে মা কাঁদতে কাঁদতে চলেছে, মায়ের বুক ভেঙে যাচ্ছে। কতদূরে যাচ্ছে আদরের ছোট মেয়ে। পাল্‌কির আশেপাশে পেছনে গাঁয়ের সব লোক। শেষ বিদায় জানাতে এসেছে গাঁয়ের মেয়েকে। তাদের চোখেও জল। পাল্‌কির মধ্যে মেয়ের বুকের কাছটাও ভিজে উঠেছে, অঝোরে জল পড়ছে।

গাঁয়ের সীমানায় তারা এল। এর পরেই মেয়েকে ছেড়ে যেতে হবে। দুপাশে উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে সরু পথ। হঠাৎ আকাশে দেখা দিল এক টুক্‌রো কালো মেঘ। ঠিক পাল্‌কির ওপরে। মায়ের বুক কেঁপে উঠল, এ কি অলক্ষণ। মা কেঁদেই চলেছে। এখন কি হবে? আমরা কি করব?

মেঘ নেমে আসছে। আস্তে। মেঘ নেমে আসছে। জোরে। আরও জোরে। আরও জোরে। মেঘ নেমে এল পাল্‌কির একেবারে কাছে। এক টানে ছিনিয়ে নিল নতুন বৌকে। বৌ দিশেহারা। কিছু ভাববার আগেই মেঘ মেয়েকে নিয়ে পাহাড় ছাড়িয়ে আকাশে উঠে গেল। আর কিছু দেখা গেল না। না মেঘকে না মেয়েকে।

মা আছড়ে পড়ল মাটিতে। হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। এ যেন একটা পাগলিনী। চিৎকার করে বলল, 'আমি মেয়েকে ফিরিয়ে আনবই। যা থাকে কপালে। ভয় করি না কিছুকে।'

পরের দিন ভোরবেলা মা গাঁ থেকে বেরিয়ে পড়ল। গাঁয়ের মানুষজন মাকে বিদায় জানাল। এই পথেই মেয়ে গতকাল চলেছিল তার নতুন বাড়িতে। মা সে পথেই চলল।

পাহাড় ডিঙিয়ে, মাঠ পেরিয়ে মা চলেছে। একটুও বিশ্রাম নেয় নি। মেয়েকে খুঁজে বের করতেই হবে। আহা, তার আদরের রত্ন। সূর্য ডুবে গেল ঐ পাহাড়ের ওপারে। আঁধার নেমে এল। এবার তো পথ দেখা যাবে না। রাতে অপেক্ষা করে আবার সকালে পথে বেরোতে হবে। কিন্তু রাতে থাকবে কোথায় ?

হঠাৎ অল্প দূরে মা একটা মন্দির দেখতে পেল। চেঁচিয়ে বলল, 'সারাদিনের পথ চলায় আমি বড় ক্লান্ত। আমাকে হয়তো পাগলীর মতো দেখতে লাগছে। কি করব, আমি যে আমার মেয়েকে খুঁজতে বেরিয়েছি। আমাকে কি এই মন্দিরে আজ রাতের মতো থাকতে দেবে ? কাল সকালেই আমি চলে যাব। শুধু আজ রাতটুকু থাকতে চাই।'

মন্দির থেকে বেরিয়ে এল এক পূজারিণী। দেবীর মতো সে দেখতে। শান্ত স্বরে মাকে ডেকে বলল, 'তোমায় থাকতে দিতে পারি। কিন্তু শোবার মতো কিছু আমার নেই, খেতে দেবার মতো কিছু আমার নেই। তুমি থাকতে পার।'

মা মন্দিরে ঢুকল। পা আর চলে না, চোখ আর খুলে রাখা যায় না। মা মেঝেতে শুয়ে পড়ল। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর ঘুম। পূজারিণী নিজের পোশাক খুলে মায়ের দেহের ওপর পেতে দিল। আহা, বড় ক্লান্ত সে।

পূজারিণী মায়ের পাশে একটু দাঁড়াল। তারপর বলল, 'আমি জানি তুমি কোথায় চলেছ। তুমি চলেছ তোমার মেয়েকে খুঁজতে। মেয়ে রয়েছে হিংসুটে রাক্ষসের প্রাসাদে। এই সামনের নদী পেরোলেই তার প্রাসাদ। নদীর পাশেই রয়েছে একটা সরু সাঁকো। সাঁকো পেরোলেই রাক্ষসের প্রাসাদের দরজা। দরজা খোলা। কিন্তু সাঁকোর ওপরে পাহারা দিচ্ছে দুটো কুকুর। একটা বড়, একটা ছোট। যে সাঁকোতে পা দেবে তাকেই ছিঁড়ে ফেলবে। পারবে না যেতে। তবে হ্যাঁ, একটা উপায় আছে। ঠিক দুপুর বেলা অল্পক্ষণের জন্য কুকুর দুটো ঘুমোয়; খুব অল্পক্ষণ। তখন সাঁকোয় উঠতে পারবে। তবু খুব সাবধান। আর এক বিপদ। সাঁকোর ওপরে ছড়ানো

রয়েছে গোল গোল পুঁতি। অনেক পুঁতি। সাবধানে পা ফেলতে হবে। একবার পা ফস্‌কালেই সর্বনাশ। আছাড় খেয়ে নিচে পড়বে, পড়বার শব্দে কুকুর উঠবে জেগে। মৃত্যুফাঁদ। মারাত্মক ঐ পথ।'

সকালবেলা এক রকমের খস্‌খস্‌ আওয়াজে মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। মা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। মা শুয়ে রয়েছে সবুজ ঘাসের ওপরে, চারিদিকে নলখাগড়ার ঘন বন। কোথায় গেল মন্দির, কোথায় গেল পূজারিণী। সকালের হাওয়া লেগে নলখাগড়ার বন কাঁপছে আর তাই থেকে কেমন আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে। হাহাকার......শুধুই হাহাকার। মায়ের মাথার তলায় শুধু রয়েছে পাথরের একটা বালিশ। পাথরটি সুন্দর।

মা উঠে বসল। আপন মনে বলল, 'পূজারিণী, তুমি কে তা জানিনা। তুমি আমায় বাঁচিয়েছ। আমি পথ জেনেছি তোমার কাছে। তোমাকে প্রণাম।'

মা এগিয়ে গেল নদীর দিকে। অল্প দূরেই নদী। সাঁতরে পেরিয়ে গেল নদী। ওপারে যেতেই মা সাঁকো দেখতে পেল। সাঁকোর ওপরে একেবারে সামনে দুটো কুকুর। একটা বড়, একটা ছোট। সব চিনতে পারল মা। গাছের আড়ালে বসে রইল। ভেজা পোশাক গায়েই শুকিয়ে গেল।

মা হঠাৎ তাকিয়ে দেখে, কুকুর দুটো ঘুমোচ্ছে। এই তো সুযোগ। কিন্তু মনে পড়ল ছড়ানো পুঁতির কথা। কুকুরদের ডিঙিয়ে মা চলে গেল। পুঁতির ওপর দিয়ে চলা বড় কষ্ট। যদি কিছু হয়। মেয়েকে কি দেখতে পাব না? যদি পড়ে যাই! মা পেরিয়ে গেল সাঁকো। সাঁকো পেরিয়েই বাগান। সুন্দর বাগান। বাগানে ঢুকেই মা মেয়ের গান শুনতে পেল, তাঁত বুনছে আর গান গাইছে। এ গান মেয়ে গাঁয়ে থাকতে গাইত। তাঁত বোনার সময়। এখনও গাইছে। মায়ের গলা ধরে আসছে। মা ডাকল, 'আমার সোনা মেয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে জানলা দিয়ে মেয়ের মুখ দেখা গেল। হাসিতে ভরা মুখ। বাগান দিয়ে দৌড়ে আসছে মেয়ে। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরল। মেয়ে মাকে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল। মায়ের চেহারা দেখে মেয়ে এবার কেঁদে ফেলল। মাকে কিছু খেতে দিল। তারপর বলল, 'মা, অল্পক্ষণ পরেই রাক্ষস আসবে। তোমাকে দেখতে পেলেই ভীষণ বিপদ। সর্বনাশ। তোমাকে লুকিয়ে রাখতে হবে।'

মা বলল, 'রাক্ষস দেখতে কেমন রে ?'

মেয়ে বলল, 'মানুষের চেহারার মতোই। তবে একটু বড। মাথায় শিঙ আছে, সামনের দাঁতদুটো বড। দেহে ভীষণ শক্তি, খুব হিংসুটে। দেহের রঙ নীলচে। আর সময় নেই মা, তুমি এই পাথরের সিন্দুকে ঢুকে পড।'

এমন সময় রাক্ষস ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই সে রাগে ফেটে পডল, 'মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে মানুষ আছে। আমি গন্ধ পাচ্ছি। কোথায় মানুষ ?'

মেয়ে বলল, 'কই, আমি তো কিছুই জানি না। মানুষ কোথায় ? আমি জানব কেমন করে ?'

রাক্ষস বলল, 'ঠিক আছে, বাগানের ফুলগাছ দেখে আমি ঠিক বুঝতে পারব। আমাকে ফাঁকি দেওয়া ?'

এখন হয়েছে কি, বাগানে রাক্ষসের একটা যাদু ফুলগাছ ছিল। সেই ঘরে যে কজন থাকবে ফুলগাছেও সেকটা ফুল ফুটে থাকবে। সেই ফুল দেখেই রাক্ষস সব বুঝতে পারবে। বাগানে গিয়ে রাক্ষস দেখতে পেল গাছে তিনটে ফুল ফুটে রয়েছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে রাক্ষস ফিরে এল ঘরে। 'কোথায় তুমি আর একজনকে লুকিয়ে রেখেছ ? আমি তুমি। আর একজন কোথায় ?' চারিদিকে দেখতে লাগল রাক্ষস। সে ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছে। এই বুঝি মেয়েকে মেরে বসে। রাক্ষস গায়ে হাত তুললে আর রক্ষা নেই। যা বলবান।

মেয়ে কিছু বলতে পারছে না। মাথায় কিছু আসছে না। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আজ বুঝি নিস্তার নেই। হঠাৎ মেয়ের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। ঠোঁটের কোণে হেসে মেয়ে লজ্জা লজ্জা ভাব করে বলল, 'আমার পেটে ছেলে রয়েছে। তাই হয়তো তিনটে ফুল ফুটে রয়েছে। তোমার ছেলে।'

'আমার ছেলে ?' আর কিছু বলল না রাক্ষস। সে পাল্টে গেল। কোথায় গেল তার রাগ, কোথায় গেল হম্বিতম্বি। সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। মাথা মেঝেতে রেখে পা দুটো ওপরে তুলে দিল। মেঝেতে গড়াগড়ি গেল, সাত পাক ডিগ্‌বাজি খেল। কি আনন্দ, কি ফুর্তি!

ঘরের বাইরে বেরিয়ে সাঙ্গপাঙ্গদের চিৎকার করে ডাকতে লাগল। 'অনুচর, আমার অনুচর, তোমরা তাড়াতাড়ি এস। খেনো মদ নিয়ে এস। বাজনা বাজাও। আমার ছেলে। ফুর্তি কর। কুকুর দুটোকে মেরে মাংস বানাও। নাচের আয়োজন কর। তাড়াতাড়ি। আমার ছেলে।'

আনন্দে নাচছে রাক্ষস। অনুচরেরাও খুশি, তারাও নাচছে। তারাও চিৎকার করছে, 'ধেনো আনো, বাজনা বাজাও, কুকুর দুটোকে মেরে ফেল, বড়টাকে, ছোটটাকে। প্রভুর ছেলে।'

আনন্দে দিশেহারা হয়ে রাক্ষস প্রচুর ধেনো মদ খেল। আর ঠিক থাকা যাচ্ছে না। দেহ অবশ হয়ে আসছে, চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠেছে। রাক্ষস ঘুমিয়ে পড়ছে। বৌকে জিজ্ঞেস করল, 'বৌ, আমার খুব ঘুম পেয়েছে। আমার শোবার কাঠের সিন্দুক কোথায়? আর পারছি না।'

বৌ একথা শুনে মনে মনে শান্তি পেল। কিন্তু সে ভাব সে প্রকাশ করল না। খুব আদর করে রাক্ষসকে ধরল, আস্তে আস্তে সিন্দুকের কাছে নিয়ে গেল, যত্ন করে তাকে শুইয়ে দিল। তারপর পর পর সাতটা ডালা বন্ধ করল, সাতটা ডালাতেই একে একে তালা লাগাল। রাক্ষস এখন অনেক ভেতরে, গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে।

মেয়ে তাড়াতাড়ি মায়ের পাথরের সিন্দুক খুলে ফেলল। মা জেগেই ছিল দুজনে পালাল রাক্ষসের বাগান পেরিয়ে। বড় কুকুর, ছোট কুকুর টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে রাক্ষসদের পেটে রয়েছে, তাই ভয়ের কিছু নেই। তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত। তারা তাড়াতাড়ি রাক্ষসের সেই বিরাট ঘরে ঢুকে পড়ল। সেখানে রয়েছে প্রকাণ্ড রথ, মাঝারি রথ. ছোট রথ, ছোট জাহাজ, বড় জাহাজ। 'কোন্‌টা নিলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি পালাতে পারব?' মা-মেয়ে ঠিক করতে পারছে না। এদিকে সময় নষ্ট করা চলবে না। এমন সময় ঘরে দেখা দিল সেই পূজারিণী। সে বলল, 'রথে তেমন জোরে যাওয়া যাবে না। তোমরা ছোট জাহাজ নাও। নদীর জলে তীরবেগে ছুটবে ছোট জাহাজ। দেরি করে লাভ নেই।'

মা-মেয়ে জাহাজে চড়ল। জাহাজ বয়ে চলেছে তীরের গতিতে। নদীতে অনেক জল। হাওয়ায় ভেসে চলেছে জাহাজ। মা-মেয়ের মুখে হাসি।

রাক্ষস হঠাৎ জেগে উঠল। তার গলা শুকিয়ে গিয়েছে, বুক হাঁইফাঁই করছে। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। চিৎকার করে বলল, 'বৌ, তেষ্টা পেয়েছে, বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এক্ষুনি জল দাও। জল দাও।'

অনেক বার ডাকল রাক্ষস। কে শোনে কার কথা। বৌ তো সাড়া দিচ্ছে না। তবে কি......? প্রচণ্ড শব্দে কাঠের সিন্দুকের সাতটা ডালা ভেঙে গেল। রাক্ষস বেরিয়ে এল। ঘরে নেই কেউ। তবে কি......? এ

ঘরে ও ঘরে খুঁজল। কোথাও নেই কেউ। 'তাহলে? মানুষের মেয়ে পালিয়েছে? শয়তান কুকুর।' হুংকার দিল রাক্ষস। দুঃখে-রাগে তার বুক ফেটে যাচ্ছে। অনুচরেরা নেশার ঘোরে এখানে ওখানে পড়ে ছিল। লাথি মেরে রাক্ষস তাদের জাগিয়ে দিল। প্রভুর হুংকারে তাদের নেশা ছুটে গেল। রাক্ষস ছুটে গেল বিরাট ঘরে। দেখল, একটা ছোট জাহাজ নেই। ছুটে গেল নদীর পারে। বহুদূরে দেখতে পেল, জাহাজ চলেছে। প্রায় অদৃশ্য হয়ে এসেছে জাহাজ। তাহলে?

অনুচরেরা রাক্ষসের পেছনে। রাক্ষস বলল, 'হাঁটু জলে নেমে পড। নদীর সব জল গিলে ফেল। দেরি নয়।'

অনুচরেরা কাজে লেগে গেল। সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে, চোঁ চোঁ জল গিলছে তারা। মা-মেয়ে দেখল, জাহাজ হঠাৎ থেমে গেল। জাহাজ আর সামনে যাচ্ছে না, পেছনে চলেছে। আস্তে, জোরে, আরও জোরে, তীরের গতিতে জাহাজ চলেছে রাক্ষসের প্রাসাদের দিকে। এ কি হল? এ কি হল? তাদের মুখ শুকিয়ে গেল, বুক কাঁপছে। মা আছড়ে পড়ল কাঠের পাটাতনের ওপর।

অল্পক্ষণ পরেই রাক্ষস তাদের ধরে ফেলবে। আর তারপর? মা-মেয়ে সব আশা ছেড়ে দিল। উদাস চোখে চেয়ে রইল। দুপারের পাহাড় গাছ পেছনে সরে সরে যাচ্ছে।

এমন সময় জাহাজে দেখা দিল সেই পূজারিণী। সুন্দর পবিত্র বেশে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'তোমরা দুজনে শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছ? এখুনি রাক্ষসের হাতে গিয়ে পড়বে।'

কি করবে তারা? কিছুই বুঝতে পারছে না।

পূজারিণী বলল, 'তোমরা কি জান না রাক্ষসরা সবচেয়ে পবিত্র জিনিস দেখলে হাসতে থাকে? পবিত্র জিনিস দেখাও। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র জিনিস মেয়েদেরই আছে। তা হল তাদের দুটি বুক। শিশু মানুষ হয় বুকের দুধ খেয়েই। খুলে ফেল তোমাদের বুকের আবরণ।'

মা ও মেয়ে তাদের বুকের কাপড় খুলে ফেলল। পূজারিণী খুলে দিল নিজের বুকের কাপড়। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ছ'টি বুক।

তাদের দিকে চোখ পড়তেই রাক্ষসেরা হাসতে লাগল। খুব স্পষ্ট সবকিছু দেখা যাচ্ছে। কেননা, জাহাজ খুব কাছে। তারা দেখছে আর হেসে হেসে

গড়িয়ে পড়ছে। গড়িয়ে পড়ছে আর মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। যেমন করে পাহাড় থেকে ঝরনা নামে। জাহাজ থেমে গেল। জাহাজ চলতে শুরু করল। এবার অন্যদিকে। রাক্ষসের প্রাসাদ থেকে দূরের পথে। বুক খোলাই রয়েছে। রাক্ষসেরা হাসছেই। ওরা কি পাগল হয়ে গিয়েছে? একবার সোজা হচ্ছে, আবার হাসির দমকে দেহ বেঁকে যাচ্ছে। নদীর জল বেড়ে যাচ্ছে, তাতে স্রোত এল, জাহাজ চলল দূরে, বহু দূরে। রাক্ষসের প্রাসাদ আর দেখা যাচ্ছে না। আঃ, কি শান্তি।

মা-মেয়ে বারবার নত হয়ে পূজারিণীকে প্রণাম জানাল। 'পূজারিণী, তুমি না থাকলে আমরা এই বিপদ থেকে বাঁচতাম না। তুমি প্রথম থেকে কত উপকারই না করলে। তোমাকে প্রণাম।'

পূজারিণী মধুর হেসে বলল, 'আমি পূজারিণী নই। আসলে আমি হলাম পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ। যে স্মৃতিস্তম্ভে মাথা রেখে তুমি মন্দিরে ঘুমিয়েছিলে। স্মৃতিই তো সব। তার প্রতীক আমি পাথরের রূপে থাকতে ভালোবাসি। আমি খুব খুশি হব, প্রতি বছর যদি তুমি একটা করে পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি কর। সেই পাথরটার পাশে রাখবে। প্রতি বছর একটা করে। এতেই আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ। স্মৃতিই সব।' সাদা মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেল পবিত্র পূজারিণী।

মা-মেয়ে বাড়িতে ফিরে এল। পথে আর কোনো বিপদ ঘটেনি। গাঁয়ের সবাই খুব খুশি।

মা-মেয়ে পূজারিণীর কথা ভোলেনি, সারা জীবন ধরে তারা প্রতিশ্রুতি রেখেছে। প্রতি বছর পূজারিণীর নামে একটি করে পাথরের স্মৃতি তৈরি করেছে। কখনও ভোলেনি। তাই তো আমাদের এই সুন্দর দেশ জুড়ে কত পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ। স্মৃতি-ঘেরা পাথরই ছিল পূজারিণীর সবচেয়ে প্রিয়।

অগ্নিকুমার

সেই পুরনো কালে এক গাঁয়ে ছিল এক সর্দার। সবাই তাকে মানত। অনেক দিন পরে তার এক ছেলে হল। বড় আদরের ছেলে। বাবা-মায়ের আদরের ছেলে। ছোট্ট ছেলের হাসিতে দুষ্টুমিতে বাড়ি ভরে থাকত।

সুখ বেশিদিন থাকল না। ছেলের বয়েস যখন তিন বছর তখন মা মারা গেল। বাবা আবার বিয়ে করল। ছেলে সৎ মায়ের কাছে বড় হতে লাগল।

এমনি করে দিন কাটে। ছেলের বয়েস এখন নয় বছর। সেই সময় পাহাড়ের ওপরে অনেক দূরের এক গাঁ থেকে বাবার নেমন্তন্ন এল। বাবা যাবে ঐ গাঁয়ের সর্দারের বাড়ি। কি এক উৎসব আছে। থাকতে হবে দুমাস। পাহাড়ের কোল বেয়ে নদী এঁকেবেঁকে ঐ গাঁয়ে গিয়েছে। বাবা যাবে লম্বা ডিঙিতে।

যাবার সময় বাবা বৌকে বলল, আমি ফিরে আসব ঠিক দুমাস পরে। তেমাকে অন্য কোনকাজ করতে হবে না। শুধু ছেলের যত্ন নেবে। ওর চুল প্রতি দিন ভালোভাবে আঁচড়ে দেবে। এটা কিন্তু ভুলো না।' মায়ের ওপরে ছেলের ভার দিয়ে বাবা ডিঙিতে উঠল। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দুজন সর্দারকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

সেই দিন থেকে মা খুব খারাপ ব্যবহার শুরু করল। দুচোখে তাকে দেখতে পারে না। দিনরাত খাটায়। ছেলে কিছু বলে না, মায়ের কথা মেনে চলে।

মা হয়তো বলে, 'আজকে তোমায় পাহাড়ে যেতে হবে। ওখান থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনো। আগুন ধরাতে হবে।' কাঠ বয়ে আনল ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে মা বলল, 'যাও,' বাগানের আগাছা পরিষ্কার কর। শুধু বসে বসে খাওয়া।' ছেলে মাথার কাঠ নামিয়ে বাগানে চলে গেল। আগাছা তুলতে শুরু করল। নরম হাত, বড্ড ব্যথা লাগে। কিন্তু সে 'না' বলে না।

এমনি করে সারা দিন তার খাটনিতে কাটে। সৎ মা তার দিকে ফিরেও তাকায় না। যত্ন করা দূরে থাকুক, শুধুই বকাঝকা। ছেলের চুলে মা হাতও

দেয় না। ছেলের মাথা হয়েছে পাখির বাসা। এলোমেলো চুল, নোংরা মাথা। এমনি করে দিন কাটে।

এমনি করে দুমাস কেটে গেল। কালকে সর্দার ফিরবে। মা ছেলেকে বলল, 'কালকে সকালে তোমার বাবা ফিরবে। তাই আজ তোমাকে খুব খাটতে হবে। পাহাড়ী বন থেকে অনেক কাঠ বয়ে আনো, খুব মন দিয়ে বাগান পরিষ্কার কর। সারাদিন খাটবে।'

পরের দিন খুব ভোরে ছেলের ঘুম ভেঙে গেল। আজ বাবা আসবে। খুব আনন্দ। ছেলে মাকে বলল, 'মা, আজ তো বাবা আসবে। আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তাহলে বাবা নেমেই আমাদের দেখতে পাবে।'

মা বলল, 'হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। তুমি একটু আগে যাও। আমি পেছনে আসছি। আমি চুল আঁচড়িয়ে পোশাক বদ্‌লে যাচ্ছি। তুমি রওনা হও।' ছেলে লাফাতে লাফাতে নদীর দিকে রওনা হল।

ছেলে চলে যেতেই মা একটা খুর বের করল। মুখের কয়েক জায়গা কেটে ফেলল। রক্ত পড়ছে, খুব ব্যথা করছে,—তবু সৎ মা তাই করল। তারপর চুলগুলো এলোমেলো করে চাদর ঢাকা দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

ঐ দূরে বাবার ডিঙি আসছে। বাবাকে বাইরে দেখা যাচ্ছে। ছেলে আনন্দে লাফাতে লাগল, হাত নাড়তে লাগল। বাবার ডিঙি তীরে লাগল। এগিয়ে এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে বাবা অবাক হল। ছেলের এ কি অবস্থা! চুল এলোমেলো, দেহ নোংরা। বাবার খুব কষ্ট হল। বলল, 'তোমার এরকম দশা কেন?'

ছেলে সরল মনে বলল, 'মা তো আমায় শুধু খাটায়। পাহাড়ে পাঠায়, বাগানে আগাছা তোলায়। মা যে আমাকে সাজিয়ে দেয় না। আমি কি করব?'

'তোমার মা আসেনি কেন?'

'মা বলল চুল ঠিক করে পোশাক বদ্‌লে আমার পেছনেই আসবে। এখুনি আসবে।'

অনেকক্ষণ বাবা-ছেলে নদীর তীরে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল। এই বুঝি সে আসে। অনেক সময় কেটে গেল। আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? তারা হাঁপিয়ে উঠল। শেষকালে বাড়ির পথে রওনা দিল।

বাবা নিজের ঘরে ঢুকে দেখে, বৌ চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। বাবা ডাকতেই মা চাদরের ঢাকা সরিয়েই কেঁদে ফেলল। বৌয়ের মুখ দেখে বাবা চম্‌কে উঠল। রক্তমাখা মুখ। মা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি তোমায় আনতে যাব কেমন করে? দেখ তোমার ছেলের কাণ্ড। খুর দিয়ে মেরেছে। এ মুখ কি বাইরে কাউকে দেখানো যায়? তাই আমি যাই নি। তোমার যাওয়ার পরদিন থেকে প্রতিদিন ছেলে খুর নিয়ে আমায় এমনি করে মারত আর চেঁচিয়ে বলত,—বুড়ি সৎ মা কোথাকার! দূর হ! উঃ, ভাগ্যি তুমি এসেছ, নইলে আমি মরেই যেতাম।' মা কাঁদতে লাগল।

বৌয়ের কথা শুনেই বাবা রেগে ফেটে পড়ল। ছেলের কোনো কথাই আর সে শুনল না। চিৎকার করে বলল, 'এত শয়তান তুমি? মায়ের গায়ে হাত তোল? যে মা তোমাকে বড় করে তুলেছে! অকৃতজ্ঞ শয়তান কোথাকার। দেখাচ্ছি মজা। দূর করে দেব বাড়ি থেকে।'

বাবার ছিল তিনটে ঘোড়া। তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো ঘোড়াটাকে সে নিয়ে এল। খুব ভালো পোশাক দিল, দূর গাঁ থেকে ছেলের জন্য যেসব উপহার এনেছিল তাও দিল। ঘোড়ায় চাপিয়ে বাবা ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। ছেলের বুক কান্নায় যেন ফেটে যাচ্ছে।

কি আর করবে সে? মা এমন মিথ্যে কথা বলল। বাবা দিল তাড়িয়ে। বেশ তাই হোক। নতুন ঝক্‌মকে পোশাক পরে ঘোড়ায় চেপে ছেলে ছুটে চলল দক্ষিণ দিকে। পেছনে পড়ে রইল তার অতি-চেনা গ্রাম, খেলার সঙ্গীসাথীরা। চলছে, চলছে,—এগিয়ে চলেছে ছেলে। এমন সময় সামনে পড়ল এক পাহাড়ী নদী। প্রবল স্রোত। ঘোড়া নামলে ভেসে যাবে। ঠিক আছে, কেমন করে নদী ডিঙোতে হয় আমি জানি। আমার ঘোড়াও জানে। ছেলে চাবুক দিয়ে ঘোড়ার পেছনে আঘাত করল। আরে! এক লাফে ঘোড়া নদী পেরিয়ে ওপারে গিয়ে থামল।

আবার চলতে শুরু করল। পাহাড়ী পথ। শেষকালে সামনে পড়ল এক উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় কালো মেঘ জমে রয়েছে। সে সামনে যেতে পারছে না, বামদিকে নয় ডানদিকেও নয়। ঠিক আছে। এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। কেমন করে পাহাড় ডিঙোতে হয় আমি জানি। আমার ঘোড়াও জানে। ছেলে চাবুক দিয়ে ঘোড়ার পেছনে আঘাত করল। ঘোড়া মাথা নোয়াল। ছেলে আবার আঘাত করল। আরে! এক লাফে ঘোড়া পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে গিয়ে থামল। আবার চলতে শুরু করল।

চলছে, চলছে,—এগিয়ে চলেছে ছেলে। হঠাৎ দেখতে পেল, জোয়ারের খেতে একজন বুড়ো-মতন লোক কাস্তে হাতে ফসল কাটছে। তার লম্বা লম্বা এলোমেলো চুল। ছেলে তার কাছে গেল। মধুর গলায় বলল, 'কর্তাবাবা, ও কর্তাবাবা, আমি কাজ চাই। কারও কাজের লোক দরকার? এখানে কেউ কি কাজের লোক খুঁজছে? তুমি কিছু জান?'

'হ্যাঁ, তা জানি বৈকি। সব খবরই রাখি। ঐ পাহাড়ের উত্তরে একজনের মস্ত বাড়ি আছে, মস্ত খামার আছে। তা সেথায় পঁয়ত্রিশ জন কাজ করে। সাতদিন আগে একজন কিষাণ মারা গেল। এখনও কাউকে পায়নি। তা বাছা, তুমি দেখতে পার। কিন্তু ও পোশাকে কি তোমাকে কিষাণ রাখবে?'

'তাহলে এক কাজ কর কর্তাবাবা। আমার পোশাক তুমি নাও, তোমার কিষাণের পোশাক আমাকে দাও। তাহলেই নেবে।'

বুড়ো একটু ভয় পেয়ে বলল, 'তা কি হয়? ঐ পোশাক আমি পরলে সবাই সন্দেহ করবে। চোর ভেবে ধরবে আমাকে। কাজ নেই। বরং তুমি আমার পোশাক নাও। তোমার যখন খুবই দরকার।'

'বেশ তাই দাও। কিন্তু আমাকে একটা ঝুড়ি দিতে হবে। আমার পোশাকগুলো ওর মধ্যে রেখে তোমার কাছে জমা রাখছি। আপত্তি নেই তো?'

বুড়ো রাজি হল। ছেলেটা বড় মিষ্টি, বড় ঘরের ছেলে বলে মনে হয়। ছেলেটা ঝুড়িতে পোশাক খুলে রাখল। ঘোড়ার লাগামও রেখে দিল। তারপর ঘোড়াকে পাহাড়ী ঢালুতে ছেড়ে দিল। সেখানে বেশ ঘন বন। তারপর কিষাণের পোশাক পরে বুড়োর সঙ্গে খামারের মালিকের বাড়িতে গেল। তার লোকের দরকার। ছেলেকে কাজ দিল সে। দিন-মজুরের কাজ। ছেলে তাতেই খুশি।

তখন থেকেই কাজে লাগল ছেলেটি। খামারের মালিক তাকে মাঠে পাঠাল। সেখান থেকে লম্বা লম্বা ঘাস কেটে আনতে হবে। গোরু-মোষ খাবে। একটু পরেই ছেলেটি বুঝল, কাজটা বেশ শক্ত। ঘাসের ডগায় হাত ছড়ে যাচ্ছে, কাস্তের আঘাতে হাত কাটছে। এসব কাজ কি সে কোনোদিন করেছে?

সে ফিরে এল মালিকের কাছে। বলল, 'আমার হাত কেটে যাচ্ছে, আমি ঘাস কাটতে পারব না। তার চেয়ে আমাকে বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে দাও। এটা আমি জানি।'

'বেশ, তাই কর। বাগানেই কাজ কর।'

অল্প কিছুক্ষণ কাজ করেই ছেলে বুঝল, এ বাগান তাদের বাড়ির বাগান নয়। সে ফিরে এল। মালিককে বলল, 'বাগানে আমি কাজ করতে পারব না। হাতে আমার ফোস্কা পড়ে গিয়েছে। জ্বালা করছে। আমি বরং রান্না করতে পারব। সাতজন মিলে যা রান্না করে আমি একাই তা পারব।'

'ঠিক আছে, তাই হবে। তুমি রান্নাই করবে। তুমি বড্ড ছোট। তোমার যা খুশি তুমি তাই কর। যা তোমার মন চায়।'

ছেলেটি বলল, 'শুধু আজকের দিনের জন্য আমার সাতজন লোক লাগবে। সাতজন থাকলেই হবে।'

'বেশ, তাই হবে।'

সাতজনকে নিয়ে ছেলে রান্নাঘরে গেল। বিরাট রান্নাঘর। সে একজনকে পাঠাল নরম কাদা আনতে, আর একজনকে পাঠাল পাথর বয়ে আনতে, দুজনকে পাঠাল জল আনতে, একজনকে পাঠাল খড় আনতে, আর এগুলো আনা হয়ে গেলে অন্য দুজনকে কাদা ছেনতে দিল। কাদার মধ্যে চুন, বালি আর খড়ের টুক্‌রো দিল। কাদা খুব মজবুত হল। তারপর পাথর সাজিয়ে সাতটা উনুন তৈরি করল। একসঙ্গে সাতটা উনুন জ্বালিয়ে দিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অতগুলো লোকের তিন বেলার ভাত রান্না হয়ে গেল। আগে কি হত? দুপুর গড়িয়ে যেত সকালবেলার ভাত রাঁধতে, সন্ধ্যেবেলায় তৈরি হত দুপুরের ভাত আর মাঝরাতে তৈরি হত রাতের ভাত। এখন থেকে সকাল বেলাই কিষাণদের ডেকে বলত, 'সকালের ভাত খাও।' ঠিক দুপুর বেলায় বলত, 'দুপুরের ভাত খাও।' সূর্য পাহাড়ের কোলে ঢলে পড়লেই সে বলত, 'রাতের ভাত খাও।'

খামারের মালিক মহা খুশি। কিষাণরাও খুশি। এমন সুন্দর ব্যবস্থা। কাজও ভালো হতে লাগল। মালিক বলল, 'খুব ভালো ছেলে তুমি। তুমি দেখছি রান্নাঘরের কাজ খুব ভালো পার। আগুন তোমার হাতের মুঠোয়। তুমি তো অগ্নিকুমার। চিরকাল তুমি আমার কাছে কাজ কর। তুমি এখানেই থাক। আর শোন, কালকে তো আমাদের পরব। নাচ-গান হবে। কাল কিন্তু দুপুরের ভাত অনেক আগেই তৈরি করতে হবে। পারবে তো?'

পরের দিন সকালে অগ্নিকুমার যখন রান্না করছে তখন খামার-মালিক এসে বলল, 'অগ্নিকুমার, তুমিও কিন্তু আজকের নাচের পরবে যাবে।'

সে বলল, 'কিন্তু আমি তো যেতে পারব না। ছয় বছর আগে এই দিনে আমার মা মারা গিয়েছিল। আনন্দের পরবে এই দিনে যোগ দিতে নেই।'

'ঠিকই, তুমি যোগ দেবে কেমন করে? বেশ, সবাই তো চলে যাবে। তুমি একা সব দেখাশোনা করবে। এখানে তুমি একাই থাকবে। আমি নিশ্চিন্ত।'

খামার-মালিক চলে গেল। অন্য কিষাণরাও চলে গেল। পাহাড়ের এই পশ্চিম এলাকায় সে একা। সবাই চলে যেতেই অগ্নিকুমার ভালো করে চান করে নিল। তারপরে গেল বুড়ো কিষাণের বাড়িতে। তার সুন্দর পোশাক পরে নিল। তারপর উঠল এক উঁচু গাছে। সেখান থেকে চিৎকার করে তার ঘোড়াকে ডাকল। বনের গভীর থেকে ঘোড়া বেরিয়ে এল। তাকে লাগাম পরাল সে। ঘোড়া ছুটিয়ে সে নাচের আসরের উত্তর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। 'এবার অগ্নিকুমারের ঘোড়া নাচবে'—এ কথা বলেই সে ঘোড়ার পেছনে চাবুক মারল। এক লাফে ঘোড়া আসরের মাঝখানে পৌঁছে গেল। নাচতে লাগল ঘোড়া. সুন্দর ভঙ্গিতে। পিঠের ওপরে ছেলেটি।

সেখানকার গোষ্ঠীপতি ও অন্যান্য লোকজন চিৎকার করে উঠল, 'আজ আমাদের মধ্যে আকাশের রাজ্য থেকে এক দেবদূত এসেছে। সবাই উঠে দাঁড়াও, দেবদূতকে পুজো কর।' সবাই মাথা নিচু করে প্রণাম করল।

খামার-মালিকও মাথা নিচু করে প্রণাম জানাচ্ছে। তার পাশে ছিল তার মেয়ে। সে বলে উঠল, 'এ তো আমাদের অগ্নিকুমার! তার বাঁদিকের কানের কাছে একটা কালো চিহ্ন আছে। এই দেবদূতেরও আছে। এ অগ্নিকুমার।'

বাবা ধমক দিয়ে বলল, 'তুমি অনেক বড় হয়েছ। তোমার বিয়ের বয়েস হয়েছে। ছেলেমানুষি করবে না। অপবিত্র কথা বলবে না। দেবদূতকে অভক্তি করতে নেই। প্রণাম কর। আকাশ রাজ্যের দেবদূত সে।'

মেয়ে একটু হেসে মাথা নিচু করে দেবদূতকে প্রণাম করল, কিন্তু চোখ খুলে। আড়চোখে চেয়ে রইল।

নাচের আসর ভেঙে গেল। সবার আগে ফিরে এল ছেলে। ঘোড়াকে পাহাড়ের কোলে বনে ছেড়ে দিল, পোশাক আর লাগাম ঝুড়িতে করে বুড়োর বাড়ি রেখে এল,—আবার কিষাণ হয়ে পাহাড়ের পশ্চিমে চলে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে খামার-মালিক এসে তাকে ডেকে তুলে বলল, 'অগ্নিকুমার! আঃ, আজকে যদি তুমি যেতে। খুব ভালো হত। আকাশ-রাজ্য থেকে ঘোড়ায় চেপে এক দেবদূত এসেছিল। আমাদের পরবে নাচের আসরে। আমরা সবাই তার পুজো করেছি।'

'তাই নাকি? দেবদূত এসেছিল? আঃ, আমার দেখা হল না। যেতে পারলে কি ভালোই হত।'

খামার-মালিক বলল, 'কালকের পরের দিন আবার নাচের পরব হবে। তাড়াতাড়ি উঠে রান্নাবান্না শেষ করে রেখ।'

কালকের পবেব দিন এল। খুব সকালে উঠেই অগ্নিকুমার সব কিষাণের জন্য সকালের ভাত তৈরি করে ফেলল। কাজ শেষ হয়েছে এমন সময় খামার-মালিক এসে বলল, 'আজকে তুমি চলো আমাদের সঙ্গে। নাচের পরবে।'

অগ্নিকুমার মাথা নিচু করে বলল, 'যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আজকের দিনে আমার ঠাকুমা মারা গিয়েছিল। আমার বোধহয় আজকের দিনে যাওয়া ঠিক হবে না। দুঃখের দিনে আনন্দ কবতে নেই।'

সবাই চলে গেল। কেউ নেই পাহাড়ের পশ্চিম এলাকায়। একা অগ্নিকুমার। সে ভালোভাবে চান করে নিল। বুড়ো কিষাণের বাড়িতে গিয়ে ভালো পোশাক পরে নিল। গাছে উঠে ঘোড়াকে ডাকতে যাবে এমন সময় দেখল খামাব-মালিকের মেয়ে ফিরে এসেছে। সবার সঙ্গে যেতে যেতে সে ফিরে এসেছে। বলেছে, বাড়িতে কি যেন ভুলে রেখে এসেছে। কি আর করে অগ্নিকুমার। মেয়ে জেনে ফেলেছে। মেয়েকে ঘোড়ায় চাপিয়ে অগ্নিকুমার রওনা দিল। দুজনে এল নাচের আসরের পুব দিকের দরজায়।

'সবাই দেখ, অগ্নিকুমারের ঘোড়া কেমন নাচে,'—এ কথা বলেই চাবুক দিয়ে ঘোড়ার পেছনে আঘাত করল। ঘোড়া লাফ দিল আর আসরের মাঝখানে এসে নামল। ঘোড়া নাচতে লাগল। সুন্দর ভঙ্গিতে।

গোষ্ঠীপতি আর খামার-মালিক বলে উঠল, 'আজকে দেবদূত এসেছে তার বৌকে নিয়ে। কি সুন্দর। সবাই উঠে দাঁড়াও, পুজো কর।'

সকলের ফেরার আগেই অগ্নিকুমার ও মেয়ে পাহাড়ের পশ্চিমে চলে এল। ঘোড়াকে ছেড়ে দিল পাহাড়ী ঢালু বনে, পোশাক বদলে নিল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু পরেই খামার-মালিক এল। ঘুম থেকে জাগিয়ে সে বলল, 'অগ্নিকুমার, আজকে গেলে তোমার আরও ভালো লাগত। আজকে দেবদূত এসেছিল বৌকে সঙ্গে নিয়ে। কি সুন্দর।'

'তাইতো, গেলে খুব ভালো হত। দেখতে পেতাম। কিন্তু কি করব আমি।'

খামার-মালিক বাড়িতে ঢুকে দেখে মেয়ে শুয়ে রয়েছে। 'তুমি আজ কেন নাচের আসরে গেলে না?' বাবা জিজ্ঞেস করল। মেয়ে বলল, তার পেটে ভীষণ ব্যথা করছে। যাবে কেমন করে?

বাবা ব্যস্ত হল। একজন বদ্যি ডাকা দরকার। বাবা একথা বলতেই মেয়ে বলল, 'বদ্যির দরকার নেই। বরং দেবতার থানের পূজারিণীকে ডেকে আনো।'

পূজারিণী এলো। আঁক কষে ভবিষ্যৎ-বাণী করল, 'দেহের কোনো রোগ নয়। রোগ মনের। কিংবা বহু পুরনো মানসিক দুর্বলতার। অন্য চিকিৎসা দরকার।'

মেয়ে এ কথায় আপত্তি জানাল। লজ্জা পেল। মাথা নেড়ে বলল, 'নতুন যে পূজারিণী থানের ভার পেয়েছে তাকে ডেকে আনো।'

নতুন পূজারিণী এলো। আঁক কষে ভবিষ্যৎ-বাণী করল, 'এ রোগ সত্যি অন্যরকম। তবে বহু পুরনো নয়। অল্পদিনের রোগ। এই খামারে যেসব লোকজন কাজ করে তাদের মধ্যে একজনকে মেয়ের খুব ভালো লেগে গিয়েছে। তারা নিজেদের পছন্দমতন ভালো ভালো পোশাক পরে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ুক। মেয়ে যার হাতে এক পেয়ালা মিষ্টি দুধ তুলে দেবে, জানবে তাকেই মেয়ের পছন্দ। আসলে রোগটা অন্যরকম।'

খামার-মালিক তার সব কিষাণকে একথা বলল। সবাই এল। কিন্তু মেয়ে কারও হাতে মিষ্টি দুধের পেয়ালা তুলে দিল না। আর কেউ বাকি রয়েছে? হ্যাঁ, একজন আসেনি। সে হল নোংরা পোশাকের হতভাগা অগ্নিকুমার।

খামার মালিক অগ্নিকুমারকে নতুন পোশাক ধার দিল। বলল, 'সে-ও অন্য কিষাণদের মতোই। সে আসুক নতুন পোশাক পরে। দেখা যাক কি হয়।'

অগ্নিকুমার ভালোভাবে চান করে নিল। খামার-মালিকের পোশাক

শুয়োরের ডেরায় ছুড়ে ফেলে দিল। তাকে আরও ভালো পোশাক ধার দেওয়া হল, সে গোয়ালের পাশে ফেলে দিল। আরও সুন্দর পোশাক তাকে দেওয়া হল, সে ফেলে দিল রান্নাঘরের পেছনে। শেষকালে অগ্নিকুমার চলে গেল বুড়ো কিষাণের বাড়ি। নিজের রেখে-দেওয়া পোশাক পরে, বন থেকে ঘোড়ায় চেপে ফিরে এল খামার-মালিকের বাড়িতে। অগ্নিকুমারকে হাত ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে এল খামার-মালিক, ঢুকল মেয়ের ঘরে। মেয়ের রোগ তক্ষুনি সেরে গেল। চোখ-মুখে হাসিহাসি ভাব। মেয়ে মিষ্টি দুধের পেয়ালা তুলে দিল অগ্নিকুমারের হাতে।

বাবা বলল, 'এসব তো কিছুই আমি বুঝতে পারি নি। চিনতে পারি নি। মেয়েকেও চিনতে পারি নি। তা, অগ্নিকুমার, তুমি কি আমার জামাই হবে? আমার একমাত্র আদরের জামাই?'

অগ্নিকুমারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ, নাচ-গান। সবাই খুশি। তিনদিনের বিয়ের পরব শেষ হল। তার পরের দিন অগ্নিকুমার বলল, 'বাবা, আমাকে তিন দিনের ছুটি দিতে হবে। আমি দূর গাঁয়ে আমার বাবা-মাকে একবার দেখতে যাব।'

খামার-মালিক বলল, 'তা কি করে হবে? তিন দিনের জন্য তোমায় যেতে দিতে পারি না। শুধু আজকের দিনের জন্য তুমি যেতে পার; শুধু একদিনের জন্য।'

'ঠিক আছে, একদিনের জন্যই যাব।' অগ্নিকুমার যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

বৌ বলল, 'তুমি সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাবে, না পাহাড়ী পথে যাবে? তোমার কি ইচ্ছে?'

একটু ভেবে অগ্নিকুমার বলল, 'যদি সমুদ্র-পথে যাই তাহলে তিনদিন সময় লাগবে। আর পাহাড়ী পথে গেলে লাগবে মাত্র একদিন। তাই পাহাড়ী পথেই যাব।'

চোখ-দুটো ভিজে গেল বৌয়ের। কান্নাভরা গলায় বলল, 'যখন তুমি পাহাড়ী পথে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবে তখন ওপর থেকে তুঁতফল তোমার ঘোড়ার জিনের ওপরে পড়বে। মাঝে মধ্যেই পড়বে। তোমার যদি খুব তেষ্টাও পায় তবু তুমি ঐ ফল খাবে না। যদি তুমি ঐ তুঁতফল একটাও খাও, তাহলে আমাদের দুজনের মধ্যে আর কোনোদিন দেখা হবে না। তোমায় আর কোনোদিন আমি দেখতে পাব না।' বৌ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ী পথে এগিয়ে চলেছে অগ্নিকুমার। হাওয়ার বেগে সে চলেছে। হঠাৎ ওপর থেকে কয়েকটা তুঁতফল তার ঘোড়ার জিনের ওপরে পড়ল। মনে পড়ল তার বৌয়ের কথা। একটু হেসে সে ফলগুলো ফেলে দিল। এগিয়ে চলেছে অগ্নিকুমার। তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে উঠেছে, বুক ফেটে যাচ্ছে। আশে পাশে কোথাও পুকুর-ঝরনা কিছুই দেখতে পেল না। জিব শুকিয়ে তালুতে আটকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই তুঁতফল ওপর থেকে জিনের ওপরে পড়ছে। ফেলে দিচ্ছে অগ্নিকুমার। কিন্তু আর তো পারে না। হাওয়ার বিপরীতে যাচ্ছে, আরও কষ্ট হচ্ছে। বুক যেন চৌচির হয়ে যাবে। ভুলে গেল বৌয়ের নিষেধের কথা! তুলে নিল তুঁতফল। মুখে দিতেই অগ্নিকুমার ঢলে পড়ল জিনের ওপর। অগ্নিকুমার মরে গেল।

ঘোড়া সব বুঝতে পারল। এবার উঠতে হবে পাহাড়ে। পেছনের পা ভাঁজ করে সে উঠতে লাগল, যেন অগ্নিকুমার পড়ে না যায়। পাহাড় থেকে নামবার সময় সামনের পা ভাঁজ করে নামতে লাগল, যেন অগ্নিকুমার পড়ে না যায়। শেষকালে ঘোড়া এল অগ্নিকুমারের বাবার গাঁয়ে। ঘোড়া তাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। এখানেই জন্মেছে অগ্নিকুমার। তিনবার ডাকল ঘোড়া। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা ঘোড়ার ডাক চিনতে পেরেছে, এ তো তার ছেলের ঘোড়া। বাবা চিৎকার করে বলল, 'আমার ছেলে ফিরে এসেছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, সে কেন বাবা বলে ডাকছে না! শুধু কেন ঘোড়ার ডাকের শব্দ হল? বৌ, শিগগির যাও, দরজা খোল, খারাপ কিছু নয়তো? আমার ছেলে।'

সৎ মা তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গেল। হতচ্ছাড়াটা ফিরে এল নাকি। দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি তেজী পা এগিয়ে এল,—ঘোড়ার শক্ত পা। আঘাত করল সৎ মাকে। ছিট্‌কে পড়ল মেঝেতে। তক্ষুনি সৎ মা মরে গেল।

বাবা অবাক হল। কি হয়েছে? দরজার কাছে ছুটে এল। এসেই দেখে, ঘোড়ার ওপরে নিঃসাড় হয়ে শুয়ে আছে আদরের ছেলে। তাকে কোলে তুলে নিয়ে এল, শুইয়ে দিল একটা পিপের ওপরে। বলল, 'যে ছেলে আমার ফিরে আসবে টগ্‌বগ্‌ করে, সে এল নিঃসাড় হয়ে। কেন এমন হল?' শেষকালে ছেলেকে একটা বড় পিপের মধ্যে শুইয়ে তার ডালা বন্ধ করে দিল।

পাহাড়ের পশ্চিম এলাকায় বৌ ছট্‌ফট্‌ করছে। মনে মনে বারবার বলছে, 'একদিনেই ফিরে আসার কথা। তিন দিন হয়ে গেল। সে কেন ফিরছে না? পাহাড়ী পথে তুঁতফল খায়নি তো?' বুকটা কেঁপে উঠল, চোখদুটো ঝাপ্‌সা হয়ে এল।

বৌ জানে না অগ্নিকুমারের গ্রাম কোথায়। সে কোন্ দিকে। তবু ভেঙে পড়লে চলবে না। সে তিন পেয়ালা সঞ্জীবনী জল সঙ্গে নিল। হেঁটে চলল পাহাড়ী পথে। যে পথ পার হতে ঘোড়াব সারাদিন লেগেছিল, বৌ সে পথ পেরিয়ে গেল অর্ধেক সময়ে। পৌছে গেল অগ্নিকুমারের বাড়িতে।

'এটা কি অগ্নিকুমারের বাড়ি? সৎ মায়ের মিথ্যে কথায় বাবা যাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এটা কি তার বাড়ি?'

বাবা ছুটে এসে বলল, 'হ্যাঁ, এটা তারই বাড়ি।'

'তার দেহ কোথায় রেখেছ? আমাকে দেখাও।'

'যাকে আমি চিনি না, যে মানুষ একেবারে অচেনা, তাকে আমার ছেলের দেহ দেখতে দেব কেমন করে?'

'আমি অতিথি নই, আমি অচেনা নই। অগ্নিকুমার আমার স্বামী। তোমার ছেলে আমার স্বামী, আমার প্রাণ। আমাদের বিয়ে হওয়ার পর চতুর্থ দিনে সে বাবা-মাকে দেখতে এসেছিল! আর ফেরেনি। আর দেরি নয়, দেহটি কোথায়?'

'মেয়ে, আমি ভুল বুঝেছিলাম। শিগ্‌গির তুমি ভেতরে এস।'

বাবা পিপের মধ্যে থেকে দেহটি বের করে মেয়ের সামনে রাখল। বাবা এমনভাবে ছেলেকে শুইয়ে দিল যেন ছেলে মরে নি, শুধু ঘুমিয়ে রয়েছে। বাবা কাঁদছে।

মেয়ে সঞ্জীবনী জল নিয়ে তার দেহে ছিটিয়ে দিল, আলতো করে লেপে দিল সেই জল। বৌ পাশে বসে অগ্নিমকুারের দেহে ভেজা হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বাবা পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

চোখ খুলল অগ্নিকুমার। আস্তে আস্তে বলল, 'আমি সকালে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আমি সন্ধ্যেবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

মেয়ে স্বামীর মুখের কাছে মুখ এনে বলল, 'তুমি সকালেও ঘুমোও নি,

তুমি সন্ধ্যাবেলাও ঘুমোও নি। আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, ওগো, তুঁতফল খেও না। তৃষ্ণার কষ্টে তুমি ভুলে গেলে সব। তুঁতফল খেলে, আর ঢলে পড়লে চির অন্ধকারে। আমার কাছে ছিল মৃত সঞ্জীবনী জল। তাই তোমায় ফিরে পেয়েছি। চলো, ফিরে যাই আমাদের শান্তি-পাহাড়ে।'

'ও যে আমার একমাত্র ছেলে! ও গেলে আমি বাঁচব কেমন করে?' বাবা আর্তনাদ করে উঠল। কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বৌ বলল, 'ওকে ছাড়া আমি তো বাঁচব না। তাহলে আমি এখানেই থাকব। ও থাকবে আর আমি চলে যাব, না তা আমি পারব না।'

অগ্নিকুমার বলল, 'আমি দুজন বাবার দায়িত্ব নেব কেমন করে? বাবা, তুমি সর্দার, তোমার অনেক আছে। তুমি আর একটা ছেলেকে নিজের ছেলের মতো কাছে রাখ। গাঁয়ে অনেক ছেলে। আমি ফিরে যাব পাহাড়ের পশ্চিম এলাকায়, ওরা আমাকে বাঁচিয়েছে, ওরাই আমাকে বাঁচিয়েছে। ওরা আমাকে অগ্নিকুমার করে তুলেছে। সবাই সুখে থাকো।'

অগ্নিকুমার আর বৌ মিলিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী বনের পথে। বাবা তাকিয়ে রয়েছে। ওরা মিলিয়ে গেল। বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল—সাদা সুন্দর আকাশ, কোথাও মেঘ নেই। ওরা সুখে থাকুক, ভালো থাকুক।

পুরোনো বাড়ির ফুটো ছাদ

অনেকদিন আগে এক পাহাড়ী উপত্যকায় থাকত এক বুড়ো আর এক বুড়ি। নির্জন পাহাড়ে সুখে-শান্তিতে তাদের দিন কেটে যেত। তাদের ছিল এক অদ্ভুত শখ। ঘোড়াকে তারা খুব ভালোবাসত। অন্য পশুদের তেমন নয়। ঘোড়া দেখলেই তারা আদর করত, গায়ে হাত বুলিয়ে দিত, ভালো ভালো খেতে দিত। কত বুনো ঘোড়াকেই না তারা আদর করেছিল।

তাদের নিজেদেরও একটা পোষা ঘোড়া ছিল। যেমন সে দেখতে, তেমনি আদুরে। এমন তেজী ঘোড়া ঐ এলাকায় আর ছিলনা। বুড়ো-বুড়ির খুব গর্ব। হবেই বা না কেন।

এক চোর ভাবল, ঘোড়াটাকে চুরি করতে হবে। অনেক দিন থেকেই সে সুযোগ খুঁজছিল। একদিন অন্ধকার রাতে সে বুড়ো-বুড়ির বাড়ির কাছে একটা উঁচু পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইল। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে এলে চোর আস্তাবলের ছাদে উঠে চুপটি করে বসে রইল। সুযোগ পেলেই ঘোড়া নিয়ে পালাবে। ছাদের ফাঁক দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখল, ঘোড়া তখনও খামার থেকে ফেরেনি। এত দেরি হচ্ছে কেন ? বুড়ো তো ফিরে এসেছে। তবে ? চোর অপেক্ষা করতে লাগল। অনেকক্ষণ—। আরও অনেকক্ষণ—। তার কেমন ঘুম পেয়ে গেল। সে ঘুমিয়ে পড়ল। খুব ঘুম।

এখন হয়েছে কি, সেই পাহাড়ের এক গুহায় থাকত একটা নেকড়ে বাঘ। অনেকদিন থেকেই তার ইচ্ছে সে বুড়ো-বুড়িকে খাবে। তেমন সুযোগ পায়নি। সেদিন সে ঠিক করল, আজকে খাবই। বেশ অন্ধকার রাত। সেও গেল বুড়ো-বুড়ির বাড়ির দিকে। নেকড়ে বাঘ সব সময় ভাবত, এই দুনিয়ায় আমার চেয়ে শক্তিমান আর কেউ নেই।

ঘুম আসছে না বুড়ো-বুড়ির। তারা কথাবার্তা বলছে। পুরনো দিনের কথা, পুরনো দিনের শিকারের কথা, সুখ-দুঃখের কথা। ঘাপটি মেরে জিব বের করে দোরের কাছে বসে রয়েছে নেকড়ে বাঘ। সবকথা সে শুনছে। সুযোগের অপেক্ষায় সে রয়েছে।

কি থেকে যে কি কথা এসে যায় ! বুড়ো বুড়িকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বুড়ি, তোমার কি মনে হয় বলতো ? এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়ের, সবচেয়ে সাংঘাতিক কোন্ জিনিস আছে ? তোমার মত কি ?'

বুড়ি বলল, 'আমার কথা যদি বল, তাহলে আমার মনে হয় পৃথিবীতে সবচেয়ে সাংঘাতিক হল নেকড়ে বাঘ। ওর কথা মনে হলেই বুক কাঁপে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।'

নেকড়ে বাঘ কথাটা শুনে খুব খুশি হল। সে একটু নড়ে চড়ে বসল। মুখে তৃপ্তির হাসি। সে যা ভাবে তাহলে কথাটা মিথ্যে নয়। বেশ, এরা যখন তাকে এমন ভয় পাচ্ছে, তাহলে আজ রাতেই এদের মাংস খাওয়া যাবে। বেশি বেগ পেতে হবে না।

হঠাৎ বুড়ি কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বুড়ো, তোমার কি মনে হয়? এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়ের, সবচেয়ে সাংঘাতিক কোন্ জিনিস আছে? তোমার মত কি?'

'আমার মত হল, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়ের, সবচেয়ে সাংঘাতিক জিনিস হল পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদ। বৃষ্টির জল যদি একবার ঢুকতে শুরু করে—'।

নেকড়ে বাঘ তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল। সে শুনেছে পুরনো বাড়ির ফ্‌ুটো ছাদ? আর কিছু শোনার মতো অবস্থা তার নেই। সে ভাবল, এতকাল জানতাম, আমিই সবচেয়ে সাংঘাতিক, সবচেয়ে শক্তিমান। কিন্তু বুড়ো একি কথা শোনাল! আমার চেয়েও সাংঘাতিক জিনিস আছে? পুরনো বাড়ির ফ্‌ুটো ছাদ? সে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। এই বুঝি পুরনো বাড়ির ফ্‌ুটো ছাদ এসে পড়ে। কিন্তু সে দৌড়তে পারল না, সেখানে দাঁড়িয়েই কাঁপতে লাগল, দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে।

এমন সময় ছাদের ওপরে চোর জেগে উঠেছে। তলায় তাকিয়ে দেখে, বুড়োর ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে তেমন ঠাহর হয় না,—না আর দেরি নয়। লাফিয়ে পড়ল ঘোড়ার পিঠে। ঠিক মতন লাফ দিতে পেরেছে।

নেকড়ে বাঘ আরও চমকে উঠল। এ নিশ্চয় তার চেয়েও সাংঘাতিক পুরনো বাড়ির ফ্‌ুটো ছাদ। মৃত্যু ঠেকায় কে? তবু চেষ্টা করা যাক। এর কথাই বুড়ো বলেছিল। হায়! তার একি হল?

প্রাণের ভয়ে নেকড়ে বাঘ দৌড় দিল। চার পায়ে প্রচণ্ড গতি। এমন দৌড় সে আগে জানত না। সে চলেছে বন্ধুর কাছে। বন্ধু থাকে গুহায়। সে যদি বাঁচায় তাকে।

আর চোর বুঝেছে, সে ঘোড়াকে পেয়েছে। তাকে পালাতে দেবে না।

শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ঘোড়ার গলা। ছুটছে নেকড়ে বাঘ, পিঠে লেপ্টে আছে চোর। ছুটছে নেকড়ে বাঘ, পিঠে চড়ে রয়েছে সাংঘাতিক জিনিস, পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদ।

গুহার মুখে গিয়ে চোর ছিট্‌কে পড়ল। ঘোড়া গুহায় ঢুকে গিয়েছে। কিন্তু চোর গুহার মুখে বসে রইল। ঘোড়া কতক্ষণ থাকবে গুহার ভেতরে? বেরোতে তাকে হবেই। তখন? সে চুপটি করে গুহার মুখ পাহারা দিয়ে বসে রইল।

গুহার মধ্যে অনেক জন্তু-জানোয়ার। রাতের শিকারে বেরোবে বলে তৈরি হচ্ছিল। নেকড়ে বাঘ হাঁপাতে হাঁপাতে গুহায় ঢুকেই শুয়ে পড়ল। সে ক্লান্ত। তবু হাঁপাতে হাঁপাতে দলপতিকে বলল তার শোনা কথা। সব বলল। পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদের কথা। কি সাংঘাতিক।

জানোয়ার দলপতি গম্ভীর হয়ে বলল, 'তাহলে? তাহলে তোমাদের মধ্যে কে পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদকে ধরতে যাবে? কে রাজি আছে?'

নেকড়ে বাঘেরই এমন অবস্থা! কেউ রাজি হল না। সবাই বলল, আমি পারব না, আমি যেতে চাই না, আমার দ্বারা ও সব হবে না, ওর মধ্যে আমি নেই।

এক ছিল বানর। সে খুব চালাক। ভাবল, দেখাই যাক না কি হয়। সে রাজি হয়ে গেল। দলপতি বাহবা দিল। সবাই নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু চুপ করে রইল।

বানর গুহার দিকে মুখ করে পেছনে সরতে লাগল। লেজটা লম্বা হয়ে আগে আগে যাচ্ছে। গুহার বাইরে লেজ এল। লেজের গোড়ায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল। বানর একটু থামল। নাঃ, কিছুই তো হচ্ছে না। লেজ আর একটু বাইরে এল। লেজ নড়ছে। চোরের চোখ-মুখ খুশিতে ভরে গেল। তবে? বেরোতে তোমাকে হবেই।

লেজ আর একটু বেরিয়েছে। লোমশ লেজ। খপ্ করে মুঠোতে চেপে ধরল, বানর লাফিয়ে উঠেই কাঁপতে লাগল। দুহাতে লেজ চেপে ধরে প্রাণপণে চোর টানছে, সে একটা পাথরে দুপা বাধিয়ে নিয়েছে। ঘোড়াকে পালাতে দেবে না সে।

বানরের মুখ-ভর্তি লোম। তার মধ্যেও তার গোল গোল চোখ দেখা যাচ্ছে, লাল হয়ে উঠেছে। নেকড়ে বাঘ এক লাফে গুহার কোণে ঝাঁপিয়ে

পড়ল। সব জন্তু কোণে যেতে চায়। হুটোপুটি। একজন আর একজনের গায়ের ওপরে পড়ে যাচ্ছে। দলপতিও তাদের মধ্যে। সে এক কাণ্ড।

বানর খুব বুদ্ধিমান। সে-ও গুহার পাথরের একটা ফাটল দুহাতে ধরে ফেলেছে। শক্ত করে। একবার এগোচ্ছে দেহ, আবার পেছোচ্ছে। এগোবার সময় পাথরে মুখ ঘষে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে, চোখ যেন বেরিয়ে যাবে। দেহের সব রক্ত মুখে জমা হয়েছে। লেজের গোড়া টন্‌টন্ করছে। এই বুঝি ছিঁড়ে যাবে। যাক্। সেও ভালো। সত্যি সাংঘাতিক, সত্যি অসীম বলবান এই পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদ। গায়ে কি জোর! কি সাহস! প্রাণটা বুঝি গেলই। কি দরকার ছিল কায়দা করার। বানর এগোচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে। মুখ ঘষে যাচ্ছে পাথরে।

নেকড়ে বাঘ একটু গলা উঁচিয়ে বানরকে দেখতে চেষ্টা করল। বানরের অবস্থা দেখেই মুখ লুকিয়ে ফেলল। অন্য জন্তুরাও ভয়ে কাঠ।

বানরের বিরাট লেজ। এখন টান টান হয়ে আছে। হঠাৎ পটাং করে আওয়াজ হল। বানরের মুখ থেঁতলে গেল পাথরে, সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চোর দুই পা তুলে উল্‌টে গেল। হাতে তার বানরের লেজ, অনেকটা।

সেদিন থেকে বানরের লেজ আজকের মতো ছোট হয়ে গেল। আগের মতো আর বড় রইল না। বানরের মুখ চোরের টানাটানির জন্য বারবার পাথরে ঘষে গিয়েছিল। সেই ঘষায় মুখের সব লোম উঠে গেল। দেহের সব জায়গায় লোম, কিন্তু তখন থেকে বানরের মুখে কোনো লোম নেই। রক্ত জমে গিয়েছিল মুখে। বাপ্‌রে যা টানাটানি! সেদিন থেকে বানরের মুখ রক্তের মতো লাল হয়েই রইল।

জোনাকি

ভুলে-যাওয়া সেই কালে এক যে ছিল গরিব চাষী। খুব সুখের সংসার। কষ্ট আছে কিন্তু তারা সুখী। সেই চাষীর ছিল এক ছেলে। বড় আদরের।

কিন্তু বৌ একদিন মারা গেল। ছেলেটা তখনও খুব ছোট। তার বয়েস দশ বছর। বাবা আবার বিয়ে করল। ঘরে এল নতুন বৌ, নতুন মা। সৎ মা।

একদিনও তর্ সইল না। প্রথম দিন থেকেই সৎ মা খুব খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। দুদিন সবুরও করল না। ছেলে অবাক হল। কিন্তু ভয়ে চুপ করে রইল। চুপ করে থাকলে অবিচার বেড়েই যায়।

বাড়ির সবচেয়ে নোংরা আর শক্ত কাজগুলো করানো হত ছেলেকে দিয়ে। ছেলেকে পাঠানো হত মাঠে, ক্ষেতের কাজে। বড় কষ্ট। এত ছোট বয়সে কি এসব করা যায়? তাছাড়া মা বেঁচে থাকতে এসব কাজ সে কোনোদিন করেনি। শুধু কি তাই? সৎ মা তাকে যা খেতে দিত, তাতে পেটে খিদেই থেকে যেত। কিছুক্ষণ পরে কেমন পেটে চিন্‌চিন্ ব্যথা হত। মাথা ঘুরত। তবু ভয়ে সে কিছুই বলত না। বাবাও নতুন মায়ের পক্ষে।

একদিন সকালে মা ছেলেকে ডেকে বলল, 'এই আমার পয়সাগুলো নাও, চলে যাও পাহাড়ের ওপাশের গাঁয়ে। সেখানকার এক দোকানে ভালো বাদাম তেল পাওয়া যায়। কিনে আনো। যদি দেরি হয়, এমন মার দেব যে জীবনে ভুলতে পারবে না। উনুনের পাশেই অনেক চেলা কাঠ আছে। যদি তাড়াতাড়ি না আস।'

ছোট্ট ছেলে কেঁপে উঠল। এর আগেও সে কয়েকবার চেলা কাঠের শাস্তি পেয়েছে। উঃ, কি অসহ্য কষ্ট। রাতে দেহ গরম হয়ে ওঠে। বোধহয় জ্বর হয়। আজকে আরও বেশি ভয় পেল। মায়ের মুখ-চোখের চেহারা কেমন যেন অন্যরকম। যদি দেরি হয়? অত দূরের দোকানে কেন? কাছেও তো দোকান ছিল। কিন্তু এসব কথা বলার উপায় নেই। ছোট্ট ছেলে তামার পয়সাগুলো নিয়ে উঠোন পার হয়ে বেরিয়ে পড়ল। কাঁপতে কাঁপতে।

পথে যেতে যেতে ভাবছে, তাড়াতাড়ি ফিরতে না পারলে, উঃ কি ভয়ানক শাস্তিই না মা দেবে। শাস্তির কথা ভেবেই সে যেন কেমন আনমনা হয়ে

পড়ছে। আবার মন ঠিক করে পথ চলছে। মা বড় নিষ্ঠুর। ছেলে বড অসহায়।

বাতাস বইছে সোঁ সোঁ করে। যত পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হাওয়ার দাপট তত বাড়ছে। ঠাণ্ডায় যেন পায়ের পাতা জমে যাচ্ছে, দেহ অবশ হয়ে আসছে। হাওয়ার উল্‌টো দিকে তাড়াতাড়ি হাঁটাও যাচ্ছে না। তবু ছোট ছেলে ছোট পায়ে এগিয়ে চলেছে। কয়েক ঘণ্টা হাঁটার পরে পাহাড়ের ওপারের গাঁয়ে সে পৌঁছল। যাক্, শেষকালে দোকান খুঁজে পেল। কিন্তু এ কি? তামার পয়সাগুলো কোথায় গেল? জামার পকেটে ছিল পয়সা। গেল কোথায়? ছেলের মুখ সাদা হয়ে গেল। হায়! পকেট ছেঁড়া। পুরোনো জামা। তাতে একটা ছেঁড়া ফুটো রয়েছে। কোথায় পড়ল কে জানে! ছেলের বুক কাঁপতে লাগল। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। চেলা কাঠের কথা আর মায়ের চোখ-মুখের চেহারা মনে পড়ল। পয়সা নেই।

ছেলে বাড়ির পথে ফিরছে। হাউ হাউ করে কাঁদছে, 'মা, আমাকে আর মেরো না। মা, মা। আর এমন হবে না। মা!' যেন মা তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে সবকিছু ঝাপ্‌সা দেখছে। হোঁচট্ খাচ্ছে। দেহ টল্‌ছে। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। খালি হাতে ফিরে গেলে মা মেরেই ফেলবে। সে বাঁচবে না। ফিরে গেলে মা তাকে আস্ত রাখবে না। সে মরে যাবে। আরও কাঁদছে ছেলে।

বারবার মাথা নেড়ে ছেলে বলছে, 'পয়সাগুলো খুঁজে পেতেই হবে। যেখানেই হারিয়ে থাক্, খুঁজতেই হবে। নইলে—।' পাগলের মতো বারবার বলছে। পথের পাশের ঝোপে, পাথরের ফাঁকে ছেলে পয়সা খুঁজে চলেছে।

ছোট ছেলে। মনে ভয়। পয়সা খোঁজায় ব্যস্ত। ফেরার সময় সে পথ হারিয়ে ফেলল। যে পথ দিয়ে পাহাড়ের ওপাশের গাঁয়ে গিয়েছিল, সে পথে ফেরা হল না। দিন গড়িয়ে যাচ্ছে, ছেলেও পয়সা খুঁজে চলেছে। কিন্তু কোথায় তার হারিয়ে-যাওয়া পয়সা? না, সে পয়সা খুঁজে পেলনা। এ কি হল? অনেক বিপদ এসেছে তার ছোট্ট জীবনে। কিন্তু এমন বিপদে সে আগে পড়েনি।

সন্ধ্যা নেমে এল। চারিদিকের পথঘাট নির্জন হয়ে গেল। গাছে গাছে শুধু পাখিদের বিকট চেঁচামেচি। একা একা ভয় করছে। তবু সে বাড়ি ফিরতে সাহস পাচ্ছে না। মা রয়েছে বাড়িতে। ছেলে জানেও না, এ

পথে সে বাড়ি পৌঁছতে পারবে না। সে পথ হারিয়েছে। বৃথাই তার পয়সা খোঁজা, বৃথাই তার বাড়ি ফেরার চেষ্টা করা। পথ-হারানো ছোট্ট ছেলে।

তার পা দুটো অবশ হয়ে এল। আহা, ছোট্ট দুটো পা। সে আর চলতে পারছে না। এমন সময় ঝড় এল। প্রচণ্ড ঝড়। পথের ধুলো-পাতা পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠছে। গাছগুলো নুয়ে পড়ছে, এবার বুঝি ভেঙেই পড়বে। অন্ধকারে ঝড়ে সে দিশেহারা হয়ে বসে পড়ল। পাদুটো যেন তার নয়, পাথরের পা। দেহ যেন কেমন অচল হয়ে পড়ল।

কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না! পয়সা খুঁজতেই হবে। কিন্তু খুঁজবে কেমন করে? চোখে যে কিছুই দেখা যায় না। তবু সে এগোল। কেন তা জানেনা। সব যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ পায়ে খুব ঠাণ্ডা লাগল, ভিজে মাটি। চোখে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না। একটা দমকা হাওয়া এল। সে টাল সামলাতে পারল না। সামনেই পাহাড়ী নদী। জলে গিয়ে পড়ল। হাত-পা-দেহ অবশ। বাঁচবার চেষ্টাও করতে পারল না। ডুবে গেল। ছোট্ট ছেলে মরে গেল।

মৃত্যুতেও ছেলে সৎ মায়ের নিষ্ঠুরতার কথা ভুলতে পারল না। মায়ের শাস্তির ভয় তার মন থেকে গেল না। মনে হল, 'মা আমাকে ছাড়বে না। ঠিক শাস্তি দেবে। পয়সা হারিয়েছি, ঠিক চেলা কাঠ দিয়ে মারবে। মা মা।' এক অদ্ভুত আতঙ্ক!

তার আত্মা বারবার বলছে, 'পয়সা আমাকে খুঁজে পেতেই হবে। পয়সা আমাকে খুঁজে পেতেই হবে।'

এই আতঙ্কের মধ্যে ছেলে জন্ম নিল জোনাকি হয়ে। সে জোনাকি হল, —হাতে অস্পষ্ট আলো, ছোট্ট আলো, জ্বলছে নিবছে। মৃত্যুর পরেও সে খুঁজে চলেছে মায়ের দেওয়া পয়সা। ছোট্ট ছেলে ছোট্ট জোনাকি হয়ে অল্প আলোয় পয়সা খুঁজছে। পথে, বনের ধারে, পাথরের ফাঁকে। সে আজও পয়সা খুঁজে পায়নি। জোনাকি আলো জ্বেলে এখনও হারানো পয়সা খুঁজছে।

মানুষের পাপের ফলে আজ আর আমরা স্বর্গ দেখতে পাই না। মৃত্যুর আগে দেখতে পাই না। কিন্তু একদিন পেতাম। সেই দূরের স্বর্গের গোচারণ-ভূমিতে গোরু চরাত এক রাখাল। সকাল বেলা হলেই রাখাল গোরু নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। গোরুরা চরছে, সে গাছের নিচে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। চারিদিকে সেই সংগীতের মিষ্টি সুর ছড়িয়ে পড়ত। মাঝে মধ্যে গোরুরাও ভুলে যেত খাবার খেতে। রুপোলী বাঁশির সেই সুব আশেপাশের মেঘে আঘাত পেয়ে নানা সুরে ভেঙে পডত। সারাদিন বাঁশি বাজাত রাখাল। সে নিজেই যেন মিষ্টি গানে তৈরি।

স্বর্গদেবতার নয় মেয়ে। সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে বেশমী রঙের মেঘে মেঘ বোনে। মেঘ বুনে চলাই তার কাজ। আকাশে মেঘেব কতরকম চেহারাই না আমরা দেখি। সবচেয়ে উজ্জ্বল রেশমী রঙের বুননের কাজ করে ঐ মেয়ে।

একদিন এই কাজ করতে করতে মেয়ে আনমনা হয়ে গেল। আজ কেন যেন বড একঘেয়ে লাগছে। আর ভালো লাগছে না। এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখছে, হাতের কাজ বন্ধ। চেয়ে রয়েছে আকাশী নদীর দিকে। টলটলে শীতল জল বয়ে চলেছে। মেয়ে ভাবল, 'আঃ, কি সুন্দর জল। স্নান করে আসি, তাহলে বোধহয় মন ভালো লাগবে।'

যেন ডানা মেলে হাওয়ায় ভেসে ছুটে গেল মেয়ে। কেউ নেই। খুলে ফেলল তার দেহের পোশাক। সোনালী দেহ এলিয়ে দিল জলে। কি আনন্দ। মিষ্টি স্বর্গীয় গান ভেসে আসছে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

ঝোপের আড়ালে বসে ছিল রাখাল। জলের শব্দ হতেই পেছন ফিরে চাইল। এ কি রূপ? এ কি দেহের বরণ? এ কে? সোনালী গোরু ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল. 'দেরি কর না, মেয়ের পোশাক লুকিয়ে ফেল।' গোরু পাশে শুয়ে গান শুনছিল। আর দেরি নয়। রাখাল ছুটে গিয়ে পোশাক তুলে নিল হাতে, বুকের কাছে নিয়ে ঝোপে লুকিয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ স্নান করল মেয়ে। এবার জল ছেড়ে উঠে আসছে মেয়ে। সোনার বরণ মেয়ে। মেয়ে তীরে উঠে দেখে পোশাক নেই! এধার-ওধার চাইল। সে বাড়ি ফিরবে কেমন করে? পোশাক কোথায় গেল। মেয়ে কাঁদতে শুরু করল।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রাখাল। মেয়ের সামনে এসে দাঁড়াল, হাতে তার রেশমী পোশাক। বলল, 'ওগো মেয়ে, তুমি যদি আমায় বিয়ে কর, তবেই আমি পোশাক দেব, নইলে নয়। বল, বিয়ে করবে।'

কান্না-ভরা লাল চোখ তুলে মেয়ে দেখল, এক পবিত্র কিশোর মিষ্টি মুখে দুষ্টুমি-ভরা চোখে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার সুন্দর গোলাপী ঠোঁটদুটো হাসির রেখায় ভরা।

'মেয়ে, বিয়ে করবে না?' কি সহজ সুরে কথা বলছে ছেলে। মেয়ে অবাক হল। বড্ড ছেলেমানুষ। বড় ভালো লাগছে। মেয়ের মনও সহজ। সোনার মেয়ে বাজি হল। অনেক স্বর্গীয় গোরুর মাঝখানে তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

দুটি রঙিন প্রজাপতি ঘর বেঁধেছে। কি সুন্দর তাদের মিলন, কি পবিত্র তাদের চারিদিক। এমনি করে দিন বয়ে যায়।

একদিন মেয়ে বলল, 'ওগো কিশোর, এবার যে আমায় যেতে হবে। অনেকদিন রেশমী মেঘ দিয়ে মেঘ বোনার কাজ করি নি। বাবা হয়তো ভীষণ রেগে রয়েছে। এখন গিয়ে অনেক বোনার কাজ করে বাবার রাগ ভাঙাতে হবে। কতদিন করি নি কে জানে। এবার আমায় যেতে দাও।' মেয়ের চোখে টল্‌টলে শিশিরবিন্দু।

ছেলে দুঃখে ভেঙে পড়ল, 'সোনার মেয়ে, আমি তোমায় আবার কবে দেখতে পাব? আবার কবে দেখা হবে?'

মেয়ে বলল, 'বছরে মাত্র একবার। সেদিন আমাদের দুজনের দেখা হবে।' মেয়ে আর কিছু বলতে পারল না। চোখ নামিয়ে বাড়ির পথে চলল।

না, মেয়েকে যেতে দেবে না রাখাল ছেলে। বুকভরা অভিমান। কেন যাবে আমায় ছেড়ে? পেছনে পেছনে চলল রাখাল। পেছন ফিরে তাকাল মেয়ে। তার সোনালী আঙুল তুলে নিষেধ করল। আসতে নেই, এস না গো।

এগিয়ে চলেছে মেয়ে। পেছনে চলেছে ছেলে। দুজনের চোখেই টল্‌টলে শিশিরবিন্দু। রাঙা ফুলের মতো চোখ মেলে মেয়ে বলল, 'ওগো, এস না, আসতে নেই। বাবা দেখলে রাগ করবে, বকবে। এস না, সোনা ছেলে।'

মেয়ে এগিয়ে চলছে। নিষেধ মানে না সে। বড় অবুঝ। মেয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে জল-ভরা চোখে বলল, 'আমাদের দেখা হবে। বছরে একবার। মাত্র একবার। যেদিন আকাশ-পথে রুপোলী ছায়াপথ দেখা দেবে, সেদিন আমাদের দেখা হবে। প্রতীক্ষার পরে মিলন হবে অনেক আনন্দের। তুমি বড় ছোট। বুঝবে কি এসব কথা? এস না, আসতে নেই গো সোনা ছেলে।'

একথা বলেই মেয়ে তার মাথার মেঘবরণ কেশগুচ্ছ থেকে খুলে নিল একটা চুল বাঁধবার সুন্দর কাঁটা। তাই দিয়ে ফুলের পাপড়ির মতো সুন্দর আঙুলে মেঘের ওপরে দাগ কেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বয়ে গেল একটা রুপোলী নদী, আকাশ পথে ছায়াপথ। রুপোলী নদীর ওপারে স্বর্গীয় রাখাল আর এপারে মেঘকন্যা। দুজনের বিচ্ছেদ হল। ছেলে তাকিয়ে রইল মেয়ের দিকে, মেয়ে ছেলের দিকে। হাওয়ায় যেমন করে গাছের পাতা ঝুরুঝুরু কাঁপে, তেমনি কাঁপা হাতে বিদায় জানাল মেয়ে। ছেলে দাঁড়িয়ে রইল। কোনো কথা বলল না, বিদায় জানাল না। মেয়ে এগিয়ে গেল।

প্রতিবছর আকাশে একবার ছায়াপথ দেখা দেয়। সেদিন পৃথিবীর যত দোয়েল পাখি আছে তারা ডানা মেলে উড়ে আসে। রুপোলী নদীর ওপরে। ডানা মেলে ভেসে থাকে রুপোলী নদীর সবখানে। এপার থেকে ওপারে। তারা যে এই প্রেমিক-প্রেমিকাকে ভালোবাসে। ছেলে অপেক্ষা করে থাকে এই দিনটির জন্য, মেয়ে অপেক্ষা করে থাকে এই দিনটির জন্য। পাখির সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে যায় ছেলে, দৌড়ে যায় সোনা ছেলে। ওপারে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে সোনার বরণ মেঘকন্যাকে। এই একদিনের জন্য।

বাছারা, তোমরা দেখবে আকাশে যেদিন ছায়াপথ দেখা দেয়, প্রায় বছরেই সেদিন বৃষ্টি পড়ে। এ কিন্তু অন্যদিনের মতো বৃষ্টি নয়। দুজনে মিলিত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তাদেরই চোখের জল মেঘের পথ বেয়ে নেমে আসে। মিলনের মুহূর্তে আবার বিচ্ছেদের ভাবনায় তারা কাঁদে। দুটি স্বর্গীয় প্রেমিক-প্রেমিকা কোন্ ভুলে-যাওয়া কাল থেকে মিলিত হচ্ছে আর কাঁদছে।

এসব আমাদের মা দিয়েছে

এক যে ছিল বাবা মা। তাদের দুই ছেলে। সবাই মিলে কাজ করে। সুন্দর দ্বীপ। চারিদিকে নীল জল। এ জায়গাটা তাদের খুব পছন্দ।

কিন্তু এমন দিন থাকল না। পরপর দু বছর খরা হল। প্রচণ্ড খরা। দুর্ভিক্ষ। সবচেয়ে কষ্ট জলের। দ্বীপের ছোট ছোট পুকুর শুকিয়ে গেল। ঝরনার জল আর পড়ে না। জলের বড় কষ্ট। চারিদিকে এত জল, কিন্তু তাতে তেষ্টা মেটে না। জিব পুড়ে যায়। শরীর ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু তেষ্টা মেটে না।

শেষকালে মা একটা গর্ত দেখতে পেল। মাটিতে গর্ত। সেই গর্ত বেয়ে অনেক নিচে নেমে গেলে তবেই জল মেলে। খুব কষ্ট। তবু তেষ্টা মেটাবার জল তো পাওয়া গেল।

বাড়ি থেকে অনেক দূরে সেই গর্ত। একদিন হয়েছে কি, মা গর্তে ঢুকতে যাবে, তার পেট আটকে গেল গর্তের এক জায়গায়। আসলে, মা আবার মা হতে চলেছে। ছেলে ভেতরে বড় হচ্ছে। তাই মায়ের পেট গেল আটকে। বাবা অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু মাকে ছাড়াতে পারল না। সে তেমনি আটকে রইল। চেষ্টা করতে গেলেই যন্ত্রণায় মা চিৎকার করছে। কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না।

অনেক সময় বয়ে গেল। মা-বাবা কেন ফিরছে না? এত দেরি তো কোনো দিন হয় না? তবে আজকে কি হল? বাড়িতে বসে বসে দুই ভাই ভাবছে। বারবার বাইরে এসে দূরে তাকিয়ে দেখছে। মা-বাবা আর আসে না।

শেষকালে কাঁদতে কাঁদতে দুই ভাই হাঁটা দিল। খুব তাড়াতাড়ি। গর্তের মুখে যেতেই তারা দেখল, মা নেই, বাবা চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। বাবার খেয়ালই নেই, পাশে এসে দুই ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। 'বাবা,' বলে ডাকতেই সে চমকে উঠল। সব বলল তাদের।

নিচু হয়ে ছেলে দুটি গর্তের মুখে ঢুকল। কিছুটা এগিয়ে গিয়েই মাকে দেখতে পেল। মা ক্লান্ত হয়ে সেখানে আটকে রয়েছে। ছেলেরা কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। মা কাঁদল না।

ছেলেদের জড়িয়ে ধরে মা বলল, 'আমি আর ফিরতে পারব না। তাতে কি? তোমাদের যা দেব তাতে দুঃখ থাকবে না। মায়ের জন্য কাঁদতে নেই।'

মা প্রথমে তাদের দিল একটা পাখি। ঠিক তিতির পাখির মতো দেখতে। আর দিল একমুঠো বীজ। ঠিক লাউয়ের বীজের মতো দেখতে। আরও দু-একটা জিনিস।

ছেলেদের হাতে এসব তুলে দিয়ে মা বলল, 'বাছারা, এই পাখি যখন আনন্দে তার দুটো সুন্দর ডানা ঝাপ্‌টাবে, তখন তোমাদের শস্যের গোলা জোয়ার শস্যে ভরে উঠবে। জলের পাত্রগুলো উপ্‌চে পড়বে টল্‌টলে জলে। যখন লাউয়ের বীজ থেকে অঙ্কুর গজাবে, সেই ছোট্ট গাছ পুঁতে দিও মাটিতে। সেই গাছে ফল ধরবে। ফলগুলো কাটলেই তার মধ্যে নানান ধরনের ফসল পাবে। অফুরন্ত। কোনো অভাব থাকবে না। আমি ফিরব না, কিন্তু তাতে দুঃখ নেই। তোমরা সুখী হবে।'

বাড়িতে ফিরে এল তারা। পরের দিন। সুন্দর সকাল। মিষ্টি হাওয়া বয়ে আসছে। তিতির আনন্দে ডানা ঝাপ্‌টাল। শস্যের গোলা ভরে উঠল, পাত্রে পাত্রে জল উপ্‌চে পড়ছে। কি আনন্দ!

বীজ থেকে অঙ্কুর হল। অঙ্কুর থেকে গাছ। গাছে ফলল অনেক ফল। ফলগুলো কেটে ফেলতেই নানান ধরনের ফসল মাটিতে পড়ল। কিন্তু শুধু ফসল নয়। কয়েকটা ফল থেকে অনেক পাখি, অনেক জন্তু বেরিয়ে এল। তারা বেরিয়েই ফসল খেতে শুরু করল। সর্বনাশ! এত পাখি, এত জন্তু! এরাই তো সব খেয়ে শেষ করে দেবে! তাড়াও, তাড়াও, এদের তাড়াও। অনেক পাখি আর জন্তুকে তারা তাড়িয়ে নিয়ে চলল। পাহাড়ের দিকে। তারাও ভয় পেয়ে পাহাড়ী বনে ঢুকে পড়ল। আর কোনোদিন ফেরেনি। তারা সেখানেই রয়ে গেল। আজকে আমরা পাহাড়ী বনে যেসব পশুপাখিকে দেখতে পাই তারা ওদেরই ছেলেমেয়ে। বুনো শুয়োর, হরিণ,—আরও কত কি।

কয়েকটি পশু বেশ শান্ত। তারা তেমন করে ফসল খায়নি। তারা যেতে চাইল না পাহাড়ী বনে। থাকতে চাইল মানুষের মধ্যে। ছেলে দুটি কি আর করে! তাদের থাকতে দিল। বড় শান্ত তারা। আহা থাক। তারাই হল আমাদের পোষা শুয়োর। বড় উপকারী।

শিকারী ও কুকুর

কুকুর একসময় বনেই থাকত। সে ছিল বুনো কুকুর। অন্য বুনো পশুদের সে খুব ভয় করত। ভাবত, তাদের সঙ্গে বোধহয় পেরে উঠবে না। ওরা যা হিংস্র! তাই লুকিয়ে-চুরিয়ে কুকুর একা একাই বনে থাকত। তার কোনো বন্ধু ছিল না। একা, একেবারে একা। কিন্তু এ জীবন তো আর ভালো লাগে না। সবাই একসঙ্গে থাকে, সবারই বন্ধু-বান্ধব আছে। সেই শুধু একা। এবার সে বন্ধু পাতাবেই কারও-না-কারও সঙ্গে।

এই ভেবে সে তার নির্জন গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল। যা থাকে কপালে। পথে এক ঝোপের পাশে দেখা হল এক খরগোশের সঙ্গে। তাকে দেখেই কুকুর বলল, বন্ধু, আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। এস, আমরা একসঙ্গে থাকি। এক বাড়িতে।'

খরগোশ কান খাড়া করল। কুকুরকে বুঝতে চেষ্টা করল। সব বুঝে বলল, 'বেশ তো, ভালোই। একসঙ্গেই থাকি।'

ঠিক হল তারা কুকুরের আস্তানাতেই থাকবে। দুজনে পাশাপাশি হেঁটে আস্তানায় পৌঁছল। অনেক হাসি, অনেক আনন্দ। অনেক জমানো কথা। শেষকালে দিনের আলো কমে এল, সূর্য পাহাড়ের ওপারে ঢলে পড়ল। দুজনে দুপাশে শুয়ে পড়ল।

মাঝ রাত্তির। চারিদিকে কোনো সাড়া-শব্দ নেই। মাঝে মধ্যে দু-একটা পাখি শুধু চেঁচিয়ে উঠছে। বোধহয় ভয় পেয়েছে। হঠাৎ কুকুর ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করতে লাগল। খরগোশের ঘুম গেল ভেঙে। লাফিয়ে উঠে সে বসল, কানদুটো সোজা হয়ে আছে। বেচারা বড় ভয় পেয়েছে।

'বন্ধু, তুমি চেঁচাচ্ছ কেন? থাম, থাম। এক্ষুনি নেকড়ে শুনতে পাবে। আর শুনলে রক্ষা নেই। এসে দুজনকেই শেষ করবে।' খরগোশ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল।

কুকুর ভাবল, 'হায় কপাল। আমি তো ঠিক বন্ধু জোটাতে পারি নি? আমি ভয়ে মরি, ভাবলাম সাহসী বন্ধুর আশেপাশে থাকব, তা না এ আমার চেয়েও ভীতু। এ বন্ধু চলবে না। আমার মনে হচ্ছে, নেকড়ে নিশ্চয়ই কাউকে ভয় পায় না।' এই ভেবে কুকুর গুহা থেকে বেরিয়ে গেল। চলল

নেকড়ের সন্ধানে।

কুকুর লেজ নেড়ে চলেছে পথে। হঠাৎ দেখা নেকড়ের সঙ্গে। কুকুর একটু ভয় পেল, তবু সাহস করে বলল, 'বন্ধু,' আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। এস, আমরা একসঙ্গে থাকি। এক বাড়িতে।'

নেকড়ে বলল, 'মন্দ কি! বেশ তাই হবে।'

ঠিক হল তারা নেকড়ের গুহাতেই থাকবে। তারা দুজনে গুহায় ঢুকল। অনেক হাসি, অনেক আনন্দ। অনেক জমানো কথা। শেষকালে দিনের আলো কমে এল, চারিদিক অন্ধকার। দুজনে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল।

মাঝ রাত্তির। হঠাৎ কুকুর চিৎকার করে উঠল। ঘেউ ঘেউ শব্দে নেকড়ের ঘুম ভেঙে গেল। সে ভীষণ ভয় পেয়ে কুকুরকে বলল, 'বন্ধু চেঁচাচ্ছ কেন? এই রাত্তিরে? এক্ষুনি শব্দ শুনতে পাবে পাহাড়ী ভালুক। তাহলে আর রক্ষে নেই। এক্ষুনি এসে দুজনকেই পেটে পুরে দেবে। চেঁচিও না।'

কুকুর মনে মনে ভাবল, 'ও বাবা, এও দেখছি আমার মতো ভীতু। আমি তাকে যা ভেবেছিলাম নেকড়ে তো তা নয়। সে আবার পাহাড়ী ভালুককে ভয় পায়। ঠিক বন্ধুত্ব হয় নি। তাহলে বুঝতে পারছি পাহাড়ী ভালুকই সবচেয়ে সাহসী।'

কুকুর বেরিয়ে এল গুহা থেকে। পাহাড়ী ভালুকের সন্ধানে। যাচ্ছে যাচ্ছে, কুকুর কান খাড়া করে চলেছে। হঠাৎ দেখা এক পাহাড়ী ভালুকের সঙ্গে। কুকুর বেশ ভয় পেল, তবু বলল, 'বন্ধু, আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। এস, আমরা একসঙ্গে থাকি। এক বাড়িতে।'

ভালুক সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এতে আর আপত্তি করার কি আছে। বেশ তাই হবে।'

ঠিক হল, তারা থাকবে ভালুকের গুহায়। দুজনে গেল পাহাড়ী গুহায়। অনেক হাসি, অনেক আনন্দ। অনেক জমানো কথা। শেষকালে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। তারা পাশাপাশি শুয়ে পড়ল।

মাঝ রাত্তির। চারিদিক নিঝুম। হটাৎ কুকুর ডেকে উঠল। ঘেউ ঘেউ শব্দে পাহাড়ী ভালুকের ঘুম ভেঙে গেল। সে ভয়ে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ও কুকুর, তুমি চেঁচাচ্ছ কেন? এই ডাক শুনতে পেলে এখুনি শিকারী মানুষ ছুটে আসবে। আমাদের দুজনকেই শেষ করে দেবে। ওদের হাতে তীর-ধনুক আর বর্শা আছে। চেঁচিও না।'

কুকুর আকাশ থেকে পড়ল। এ কি হল? যাকে সে ভেবেছিল সবচেয়ে শক্তিমান, যার ওপরে তার ছিল এত আশা,—সে-ও ভয়ে কাঁপছে? পাহাড়ী ভালুক কাউকে ভয় পায় না, সে তো তাই ভেবেছিল। ভাবনাটা ঠিক নয়। ঠিক বন্ধুত্ব হয়নি। এ রকম বন্ধু তার দরকার নেই। মনে হয়, মানুষই সেই বন্ধু যে কাউকে ভয় করে না। সেই মানুষকেই খুঁজে বের করতে হবে।

কোনো কথা না বলে কুকুর গুহা থেকে বেরিয়ে গেল। পাহাড়ী ভালুক কি যেন বলতে চাইল, কুকুর কানেও তুলল না তার কথা, শুনেও শুনল না। চলল মানুষের সন্ধানে।

যেতে যেতে শেষকালে সে একজন মানুষের দেখা পেল। অনেক দূরে। সে শিকারী মানুষ। তাকে দেখেই কুকুর লেজ নেড়ে বলল, 'বন্ধু, আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। এস, আমরা এক সঙ্গে থাকি। এক বাড়িতে।'

মানুষ বলল, 'বাঃ, ভালোই তো। বন্ধু সবসময়েই ভালো। যত বন্ধুত্ব হয় ততই ভালো।'

ঠিক হল, তারা দুজনে শিকারীর তাঁবুতে থাকবে। ছোট তাঁবু, কিন্তু সবকিছু গোছানো। মাঝ রাত্তির। শিকারী এবার ঘুমোতে গেল। সারাদিন সে অনেক পরিশ্রম করেছে। কুকুরও ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ কি যেন কেন কুকুর চিৎকার করে উঠল। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে শিকারী জেগে উঠল। বিছানা থেকে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কুকুরকে বলল, 'বন্ধু, তোমার কি খিদে পেয়েছে? তাঁবুতে খাবার কিছু নেই। তুমি অন্ধকারে বেরিয়ে পড়। শিকার ধরে আনো। বিপদে পড়লে আমাকে ডাকবে। তীর-ধনুক-বর্শা আমার পাশেই আছে। ভয় নেই। আমিও কাউকে ভয় পাই না। কিন্তু শুধু শুধু ঘেউ ঘেউ করে আমার ঘুম ভাঙিও না। ভয়ের কি আছে?'

কুকুর আনন্দে লেজ নাড়তে লাগল। হ্যাঁ, এতদিনে সে সত্যিকারের বন্ধু পেয়েছে। যে ভয় করে না, যে বিপদ দেখে পালায় না, যে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে না। যাক্, শেষকালে ঠিক বন্ধু সে পেয়েছে।

কুকুর মনে মনে ঠিক করল, সে মানুষের কাছেই থেকে যাবে। আর কোথাও যাবে না। আজও সে মানুষের পাশেপাশেই রয়েছে। কোনোদিন ছাড়াছাড়ি হয়নি।

যাদুথলে ও রুপোর শিশু

অনেককাল আগে এক পাহাড়ী গাঁয়ে থাকত এক বুড়ো আর তার বুড়ি। তারা ছিল খুব গরিব। কেননা, তারা এত বুড়িয়ে গিয়েছিল যে, কোনো কাজ করতে পারত না। গাঁয়ের লোক দয়া করে যা দিত কোনোরকমে তাতেই চলে যেত। কিন্তু গাঁয়ের লোকই বা কত দেবে! তাদেরও তো সংসার চালাতে হয়। ভিক্ষার এই জীবন আর ভালো লাগে না। আগের দিনের কথা ভাবলে চোখে জল আসে।

বসন্তকাল। গাঁয়ের লোকজন মাঠে চলল। ফসল বুনতে হবে। বুড়ি অনেক কষ্টে চোখের জল চেপে বুড়োকে বলল, 'আর তো পারি না। তুমি কিছুটা জোয়ার চাষ করতে পারবে না? আস্তে আস্তে? আমার কাছে জোয়ারের কিছুটা বীজ আছে। জোয়ারের গুঁড়ো দিয়ে নরম পিঠে বানিয়ে খাব। ভিক্ষে-করা ঐ শক্ত দানা তো চিবোতে পারি না। দেখ না চেষ্টা করে।'

বুড়ো ঝাপ্সা চোখে তাকিয়ে রইল। যৌবনের দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। পারব। কেন পারব না? বীজ দাও। জোয়ার ফলাবই।' বুড়ির কষ্ট হল, তবু খুশি হল।

গাঁয়ের শেষে বুড়োর এক খণ্ড জমি ছিল। অনেকদিন তাতে চাষ করা হয়নি। আস্তে আস্তে কাঁপা কাঁপা হাতে বুড়ো মাটি ঠিক করল, আগাছা তুলে ফেলল, মাটি নরম করল। তারপর বীজ ছড়িয়ে দিল। অঙ্কুর হল, গাছ বড় হচ্ছে। বৃষ্টি সরস করল মাটিকে, রোদ সজীব করল গাছকে। গাছে ফসল ধরতে আর দেরি নেই। এখন মাঠে কোনো কাজ নেই। তবু প্রতিদিন যায় বুড়ো। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার ঝাপ্সা চোখ।

সেদিনও গিয়েছে বুড়ো। এ কি? একটা সারস লম্বা লম্বা পায়ে জমির ওপর দিয়ে চরে বেড়াচ্ছে। পায়ের চাপে সরু ফসলের চারা নুয়ে পড়ছে। 'হায়! হায়! চরে বেড়াবার আর জায়গা পেলে না? হুশ্ হুশ্।' বুড়ো কেঁদে ফেলল। এ-বয়সেও কেঁদে ফেলল। সারস পাখি উড়ে গেল। কাছে গিয়ে বুড়ো দেখে, প্রায় সব ফসলের চারা নুয়ে পড়েছে। ওগুলো গোড়া থেকে বেঁকে গিয়েছে। ওতে আর ফসল ফলবে না। চোখে জল। দীর্ঘ

নিঃশ্বাস ছেড়ে বুড়ো বাড়ি ফিরে এল।

বুড়িকে বলল, 'অনেক কষ্টে চাষ করেছিলাম। চারা খুব ভালোই ফলেছিল। কিন্তু...। একটা সারস সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। কপাল খারাপ। কিছুই পাব না।'

বুড়ি একথা শুনে কেঁদে ফেলল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এককালে তুমি কত বড় শিকারী ছিলে। বুনো শুয়োর, শেয়াল আর পাজি পাখিদের মারতে ওরা তোমাকেই ডাকত। পার না ঐ সারসকে মারতে? তোমার বর্শা আর তীর-ধনুক এখনও ঐ দেয়ালে ঝোলানো আছে। ঐ শয়তান সারসকে মারতে পার না? জোয়ার আর পাব না, কিন্তু কিছুটা মাংস তো পাওয়া যাবে। দেখ না চেষ্টা করে।'

শিকারের কথায় বুড়োর চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠল। আবার নিবেও গেল। হাত কাঁপে চোখ, ঝাপ্‌সা,—সে কি পারবে? দেখাই যাক না চেষ্টা করে। বুড়ো পিঠে নিল ধনুক, হাতে নিল তীর আর বর্শা। সোজা চলে গেল গাঁয়ের শেষে তার জমিতে। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল সে। রাগে বুড়ো কাঁপছে।

সারস আবার উড়ে এল। তেমনিভাবে চরে বেড়াতে লাগল। বুড়ো তীর ঠিক করে ধনুকের ছিলায় লাগাল। তীর বেরিয়ে আছে ঝোপের বাইরে। তাক্‌ ঠিক করছে বুড়ো। এক চোখ বোজা। 'এইবার তীর ছাড়তে হবে। আর ...।

সারস পাখি মানুষের গলায় কথা বলে উঠল, 'ওগো বুড়ো! আমায় মেরো না। এ তুমি কি করছ?'

'মারব না? আমার ফসল নষ্ট করেছে কে? মারবই।'

সারস কাতরভাবে বলে উঠল, 'ওগো বুড়ো! আমি জানতাম না, এই ফসলের জমি তোমার, তা আমি জানতাম না। আমি ভেবেছিলাম এ-জমি নিষ্ঠুর সর্দারের। গোষ্ঠীপতির। আমায় ক্ষমা কর।'

'ক্ষমা করে দাও বলা খুব সহজ। বললেই হয়ে গেল। এ-দুনিয়ায় আমার আর কিছুই রইল না। যাও-বা কিছু ফলিয়েছিলাম, তাও তুমি নষ্ট করে দিলে। আমার একমাত্র আশা ছিল ঐ জোয়ার। এখন বুড়ো-বুড়িকে উপোস করতে হবে। আর এর জন্য তুমিই দোষী। ক্ষমা করব?' বুড়ো ভীষণ রেগে গিয়েছে।

চুপ করে মন দিয়ে সারস বুড়োর কথা শুনল। বলল, 'তুমি এত গরিব? ঠিক আছে। তোমায় এমন জিনিস দেব যাতে তোমায় জোয়ারের জন্য কাঁদতে হবে না। একটু দাঁড়াও।' সারস ডানা মেলে উড়ে গেল। দূরে ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

বুড়ো হঠাৎ ভাবল, সারস তাকে বোকা বানিয়ে উড়ে গেল না তো? ইস্, তাই ঠিক। ওকে তীর মারাই উচিত ছিল। বুড়িকে গিয়ে এখন কি বলবে?

হঠাৎ বুড়ো ডানার শব্দ শুনতে পেল। ঝোপের ওধার থেকে সারস হাওয়ায় ভেসে আসছে। তার ঠোঁটে ঝুলছে ছোট্ট একটা থলে।

বুড়োর ঝোপের কাছে এসে সারস নামল। থলেটা বুড়োর হাতে দিয়ে বলল, 'তোমার ফসল আমি নষ্ট করেছি, তার বদলে এই থলে দিলাম।'

'কি হবে তোমার থলে দিয়ে। আমি তো ভিক্ষে করে খাই, ওরকম থলে আমার অনেক আছে। ভিখারীর থলে ছাড়া আর কিছু থাকে না। এসব তুমি জান না?' বুড়ো আরও রেগে গেল।

সারস শান্ত গলায় বলল, 'বুড়ো, এটা তুমি নাও। তোমার হয়তো অনেক থলে আছে, কিন্তু এরকম থলে নেই। এটা হল যাদুথলে। থলেটা নিজের সামনে ধরে বলবে—ছোট্ট থলে, তুমি বড় হয়ে যাও, তুমি সুন্দর হও, তুমি আমায় খাবার দাও, পানীয় দাও। থলে তোমায় সব দেবে। কাজ হয়ে গেলে আবার বলবে—ছোট্ট থলে, তুমি গুটিয়ে যাও, খাবার শেষ হোক, পানীয় শেষ হোক। থলে আবার পুরোনো আকারে ফিরে আসবে।'

'তাই যদি হয় তবে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তোমাকে চিরকাল মনে রাখব। আমরা বড় গরিব।' ছোট্ট থলে নিয়ে বুড়ো বাড়ির পথে চলল। বেশ তাড়াতাড়ি।

কিন্তু বাড়ি যাওয়া আর হল না। সে দেরি করতে পারছে না। দেখাই যাক না, সারস সত্যি কথা বলেছে কিনা। পথের পাশে সে বসে পড়ল। এদিক-ওদিক দেখল। তারপর থলেটা নিজের সামনে এনে বলল, 'ছোট্ট থলে, তুমি বড় হয়ে যাও, তুমি সুন্দর হও, তুমি আমায় খাবার দাও, পানীয় দাও।' অবাক কাণ্ড! তার সামনে এমন সব খাবার আর পানীয় এল যে সে এসব কোনোদিন চোখেও দেখেনি। সে কেন, গাঁয়ের সর্দারও দেখেনি। 'সত্যি, সারস বড় ভালো। সে আমাকে ঠকায়নি।' মনের সুখে প্রাণ ভরে বুড়ো

সেসব খেল। আবার থলেকে ছোট করে দৌড় দিল বাড়ির পথে।

বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই বুড়ো আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'ও বুড়ি! আরে গেলে কোথায়? বেঁচে আছ তো?'

'হ্যাঁ গো, বেঁচেই আছি। তা অত চেঁচাচ্ছ কেন? হয়েছে কি? এতক্ষণ বাইরে থাকে? আমি তো ভয়েই অস্থির। নেকড়ে খেল নাকি! অথবা ভালুকের খপ্পরে পড়েছ। তারা তোমায় মজা করে ঝোপে টেনে নিয়ে গিয়ে...!'

'আরে, না না। ওসব কিছু নয়। নেকড়েও খায়নি, ভালুকও ধরেনি। ধরলেই হল? অনেক খাবার, অনেক পানীয়। শেষ জীবনে আর কোনো কষ্ট রইল না। আরে, এসেই দেখ না!'

বুড়ি এসব আবোল-তাবোল কথা কিছুই বুঝল না। সে কাছে এল। বুড়ো ছোট থলে সামনে ধরে খাবার দিতে বলল, পানীয় চাইল। অবাক কাণ্ড! বুড়ির চোখ বোধ হয় ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। কাঠের চৌকি ভরে গেল খাবারে পানীয়ে। 'এসব তুমি পেলে কেমন করে?' বুড়ির গলা কাঁপছে।

'সেই সারস পাখি আমাদের এসব দিয়েছে। এই যাদুথলে দিয়েছে।'

'বুড়ো, তুমি তো আচ্ছা বোকা! এমন পাখিকে মারতে তীর-ধনুক-বর্শা নিয়ে গিয়েছিলে? এত বোকা তুমি?' বুড়ি ভুলেই গেল, সে-ই বুড়োকে পাঠিয়েছিল মাংস আনতে। এরকমই হয়।

পেট পুরে, প্রাণ ভরে তারা খেল। এসব তো জীবনে চোখেই দেখেনি। আর খেতে পারছেনা।

হঠাৎ বুড়ো বলল 'এটা তো ঠিক হচ্ছেনা। তুমি ওদের ডাক, ওরাও আসুক।'

'ওরা কারা?'

'বাঃ, আমাদের গাঁয়ের যারা খুব গরিব, যারা খেতে পায়না, যাদের বড় কষ্ট, তাদের ডেকে আনো। ওরা আমাদের অনেক দিয়েছে। নিজেরা অল্প খেয়েও দিয়েছে। ওদের ভুলতে নেই।'

বুড়ির কথা বুড়ো বুঝতে পারল। সে সব গরিব মানুষকে ডেকে আনল। যারা গরিব, যারা খিদের কষ্ট পায়,—তাদের সবাইকে ডাকল। তারা এল, প্রাণ ভরে খেল। যাদুথলের গুণ দেখল। খুব খুশি হল।

বুড়োর বাড়ি গম্‌গম্‌ করে। প্রতিদিন দুবেলা সবাই আসে। অফুরন্ত খাবার-পানীয়। সবাই খায়। বুড়োকে ভালোবাসে, বুড়িকে ভালোবাসে। সবাই খুশি। আর কারও অভাব নেই।

এদিকে হয়েছে কি, সর্দারের এক ক্রীতদাস যাদুথলের কথা জেনে গেল। সে সব কথা সর্দারকে বলল। সর্দার মনে মনে ভাবল, 'আমি হলাম এলাকার সর্দার, আমি যা খেতে পাইনা ঐ ভিখারী বুড়ো তাই খাচ্ছে? রোজ! সবাইকে খাওয়াচ্ছে? এতে তো আমারই মান গেল।'

রাগে কাঁপছে সর্দার। হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে সর্দার। এর একটা বিহিত করতেই হয়। গাড়িতে ঘোড়া জুড়ে সর্দার ছুটে চলল বুড়োর বাড়ির দিকে। ঘোড়ারা ছুটছে যেন ঝড় বইছে। পৌঁছে গেল বুড়োর ভাঙা-চোরা বাড়িতে।

গাড়ি থেকে নেমে সর্দার বুড়োর উঠোনে এল। মাথা উঁচু করে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সর্দার বলল, 'শুনতে পেলাম একটা যাদুথলে নাকি সব গরিব লোককে খাওয়াচ্ছে! সত্যি নাকি?'

বুড়ো মানুষটি জীবনে মিথ্যে কথা বলেনি। সে আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি কথা।'

'দেখি থলেটা? কেমন করে খাবার দেয়?'

বুড়ো ঘরের মধ্যে গেল। থলেটা নিয়ে এল। কেমন করে খাবার আসে কেমন করে পানীয় আসে তার কৌশল দেখিয়ে দিল। সর্দার তার চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সে এমন মদ চোখে দেখেনি। এসব জিনিস দিলেও তার রান্নাঘরের লোকজন এমন ভালো খাবার তৈরি করতে পারবে না।

সর্দার চড়া সুরে বলল, 'ও থলেটা আমাকে দিতে হবে। তুই হলি ভিখিরি, তুই এসব খাবার দিয়ে কি করবি? এসব সর্দারের বাড়ির জন্য। কত সর্দার, কত বড় মানুষ আমার বাড়িতে আসে। তাদের জন্যই থলেটা আমার দরকার। তুই এসব কোনোকালে চোখে দেখেছিস? থলেটা দে।'

'না, থলে আমি দেব না। এটা আমার। এটা তোমরা আমাকে দাওনি। থলে দিয়ে দিলে বুড়ো-বুড়ি বাঁচব কেমন করে? গাঁয়ের মানুষ বাঁচবে কেমন করে? আহা ওদের বড় কষ্ট! যাদুথলে আমি দেব না।' বুড়ো স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল।

সর্দার বলল, 'ভাবনা নেই, তোর চলার মতো আমি গাড়ি ভর্তি করে আলু, রুটি, মাংস এসব পাঠিয়ে দেব। তোদের দুজনের চলে যাবে।'

'না, তা হয় না। অনেককেই দেখতে হয়। ওরা যে বড্ড গরিব! থলে আমি দেব না।' বুড়ো কাঁপা গলায় বলল।

'তাই নাকি? চাবুকে পিঠের চামড়া তুলে নেব। সর্দারের মুখেমুখে কথা? যদি এমনিতে না দিস, তবে জোর করে নিয়ে যাব। থলে আমার চাই-ই, আমি কে জানিসনা? আমাকে চিনিসনা? তোর থলেও যাবে, তুইও যাবি মাটির নিচে। কেউ টুঁ শব্দ করবেনা।'

সর্দারের সঙ্গে বুড়ো পারবে কেন? এতক্ষণ বাধা দিয়েছিল এই কত না? লোকে শুনলে অবাক হয়ে যাবে। বুড়োর তেজ আছে। গরিব মানুষের তেজ কি বেশিক্ষণ থাকে? বুড়ো যাদুথলে সর্দারের হাতে তুলে দিল।

সর্দার ফিরে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে বুড়ো, পেছনে বুড়ি। দুজনের চোখেই জল। আর সেদিন থেকে সর্দারের বাড়ি আরও গমগম করে উঠল। নানা এলাকার সর্দারেরা এই সর্দারের বিরাট বাড়িতে আসছে। খাবার খাচ্ছে, পানীয় খাচ্ছে। এরকম খাবার-পানীয় তারাও আগে দেখেনি। কোনো গরিব মানুষ সর্দারের বাড়ি ঢুকতে পারে না। আগের মতো হয়ে গেল সব, বুড়ো আর অন্য গরিব মানুষ কাঁদে, আর সর্দারের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। এদিকে সর্দার বলেছিল, গাড়ি-ভর্তি খাবার আসবে। দিন যায়, রাত যায়, আবার দিন হয়। খাবার আসে না। বড় মানুষ কি ওসব কথা মনে রাখে? সর্দার তার নিজের দেওয়া কথা ভুলে গেল।

বুড়ি একদিন বলল, 'আমার মনে হয় সর্দার ওকথা ভুলে গিয়েছে। তুমি গিয়ে মনে করিয়ে দাও। সর্দারের তখন মনে পড়বে আর খাবার দেবে। মানুষের কতরকম ভুল হয়।'

বুড়োও তাই ভাবল। বুড়ো গেল সর্দারের বাড়ি। কিন্তু সর্দার গরিব বুড়োর কোনো কথাই শুনল না। বলল, 'তোমায় দেব এমন কিছুই আমার নেই। যা, বরং ভিক্ষে কর।'

'তাহলে আমার ছোট্ট থলে দিয়ে দাও।' বুড়ো সাহস করে বলল।

'থলে? তুই যাদুথলে ফিরে চাস? একটু দাঁড়া, কেমন থলে ফিরে পাস দেখাচ্ছি।' এই বলে রাগে সর্দার চিৎকার করে উঠল। তার চাকরদের ডাকল, পঁচিশ ঘা চাবুক মারতে বলল। হুংকার ছেড়ে বলল, 'এমনভাবে

মারবি যাতে বুড়ো আর কোনোদিন এমুখো না হয়।'

চাকররা বুড়োকে চেপে ধরল। মারতে মারতে বাড়ির সীমানার বাইরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। পড়ে রয়েছে বুড়ো। চোখে অন্ধকার, মাথা ঘুরছে, দেহ কাঁপছে। চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। অনেকক্ষণ পড়ে থাকার পরে বুড়ো কোনোরকমে সোজা হয়ে বসল ভীষণ ব্যথা দেহে। আস্তে আস্তে বাড়ির পথে চলল।

বাড়িতে ঢুকেই বুড়ো এবার কেঁদে ফেলল। সর্দারের কাছে থলে চাইতে গিয়ে কি হয়েছে সব বলল বুড়িকে। বুড়ি কান্নায় ভেঙে পড়ল। বুড়ো মানুষ দেখেও সর্দারের দয়া হলনা! তাড়িয়ে দিত কিন্তু মারল কেন? সর্দাররা এরকমই হয়। ওদের দয়ামায়া থাকতে নেই।

বুড়ি শাপ-শাপান্ত করল সর্দারের। অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপর বলল, 'তুমি আবার আমাদের জমিতে যাও। হয়তো সারসের সঙ্গে দেখা হবে। চাইলে সে ওরকম আর একটা থলে দিতেও পারে। যাদুথলে। যাবে নাকি?'

আশা জাগল বুড়োর মনে। সে অল্পক্ষণ পরে তার জমির দিকে রওনা হল। সে এল গাঁয়ের শেষ সীমানায়। জোয়ারের চাষের জমিতে বসে রইল। অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ ডানার শব্দ শুনতে পেল। দূরের ঝোপের দিকে তাকিয়ে দেখে, ডানা মেলে হাওয়ায় ভেসে সেই সারস পাখি আসছে। বুড়োর পাশে এসে নেমে পড়ল সারস।

'বন্ধু, তোমার দেওয়া সেই যাদুথলে আমাদের গাঁয়ের সর্দার কেড়ে নিয়েছে। আমি চাইতে গেলাম, আমাকে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিল। এখন বুড়ো-বুড়ি বাঁচব কেমন করে? গরিব মানুষ বাঁচবে কেমন করে? তুমি কি আর একটা যাদুথলে আমায় দেবে।' বুড়ো সারসের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অনেকক্ষণ ভাবল সারস। তারপর বলল, 'না, ওরকম আর একটা থলে আমি তোমায় দেব না। তার চেয়ে ভালো জিনিস। এবার তোমাকে একটা রুপোর শিঙ দেব।' একথা বলেই সারস উড়ে গেল দূরের ঝোপের দিকে। বুড়ো বসে রয়েছে। হঠাৎ দেখতে পেল ডানা মেলে সারস উড়ে আসছে এদিকে, তার ঠোঁটে একটা রুপোর শিঙ।

সারস শিঙটা দিয়ে বুড়োকে বলল 'এই নাও। যাদুথলের বদলে এই শিঙ নাও।'

বুড়ো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই রুপোর শিঙ নিয়ে আমি কি করব? শিখিয়ে দাও।'

সারস বলল, 'এই শিঙ নিয়ে তুমি সর্দাদের বাড়িতে চলে যাও। সেখানে গিয়ে শিঙ হাতে নিয়ে বলবে এই রুপোর শিঙে অনেক কিছু আছে। যখন সর্দার বলবে, অনেক হয়েছে আর চাই না তখন তুমি বলবে, হেই, সবাই শিঙের মধ্যে ঢুকে যাও।' একথা বলেই সারস দূরে মেঘের কোলে মিলিয়ে গেল।

বুড়ো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শিঙটা দেখল, রুপোর সুন্দর শিঙ। বুড়ো ভাবল, 'সারস নিশ্চয়ই অবাক-করা জিনিস দিয়েছে। আর হয়তো সর্দারের কাছে চাবুক খেতে হবে না। সারস তো আমার বন্ধু।'

বুড়ো বাড়ির পথে হাঁটছে আর ভাবছে,—সর্দারের বাড়ি যাওয়া কি ঠিক হবে? মরে যাইনি ভাগ্যি! কি ভাবেই না মারল! আপন মনে এসব ভাবতে ভাবতে বুড়ো পথ চলছে।

হঠাৎ পথে দেখা সর্দারের এক শিকারীর সঙ্গে। সে সর্দারের বাড়িতেই থাকে। সর্দারের পাশে থাকে সবসময়। বুড়োকে দেখতে পেয়েই শিকারী বলল, 'কি হে, কোথায় গিয়েছিলে? খবর কি বুড়ো?'

বুড়ো আনমনে বলল, 'আমি আমার পুরোনো বন্ধু সারস পাখির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। অনেকদিন দেখা হয়নি। আজ দেখা পেলাম।'

'তা, সারস তোমায় কিছু দিল নাকি?'

'হ্যাঁ, দিয়েছে। একটা রুপোর শিঙ।' বুড়ো ঢোলা জামার ভেতর থেকে রুপোর শিঙ বের করে শিকারীকে দেখাল।

শিকারীর চোখ চক্‌চক্ করে উঠল। কোনোরকমে উত্তেজনা চেপে বলল, 'তা এতে কি হয়? কাজটা কি?'

'এমনি। একটা রুপোর শিঙ। কি আর হবে?' বুড়ো বলল।

শিকারী একটু রেগে গেল। রাগ সামলে বলল, 'কিছুই হয় না? তুমি বুড়ো কিছু চেপে যাচ্ছ। আমার মনে হয়, শিঙের কাছে চাইলে হয়তো সোনা-হীরে পাওয়া যাবে। কি বল?'

'তা হতে পারে। হয়তো পাওয়া যাবে। কে জানে?'

'তাহলে, শিঙকে বল না? সোনা-হীরে বেরোক।'

'শিকারী, তুমি নিজেই করনা। নিজেই বল, এই রুপোর শিঙে অনেক

কিছু আছে। এই বললেই হবে।'

শিকারী তাড়াতাড়ি বুড়োর হাত থেকে রুপোর শিঙটা ছিনিয়ে নিল। হাতে নিয়ে বলল, 'এই রুপোর শিঙে অনেক কিছু আছে।' অবাক কাণ্ড। শিঙের মুখ থেকে একে একে ঝড়ের বেগে বারোজন শক্তিমান যুবক বেরিয়ে এল। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে শক্ত চাবুক। তারা বেরিয়েই লোভী শিকারীকে চাবুক মারতে শুরু করল। যন্ত্রণায় ছট্‌ছট্‌ করছে শিকারী। মাটিতে আছড়ে পড়ছে। তারা কিন্তু থামছে না।

শিকারী চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলছে, 'ওগো বুড়ো, তোমার পায়ে পড়ি, এদের ফিরিয়ে নাও। আর পারি না। এবার প্রাণ বেরিয়ে যাবে।'

বুড়ো হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। এমন আনন্দ সে জীবনে পায়নি। হাসছে আর বলছে, 'ওগো শিকারী, বেশি কৌতূহল ভালো নয়, বেশি লোভ ভালো নয়। অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ো না, তাহলে বিপদেও পড়বে না। হয়েছে তো?'

এর মধ্যে বারোজন যুবক শিকারীকে মারতে মারতে প্রায় তাল পাকিয়ে ফেলেছে, মনে হচ্ছে শিকারী যেন এক তাল জোয়ারের ময়দা, এখনি রুটি তৈরি হবে। বুড়ো দেখছে আর হাসছে।

তারপর বুড়ো বলল, 'হেই, সবাই শিঙের মধ্যে ঢুকে যাও।' চোখের পলকে তারা ছোট হয়ে শিঙের মধ্যে ঢুকে পড়ল। শিঙটা পড়ে রয়েছে, কেউ কোথাও নেই। শিকারী গোঁঙাচ্ছে। বুড়ো ভাবল, 'এবার বুঝেছি, বন্ধু সারস কেন আমায় এটা দিয়েছে।' মুচ্‌কি হেসে শিঙ হাতে নিয়ে বুড়ো চলল সর্দারের বাড়ির দিকে।

সর্দারের বাড়ির কাছে পৌছতেই বুড়ো শুনতে পেল, ভেতরে চলেছে হৈ-হল্লা। সেখানে তখন খাওয়া-দাওয়ার ধুম। আনন্দফুর্তি। বুড়ো মস্ত উঠোনে ঢুকল। বড় জানলা দিয়ে দেখতে পেল অনেক অতিথির ভিড়, খাচ্ছে আর নাচানাচি করছে। কি আনন্দেই তারা আছে! অথচ যার দয়ায় সর্দার এসব করছে সেই যাদুথলে কিন্তু তারই ছিল। বুড়ো আরও দেখল, যাদুথলে একটা কাঠের পাটাতনের ওপর শুয়ে আছে। সে খুব আনমনা হয়ে গেল।

জানলা দিয়ে সর্দার বুড়োকে দেখতে পেয়েছে। গলা বাড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'এই বুড়ো, তোর এখানে কি চাই?'

'সর্দার, প্রভু, আমি আমার যাদুথলে নিতে এসেছি।'

'হাঃ হাঃ! তোর শিক্ষা হয়নি। এরকম যাদুথলে তোর কোনোদিন ছিল নাকি? বোকা বুড়ো কোথাকার! খুব লোভ!' হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সর্দার। হঠাৎ থেমে গেল। হুংকার ছেড়ে চাকরদের ডাকল, 'বুড়োকে ঘরের মধ্যে ধরে আন। আমার অতিথিদের সামনে পঁচিশ ঘা চাবুক মার। আর ফিরতে দিবিনা। ধরে আন।'

চাকররা বুড়োর ঘাড় ধরে হিড়্‌হিড়্ করে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দিল সর্দারের পায়ের কাছে। কিন্তু এরই মধ্যে বুড়ো ঢোলা পোশাকের মধ্যে থেকে কোনোরকমে রুপোর শিঙটা বের করেই বলে উঠল, 'এই রুপোর শিঙে অনেক কিছু আছে।' বুড়োর চোখে আগুন ছুটছে।

অবাক কাণ্ড। বারোজন শক্তিমান যুবক একে একে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল রুপোর শিঙ থেকে। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে চাবুক। তারা বেরিয়েই সপাং সপাং করে চাবুক মারতে লাগল। সে আঘাতকে কেউ বাধা দিতে পারল না। চাকরবাকর, সর্দার আর অতিথিরা যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে কাঁদছে।

সবচেয়ে বেশি মার খাচ্ছে সর্দার। কেননা, বুড়ো দাঁড়িয়ে আদেশ দিচ্ছে, চাকরদের জন্য এক ঘা চাবুক, অতিথিদের জন্য দু ঘা আর সর্দারের জন্য তিন ঘা।' বুড়োর কথামতো যুবকেরা কাজ করে চলেছে। বিশ্রাম নেই, অবিরাম।

সর্দার সবচেয়ে বেশি মার খেয়ে পাগলের মতো চিৎকার করছে, গোঙাচ্ছে, আছাড়ি-পাছাড়ি খাচ্ছে। সে আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। মিনতি করে বলল, 'বুড়ো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিরিয়ে নাও তোমার যাদুথলে, থামতে বল তোমার ছেলেদের। এবার মরেই যাব।'

বুড়ো মুচকি হেসে বলল, 'আহা, একথাটা যদি তুমি আগে বুঝতে সর্দার। থলেটা যদি আগেই দিয়ে দিতে। তুমি ফিরিয়ে দিতে চাইছ ঐ ছোট্ট থলে? ফিরিয়ে দেবে কি? ওটা তো তোমার নয়। কিছুই দিতে চাইছ না তুমি, আমি ছেলেদের থামতে বলি কেমন করে?'

'বুড়ো, তুমি আর কি চাও বল? আমি তোমায় একটা গোরু দেব, একটা ঘোড়াও দেব। ওদের থামতে বল।'

'না সর্দার, ওগুলো এমন কিছু বেশি নয়।'

'বুড়ো, মরে গেলাম। মরে গেলাম। উঃ, প্রচণ্ড চাবুকের মার! তুমি যদি ওদের ফিরিয়ে না নাও, সত্যি বলছি মরে যাব। বল, তোমার আর কি কি চাই?' সর্দার চিৎকার করে কাঁদছে।

'বেশ, তুমি যদি বাঁচতে চাও, তাহলে তোমার বাড়ি-জমি-পশুপাখি সব গাঁয়ের গরিবদের দিয়ে দিতে হবে। আর তোমাকেও এই গাঁ ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে যেতে হবে। অনেক খারাপ কাজ করেছ তুমি। তোমার ক্ষমা নেই। বহুদূরে তোমায় চলে যেতে হবে। রাজি আছ?'

'ওগো বুড়ো, এই বাড়ি এত জমি ছেড়ে আমি বাঁচব কেমন করে? আমি তো কাজকম্ম জানিনা, কি করে বাঁচব? আমার হয়ে কে কাজ করে দেবে?'

হাসতে হাসতে বুড়ো বলল, 'সেসব তুমিই জান। আমার জানার কথা নয়। ছেড়ে যেতে না চাইলে এমনিভাবে মার খেতেই হবে। উপায় কি বল? এই ছেলেরা, এখন শুধু চাবুক চালাও সর্দারের দেহে।'

যুবকেরা চাকর ও অতিথিদের ছেড়ে শুধু সর্দারকেই মারতে লাগল। বারোজন একজনকে মারছে। গরম পাত্রে যেমন করে বান মাছ যন্ত্রণায় লাফায় সর্দার তেমনি লাফাচ্ছে। শেষকালে সর্দার বলল, 'সব নাও বুড়ো, সব নাও। গরিবদের দাও। শুধু ওদের থামাও।'

বুড়ো বলল, 'যাক, ব্যাপারটা বুঝেছ। ঠিক ওষুধ ধরেছে। শোন, মনে রেখ আমাকে আর আমার ছেলেদের। এই ছেলেরা, হেই, সবাই শিঙের মধ্যে ঢুকে যাও।'

চোখের পলকে ছেলেরা ছোট্ট হয়ে সবাই শিঙের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সব শান্ত। চাকররা অতিথিরা আর সর্দার সবাই মেঝের ওপরে গড়াগড়ি খাচ্ছে, কাঁদছে, গোঙাচ্ছে, বিড়বিড় করে কিসব যেন বলছে। আনন্দের আর ফুর্তির ঘর কেমন পালটে গিয়েছে।

বুড়ো তার সুন্দর রুপোর শিঙটা ঢোলা পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। পাটাতনের ওপর থেকে যাদুথলে তুলে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিল। বুড়োকে কেমন খুশিখুশি জয়ীজয়ী লাগছে, চোখে দীপ্তি, চলাফেরায় উচ্ছলতা। সবদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

শেষকালে সর্দারের কাছে গিয়ে বলল, 'সর্দার, তোমার অনেক রয়েছে। কোনো অভাব তোমার নেই। বন্ধু সারস পাখি আমায় যাদুথলে দিয়েছিল। সব গরিব মানুষ আমরা খেয়েপরে ভালোই ছিলাম। সহ্য হল না তোমার।

সর্দার হয়ে কোথায় তুমি আমাদের বাঁচাবে, না আমাদের শুধু কষ্টই দিয়েছ। যাকগে ওসব কথা।' হঠাৎ বুড়ো রাগে ক্ষেপে গিয়ে আবার বলল, 'শোন সর্দার, কাল সকালে আমি আবার আসব। হাতে থাকবে আমার রুপোর শিঙ। তোমায় যদি এখানে দেখতে পাই, ছেলেদের আবার ডাকব। আর কিছু নয়।'

বুড়ো তার রুপোর শিঙ আর যাদুথলে পেয়ে খুব খুশি। গাঁয়ের সবাই খুশি। সবাই প্রাণ ভরে খেতে পারবে। ওদের বড় কষ্ট।

বুড়ো যদি আবার ফিরে আসে? হাতে যদি থাকে সেই রুপোর শিঙ? আর যদি...। সেদিন থেকে সর্দারকে আর কেউ দেখেনি। একা সে চলে গিয়েছে কোথায় কেউ জানে না। সেদিন থেকে অন্য গাঁয়ের সর্দাররাও খুব ভয়ে ভয়ে থাকে। গায়ের লোকের ওপর জুলুম করে না। যদি বুড়োকে ওরা ডেকে আনে?

সূর্য ওঠে সূর্য অস্ত যায়, গাঁয়ের লোক সকাল-সন্ধ্যে বুড়োর বাড়ি আসে। দিনগুলো বড় সুন্দর! রাতগুলোয় ভয় নেই।

কেশবতী কন্যা

ঐ যে আমাদের গাঁয়ের পাশে যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, ঐ যে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া জলরাশির ধারা দেখতে পাচ্ছ, কি মনে হয় তোমাদের ? পাহাড় থেকে যে জলধারা নামছে তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখ। মনে হবে, এক কেশবতী কন্যা পেছন দিয়ে বসে রয়েছে খাড়া উঁচু পাহাড়ের ধারে, আর তার লম্বা সাদা কেশরাশি পাহাড় বেয়ে নামছে। আমরা একে বলি, কেশবতীর ধারা, কেশবতী জলপ্রপাত। কেন বলি তাই শোন।

অনেক অনেক কাল আগে আমাদের গাঁয়ে কিংবা ঐ পাহাড়ে কোনো জল ছিল না। জলের কোনো উৎস নেই, কোনো ধারা নেই। আকাশের জল ছিল একমাত্র ভরসা। বৃষ্টির সময়ে গাঁয়ের লোকেরা জল ধরে রাখত। সেই জল খেত, সেই জলেই হত চাষবাস। আর যে বছরে হত খরা, বৃষ্টির নামগন্ধ নেই, সে বছরে অনেক দূর থেকে, পাহাড়ের ওপাশ থেকে জল বয়ে আনতে হত। ওখানে আছে একটা ছোট নদী। কিন্তু সে জলে তেষ্টা মিটত। চাষবাস করা যেত না। অত দূর থেকে অত জল আনবে কে ? ফসল হত না, বড়ই কষ্ট ছিল।

এই পাহাড়ী গাঁয়ে থাকত এক মেয়ে। খুব গরিব ঘরের মেয়ে। তার মেঘবরণ চুল, দাঁড়কাকের বুকের পালকের মতো রঙ সে চুলের। এই কেশবতী কন্যার চুল পিঠ ছাড়িয়ে কোমর ছাড়িয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢেউ খেলত। কি যে তার নাম ছিল গাঁয়ের লোক ভুলে গিয়েছিল। তাকে ডাকত কেশবতী কন্যা বলে। সবাই তাকে ভালোবাসত। কেননা, এমন হৃদয় আর কারও ছিল না। বড় ভালো সেই মেয়ে।

মেয়ের কেউ নেই, আছে এক বুড়ি মা। সে বিছানায় শুয়ে থাকে। সে অসুস্থ। তার সেবা করে মেয়ে। এতেই তার আনন্দ। মেয়ের ছিল একপাল শুয়োর। তাই থেকেই মা মেয়ের কষ্টের সংসার চলে যেত। কোনো রকমে। খরার সময় মেয়ে ভোর রাতে উঠে চলে যেত ঐ দূরের ছোট নদীতে। জল আনতে। তারপরে যেত পাহাড়ে। সেখানে বুনো ফল, কচু, রসাল গাছের গোড়া নিয়ে আসত। শুয়োরদের জন্য। মেয়ে সকাল থেকে

রাত পর্যন্ত শুধু খেটেই চলত। খুব কষ্ট মেয়ের। সংসারে কাজের লোক সে একা।

এমনি একদিনের কথা। ঝুড়ি হাতে চলেছে পাহাড়ে ফলমূল খুঁজতে। হঠাৎ পাহাড়ের এক জায়গায় দেখল, একটা সুন্দর ওলকপি ফলে রয়েছে। ভালোই হল, রান্না করে মাকে দেব, নিজেও খাব। এই ভেবে সে ওলকপির কাছে গেল। পাতাগুলো আশ্চর্য সবুজ, পাতাগুলো খুব পুষ্ট।

ঝুড়ি নামিয়ে রেখে দুহাতে জোরে টান দিল। গোড়া বেশ শক্ত। উঠে এল ওলকপি। ওলকপির নিচের অংশ বেশ বড়, লাল রঙের আর সুন্দর গোল। একটা ছোট গর্ত হল পাহাড়ী কাঁকুরে মাটিতে। অবাক কাণ্ড! সেই গর্ত থেকে ঝরনার জলের মতো জল বেরোচ্ছে। উপচে পড়ছে গর্ত। ভিজে যাচ্ছে আশপাশের মাটি। হঠাৎ, 'হুশ' করে শব্দ হল। ওলকপি তার হাত থেকে লাফিয়ে পড়ল। আবার গর্তে বসে পড়ল। জল বন্ধ হয়ে গেল। মেয়ে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে। আনন্দে, ভয়ে, বিস্ময়ে।

খুব তেষ্টা পেয়েছে কেশবতী কন্যার। সে আবার তুলে আনল ওলকপি। আবার গর্ত ছাপিয়ে জল পড়তে লাগল। নিচু হয়ে মুখ কাছে আনল। প্রাণভরে জল খেল। ঠাণ্ডা বরফের মতো জল, ফলের রসের মতো মিষ্টি জল। গর্ত থেকে মুখ সরিয়ে আনবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের হাত থেকে ওলকপি লাফিয়ে পড়ল। ঠিক গর্তে। জলের ধারা বন্ধ হল।

বুনো লতাপাতার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়ে। অবাক চোখে পাহাড়ের চারপাশ দেখছে। পাহাড়কে আজ অনেক বেশি ভালো লাগছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এল। মেয়েকে যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল। মেয়ে এসে পড়ল একটা গুহার সামনে। আর দমকা হাওয়া নেই।

এদিক ওদিক চাইতেই মেয়ে দেখল, সামনে একটা পাহাড়ের ওপরে বসে রয়েছে একজন লোক। তার সারা দেহ কটা রঙের লোমে ভর্তি। লোমশ মানুষ। মেয়ের দিকে চেয়ে বলল, 'ও তুমি, তাহলে তুমিই আমার গোপন ঝরনার কথা জেনে ফেলেছ। শোন, একথা তুমি কাউকে বলবে না। একজনকেও নয়। তুমি যদি বল কিংবা কেউ যদি আমার ঝরনার জল নিতে আসে, আমি তোমাকে জ্যান্ত মেরে ফেলব। মনে রেখো আমার কথাগুলো। আমি এই পাহাড়ের দেবতা। ভুললে বিপদ।'

আর একটা দমকা হাওয়া এল। মেয়ে ছিটকে এসে পড়ল পাহাড়ের নিচে। পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়ে। আর দমকা হাওয়া নেই। সে আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে এল।

মেয়ে মাকে কিছুই বলল না। সেই কোন ভোররাতে চলে যায় দূরের নদীতে, জল আনতে। সারাদিন খাটে। কিন্তু এরকম তো আগেও ছিল। তবু ঝরনার গোপন খবর জানার পর থেকে মেয়ে যেন আরও চুপচাপ হয়ে গিয়েছে।

এবারে প্রচণ্ড খরা। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। আকাশে মাঝেমধ্যে মেঘ দেখা দেয়। সবাই চেয়ে থাকে ওপরপানে। না, বৃষ্টি হল না। মেঘ কোথায় উড়ে গেল। চাষের মাঠ ফুটিফাটা হয়ে গিয়েছে। মাটি আর পাথরে কোনো তফাৎ নেই। লাঙল দেওয়া যায় না মাটিতে। গ্রামবাসীর সে কি কষ্ট। জলের ধারা কোথায় আছে মেয়ে জানে। অথচ বলতে পারছে না। বললেই মৃত্যু। সব মানুষ, কচি-বুড়ো সবাই হাঁপাচ্ছে, জলের জন্য হাহাকার করছে। অত দূর থেকে কি নিত্যি নিত্যি এতদিন ধরে জল বয়ে আনা যায়? হায়! মেয়ে যদি জলের কথা বলতে পারত! কোনো পরিশ্রম নেই। পাহাড়ের ওপরে ঐ ওলকপি সরিয়ে ফেল, গর্তটা গাঁইতি দিয়ে আরও বড় কর, উপচে পড়বে জল। মিষ্টি শীতল জল। ভাবে আর শিউরে ওঠে। মনে পড়ে সেই ভয়ানক মানুষটির কথা, লোমশ লোকটির কথা। সে নিজের মনেই চেপে থাকে। গুমরে মরে নিজের মনেই।

মনে মনে খুব দুঃখ পেতে লাগল কেশবতী কন্যা। এক চিন্তা সব সময়। তার খিদে চলে গেল, রাতে চোখের পাতা এক হয় না। শুধুই দুশ্চিন্তা। আস্তে আস্তে মেয়ে হয়ে উঠল এক নির্বাক প্রাণী। কোনোভাবেই কথা বলে না। শুধু কাজ করে। কি যেন ভাবে। চোখে ছিল তার স্নিগ্ধ দীপ্তি, কোথায় গেল সেই উজ্জ্বলতা। প্রাণহীন চোখ দুটোয় কোনো ভাষা নেই। গালদুটিতে ছিল গোলাপী ফুলের আভা। কোথায় গেল সেই আভা। আর আশ্চর্য! মেঘবরণ লম্বা চুল আস্তে আস্তে কেমন জট পাকিয়ে গেল, উস্‌খো-খুস্‌কো চুলে আর চেনাই যায় না কেশবতী কন্যাকে।

মা শুয়ে থাকলেও এসব বুঝতে পারে। একদিন মেয়ের রোগা রোগা হাতখানি ধরে মা করুণ গলায় বলল, 'বাছা, তোর কিসের কষ্ট? কি হয়েছে তোর? এত কাহিল হয়ে পড়ছিস্‌ কেন মা?'

মেয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল, চোখে আতঙ্ক, বুকের মধ্যে কেমন যেন করছে। কিছু বলতে পারলে সে হাল্‌কা হত। কিন্তু না, সে পারল না। কিছুই বলল না মাকে।

দিন চলে যায়, মাস বয়ে যায়। কারও জন্য তারা বসে থাকে না। কেশবতী কন্যার ঘন চুলের রাশির রঙ একেবারে পাল্‌টে গেল। বরফের মতো সাদা হয়ে গেল। চুলে পড়ে না চিরুনি, হাত পড়ে না মাথায়। পিঠ ছাপিয়ে সাদা রঙের কেশরাশি আলুলায়িত থাকে। কি ছিরি হয়েছে সে সুন্দর চুলের! লম্বা সাদা ঝোপ।

গাঁয়ের লোক মেয়েকে দেখে আড়ালে বলে, 'অবাক কাণ্ড! এক রত্তি মেয়ে, এই তো কচি বয়েস, কিন্তু মেয়ের চুল এমন ধারা সাদা হয়ে গেল কেমন করে? এমন কাণ্ড দেখিনি কখনও।' মেয়েকে তারা খুব ভালোবাসে বলে আরও বেশি দুঃখ করে। মেয়ের কোনো খেয়াল নেই।

মেয়ে নিজের বাড়ির বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। উদাস চোখে পাহাড়ের দিকে কিংবা মেঘের চলার পথে তাকিয়ে থাকে। কখনও পথিকের হেঁটে যাওয়া দেখে। গায়ের কোনো চেনা মানুষকে দেখে মেয়ে বিড়বিড় করে বলে, —দূরের ঐ উঁচু পাহাড়ে.....কিন্তু কথাটা শেষ করে না। জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরে, এত জোরে চেপে ধরে ঠোঁট যেন মনে হয় দাঁতের চাপে রক্ত ছুটে বেরুবে। রক্ত টলটল করে সুন্দর ঠোঁটে। গাঁয়ের মানুষ আধখানা কথা বহুবার শুনেছে। থেমে গিয়েছে পুরো কথা শোনার জন্য। আজও তা শুনতে পায়নি।

এমনি একদিনের কথা। মেয়ে উদাস চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেড়ার ধারে। কতশত ভাবছে মেয়ে। এমন সময় সামনের পায়ে-চলা পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একজন বুড়োমতন লোক। তার সব দাড়ি পাকা। হাওয়ায় দুলছে। তার হাতে জলের একটা পাত্র। ঐ দূরের ঝরনা থেকে সে জল বয়ে আনছে। আহা! বুড়ো মানুষ। তার পা কাঁপছে। অত দূরের পথে হাঁটা কি সহজ। হঠাৎ বুড়ো একটা পাথরে হোঁচট খেল। টাল সামলাতে পারল না। হুমড়ি খেয়ে পথে পড়ে গেল। ছিট্‌কে গেল জলের পাত্র। জল গেল গড়িয়ে। পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ উঠে গিয়েছে, পাথরে লেগে কপাল কেটেছে। রক্ত বেরুচ্ছে গলগল করে। মাথা নিচু করে বুড়ো উঠবার চেষ্টা করছে।

আঁৎকে উঠল কেশবতী কন্যা। ছুটে গেল বুড়োর কাছে। তার পোশাকের

ধার থেকে ছিঁড়ে ফেলল এক টুক্‌রো কাপড়। নিচু হয়ে বসে পড়ল মেয়ে। আদরে-যত্নে বুড়োকে বসিয়ে বেঁধে দিল তার আঘাতের জায়গা দুটো। রক্ত বন্ধ হল। বুড়ো গোঙাচ্ছে, চোখ ভিজে উঠেছে, যন্ত্রণায় মুখের চেহারা অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। মেয়ে করুণ চোখে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে রইল। বুড়োর গোটা মুখ বয়সের ভারে কুঁচকে গিয়েছে। যন্ত্রণায় কুঁচকে-যাওয়া চামড়া কাঁপছে। বুড়ো চোখ বন্ধ করে রয়েছে।

মনে মনে কেশবতী কন্যা বলল, 'আমি এত ভীতু? এত স্বার্থপর? নিজের কথাই শুধু চিন্তা করছি। আমার এত মৃত্যুভয়? ছিঃ ছিঃ! মাঠ শুকিয়ে গিয়েছে, ফসল জ্বলে গিয়েছে। খাওয়ার জল পর্যন্ত নেই। জলের হাহাকার। মানুষের এত কষ্ট। অথচ আমি জানি ..। গাঁয়ের লোকের তো এত কষ্ট হবার কথা নয়। আমি তো উপায় জানি। আমার জন্যই এই বুড়ো মানুষের পা ভেঙেছে, কপাল ফেটেছে। ভীতু, ভীতু কোথাকার!'

এবার বোধহয় পাগল হয়ে যাবে মেয়ে। আর সহ্য করতে পারছে না, কথা চেপে রাখতে পারছে না। বুক বুঝি ফেটে যাবে। গলা শুকিয়ে উঠেছে। নাঃ, অনেক হয়েছে, আর না।

মেয়ে বুড়োর রক্ত-মাখা কপালে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'বাবা, দূরের ঐ উঁচু পাহাড়ে একটা ঝরনা রয়েছে। ঝরনার মুখে বসানো রয়েছে একটা ওলকপি। ঝরনার মুখ থেকে ওলকপিটা তুলে নেবে। টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলবে। দূরে ফেলে দেবে। গাঁইতি চালিয়ে ঝরনার মুখের গর্তটা অনেক বড় করে দেবে। পাহাড়ের কোল ছাপিয়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে জলের ধারা নামবে। অফুরন্ত জল। ঠাণ্ডা মিষ্টি জল। এ গল্পকথা নয়, সত্যি। আমি নিজে চোখে ঝরনার ধারা দেখেছি। আঃ, কি শান্তি।'

বুড়ো যেন কিছু বলবে। কিন্তু তাকিয়ে দেখে মেয়ে আর বসে নেই। পথ দিয়ে সামনে হেঁটে চলেছে। পেছনে দুলছে লম্বা চুলের রাশি, বরফের মতো সাদা।

হঠাৎ মেয়ে দৌড়তে লাগল। ছুটে গেল গাঁয়ের ভেতরে। চিৎকার করে বলল, 'সবাই বেরিয়ে এসো। সবাই। ঐ দূরের পাহাড়ে একটা ঝরনা আছে। আমি জেনে এসেছি। সবাই এসো।'

গাঁয়ের মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। মেয়ের চারপাশে এসে দাঁড়াল। অনেক দিন পরে তারা কেশবতী কন্যার কথা শুনল। অবাক হয়ে চেয়ে

রয়েছে মেয়ের দিকে। কারও মুখে কথা নেই। এ মেয়েকে তারা অবিশ্বাস করতে পারে না। এ কি কথা শোনাচ্ছে মেয়ে?

মেয়ে সব খুলে বলল। ডাগর চোখে সে চেয়ে রয়েছে গাঁয়ের মানুষের দিকে। মেয়ে বলল ঝরনার কথা, কেমন করে খুঁজে পেয়েছে সেই ঝরনা, কি করতে হবে তাদের। সব বলল। শুধু পাহাড়ের দেবতার সেই ভয়ানক কথার কিছুই জানালো না। দেবতার কথাও বলল না। মেয়েকে তারা সবাই খুব ভালোবাসে। অবিশ্বাস করবে কেন তার কথা? তারা মেয়ের পিছু পিছু চলল।

মেয়ে চলেছে এগিয়ে। পেছনে হাওয়ায় দুলছে কেশরাশি। অনেকের হাতে গাঁইতি, কারও হাতে ধারাল ছুরি। সামনে বেঁকে তারা পাহাড়ে উঠছে, মেয়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পৌঁছে গেল গুপ্ত ঝরনার কাছে। নিচু হয়ে ঝরনার মুখ থেকে তুলে নিল সেই ওলকপিটা। দূরে ফেলে দিল। বলল, 'টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেল ওটাকে।'

একসঙ্গে কয়েকটা ছুরির আঘাত পড়ল ছোট ওলকপির ওপরে। শত টুক্‌রো হয়ে গেল ওলকপি। ছোট গর্ত থেকে জল উপ্‌চে পড়ছে। ঝিরিঝিরি জল। ভিজে উঠেছে পাশের পাহাড়ী মাটি।

কেশবতী কন্যা শান্ত মিষ্টি গলায় বলল, 'দেরি নয়, গর্তের মুখ বড় করতে হবে। গাঁইতি নাও। খুব তাড়াতাড়ি। যত বড় পারবে তত বড় করবে। তাড়াতাড়ি। নইলে...।' ঠোঁট কামড়ে ধরল মেয়ে।

অতশত দেখার সময় নেই। মনও নেই। অনেক গাঁইতি পড়ল গর্তের মুখে। মাটি উঠছে, নুড়ি উঠছে, জলের ধারা নামছে। ভীষণ শব্দ করে জল বেরুচ্ছে। পায়ের পাতা ডুবল, জল উঠছে, হাঁটু ডুবছে। জলের ধারা পাহাড়ের কোল ছাপিয়ে, গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে নিচে, গাঁয়ের দিকে, গাঁয়ের পাশ দিয়ে। ছোট নদী বয়ে চলেছে গাঁয়ের পাশ দিয়ে। অফুরন্ত জলের উৎস, অফুরন্ত জলের ধারা। আনন্দে নাচছে গাঁয়ের মানুষজন, তারা জল ছিটিয়ে সবাইকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। আঃ, কি শান্তি!

হঠাৎ পাহাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেল একটা দমকা হাওয়া। এত লোকের চোখের সামনে থেকে নিমেষে মিলিয়ে গেল কেশবতী কন্যা। শুধু একজন নেই। সবাই আছে। কিন্তু এসব দেখার সময় নেই তাদের। তারা জানতেই পারল না, কেশবতী কন্যা এখন আর তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে নেই।

হঠাৎ একজন বলে উটল, 'আরে! কেশবতী কন্যা কোথায়? সে কোথায় গেল?'

অন্য একজন বলল, 'সে বোধহয় বাড়িতে গিয়েছে। সবার আগেই চলে গিয়েছে। বুড়ি মা একা রয়েছে।' সবাই মেনে নিল তার যুক্তি। পাহাড় থেকে নেমে এল তারা। সবাই যেন অন্য মানুষ। নতুন শক্তি তাদের দেহে, মনে।

কিন্তু কেশবতী কন্যা তো আর তার বাড়িতে যায়নি! দমকা হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে সেই ভয়াবহ গুহার সামনে। পাহাড়ের দেবতা বসে রয়েছে। পাথরের ওপরে। চোখ জ্বলছে।

হুংকার ছাড়ল পাহাড়ের দেবতা, 'আমি নিষেধ করেছিলাম তোমাকে। ঝরনার কথা কাউকে বলবে না। সবাইকে বলে দিলে। তাদের নিয়ে এলে পাহাড়ী ঝরনার কাছে। তারা টুক্‌রো টুকরো করে ফেলল আমার যাদু ওলকপি। তারা গাঁইতি চালিয়ে আমার গুপ্ত ঝরনার মুখ বড় করে ফেলল। আমি নিষেধ করেছিলাম। এবার আমি তোমায় জ্যান্ত মেরে ফেলব।' দেবতা দাঁতে দাঁত ঘষল।

কেশবতী কন্যার আলুলায়িত কেশরাশি পিঠের ওপরে হাওয়ায় দুলছে। মিষ্টি সুরে শান্ত গলায় মেয়ে বলল, গাঁয়ের, মানুষজনের দুঃখ ঘুচেছে। আমি হাসিমুখে মরতে পারব। আনন্দে মরব। কোনো ভয় নেই আমার। আমি তৈরি।'

পাহাড়ের ভয়ানক দেবতা আকাশ ফাটিয়ে হেসে উঠল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে সে হাসি হাজার হাসি হয়ে ফেটে পড়ল। 'তোমাকে মরতে হবে। কিন্তু অত সহজে তোমাকে মারব না। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে তিলে তিলে তোমায় মরতে হবে।'

মেয়ে শান্ত চোখে চেয়ে রইল। মেঘের লুকোচুরি খেলা চলেছে। মেয়েকে ছুঁয়ে মেঘেরা পাহাড়ের পাশ দিয়ে ভেসে চলেছে। মেয়ের ঠোঁটের কোণে পবিত্র হাসি।

হঠাৎ দেবতা হুংকার দিয়ে উঠল, 'ঐ নিচে মসৃণ পাথরের ওপরে তোমাকে শুইয়ে দেব। ঐ পাথরে, যার ওপরে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ী ঝরনার জল। তোমার শয়তানীতে ছোট্ট ঝরনা জলপ্রপাত হয়েছে। তার নিচে তোমায় শুইয়ে দেব। জলের আঘাতে দেহ ওলোট্‌ পালোট্‌ হয়ে

যাবে, হৃদয় ফাটবে, দম বন্ধ হয়ে আসবে। যন্ত্রণা, ভীষণ যন্ত্রণা। তিলে তিলে মৃত্যু। নিষেধ না মানার প্রতিফল।' দাঁতে দাঁত ঘষছে দেবতা।

সাদা মেঘের মধ্যে দাঁড়িয়ে মেয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'গাঁয়ের মানুষদের ভালোর জন্য আমি ঐ পাথরের ওপরে শুয়ে পড়তে একটুও ভয় পাই না। আমার দেহে জলের ধারা আঘাত করুক। কিন্তু হে পাহাড়ের দেবতা, তোমায় প্রণাম জানিয়ে আমি একটা ছোট্ট ভিক্ষা চাই। ভিক্ষা দেবে?' মেয়ের হাসিমুখে মুক্তো ঝরছে।

'কি তোমার ভিক্ষা? আগে শুনি।'

মেয়ে চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার কেউ নেই। রয়েছে এক বুড়ি মা। কোনো কাজ মা করতে পারে না। অনেক বয়েস। আর রয়েছে শুয়োরের কয়েকটা ছোট্ট ছানা। তারাও নিজেরা খেতে পারে না। হায়! দেবতা, মরবার আগে একবার আমায় বাড়ি যেতে দাও। ওদের ভার একজনের ওপরে দিয়েই আমি ফিরে আসব। আমি কখনও মিছে কথা বলি না। দোহাই তোমার, একবার বাড়ি যেতে দাও।' মেয়ে কাঁদছে।

'বেশ, তুমি যেতে পার। কিন্তু একটা শর্তে। যদি তুমি ফিরে না এসে কোথাও পালিয়ে যাও, তাহলে, তাহলে আমি ঝরনার মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেব। আর, আর গাঁয়ের সব মানুষকে পাথরে পিষে মেরে ফেলব। মনে থাকবে?' অল্প থেমে দেবতা কথাগুলো বলল। দুচোখে তার আগুন ঝরছে।

মেয়ে আস্তে আস্তে পাহাড়ী পথে হেঁটে চলল। পেছনে দেবতা বসে রইল। হঠাৎ দেবতা বলল, 'দাঁড়াও। ফিরে যখন আসবে তখন আমার কাছে আসবার দরকার নেই। সোজা মসৃণ পাথরের ওপরে চলে যাবে, শুয়ে পড়বে। জলের ভীষণ ধারার নিচে শুয়ে পড়বে। আমি সব জানতে পারব।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মেয়ে হেঁটে চলল। পাহাড়ী পথে মেয়ে নেমে আসছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এল। মেয়েকে উড়িয়ে নিয়ে পাহাড়ের নিচে পায়েচলা পথে নামিয়ে দিল। দমকা হাওয়া মিলিয়ে গেল। আঃ, কি শান্তি। সাদা জলের ধারা ফেনা তুলে নিচে আছড়ে পড়ছে। অফুরন্ত জলের ধারা। জলের ধারা শুকনো জমির ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। কত ফসল ফলবে এবার। মেয়ে খুশির হাওয়া বইয়ে পালকের মতো ভেসে চলল।

গাঁয়ের পথে, বাড়ির পথে।

বাড়িতে পৌঁছে গেল কেশবতী কন্যা। কিন্তু ঘরে ঢুকেই সে কেমন দমে গেল। মাকে সত্যি কথা বলবে কেমন করে? একথা শুনেই মা যদি . । মেয়ের বুক কেঁপে উঠল।

মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে মেয়ে বলল, 'মা, আমাদের গাঁয়ের পাশ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে, ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলানো অফুরন্ত জল। সব জল আসছে পাহাড়ী ঝরনা থেকে। আর কোনো ভাবনা নেই। জলের ভাবনা নেই।'

মা চেয়ে আছে মেয়ের দিকে। শুকনো মুখেও হাসি। মেয়ে আবার বলল, 'মা, আমি তো পাহাড়ে যেতাম ফল কুড়োতে, সেখানে পাশের গাঁয়ের কয়েকজন মেয়ে আমার সই হয়েছে। নতুন সই। ওরা আমায় নেমন্তন্ন করেছে। ওদের সঙ্গে কয়েকদিন থাকব, খেলব, আনন্দ করব। এই ক'দিন পাশের বাড়ির খুড়িমা তোমাকেও দেখবে, শুয়োরের ছানাদেরও দেখবে। ভাবনা নেই। আমি যাব?'

মায়ের মুখে কি সুন্দর হাসি। মেয়ে আবার আগের মতো আব্দার করছে, মুখে খই ফুটছে, এই তো আমার সেই মেয়ে। মা তক্ষুনি রাজি হল। মেয়ে পাশের বাড়ির খুড়িমার সঙ্গে দেখা করে এল। মায়ের আর ছানাদের কোনো অযত্ন হবে না। খুড়িমা রাজি।

মেয়ে ফিরে এল মায়ের কাছে। বলল, 'মা, আমায় বোধহয় ওরা সহজে ছাড়বে না। দিন পনেরো থাকতে হবে। কেমন? তুমি যেতে দেবে?'

'সে কি কথা? তুই যাবি বেড়াতে, আর আমি মত দেব না? খুব আনন্দ কর ওখানে গিয়ে। অনেক কষ্ট তোর। বাছা, কিছু ভাবিস না। পাশের বাড়ির বৌ খুব ভালো।'

কেশবতী কন্যা মায়ের হাত দুটো চেপে ধরল, কপালে চুমো দিল। মেয়ের চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। মুখ ফিরিয়ে নিল মেয়ে। শুয়োরের ছানাদের কাছে গেল। তাদের কোলে তুলে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল। ছানাদের দেহ ভিজে গেল। দোরের কাছে এসে মেয়ে বলল, 'মা, আমি যাচ্ছি।' আর কিছু বলতে পারল না। ছুটে চলল পাহাড়ী জলপ্রপাতের দিকে। পেছনে দুলছে মেয়ের সাদা আলুলায়িত চুলের রাশি।

পথের মধ্যে রয়েছে এক বিশাল বটগাছ। চারিদিকে ঝুরি নেমেছে। বটগাছের ঘন ছায়ার তলা দিয়ে যাবার সময় মেয়ে গাছের গুঁড়ি ছুঁয়ে বলল,

'বটগাছ, আজ থেকে আমি আর তোমার কাছে আসব না। আসতে পারব না। তোমার ঘন ছায়ায় আর কোনোদিন জিরোতে আসব না। দেহ শান্ত করতে আর আসব না। শেষ বিদায়।'

হঠাৎ মোটা বটগাছের ওপাশ থেকে একজন বুড়ো মেয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। তার মাথাভর্তি চুল সবুজ, বুকের ওপরে দোলানো দাড়ি সবুজ, তার দেহের পোশাক সবুজ। যেন একজন সবুজ মানুষ মেয়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

মিষ্টি হাসি হেসে সবুজ বুড়ো বলল, 'কেশবতী কন্যা, তুমি কোথায় চলেছ?'

দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল. মেয়ে কোনো কথা না বলে আস্তে করে মাথা নোয়ালো।

সবুজ বুড়ো হাসল। মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার সব কথা আমি জানি। মেয়ে, তোমার যে কি বিপদ তাও আমি জানি। আমার কাছে কোনো কথাই লুকনো থাকে না। তোমার এমন মন, সবার জন্য তুমি চিন্তা কর। বড় ভালো মেয়ে তুমি। তোমায় আমি বাঁচাব। বাঁচাবই। নইলে বেঁচে থেকে লাভ কি? আমি পাথর কুঁদে একটি মেয়ের মূর্তি গড়েছি, তোমার মতো দেখতে। যেন তোমারই মূর্তি। পাথরের বুকে সে চোখ মেলে রয়েছে। গাছের এপাশে এসে দেখ।'

গাছের ওপাশে গেল মেয়ে। পাথরের মূর্তি দেখে চমকে উঠল। সবুজ বুড়ো কি আগে তাকে দেখেছে? সে তো কখনও তাকে আগে দেখেনি? নিখুঁত মূর্তি, তারই মূর্তি। কত বড় শিল্পী এই সবুজ বুড়ো! শুধু মূর্তির মাথায় তার মতো চুল নেই। আর সব একরকম। মেয়ে তাকিয়ে রয়েছে, পলক পড়ছে না চোখে।

বুড়ো মিষ্টি গলায় বলল, 'পাহাড়ের দেবতা তোমাকে ঐ জলধারার নিচে শুয়ে পড়তে আদেশ দিয়েছে। তাকে অমান্য করতে পারবে না। কিন্তু ঐ আছড়ে-পড়া জলের নিচে শুয়ে পড়লে তোমার কি হবে তা তুমি জান? হ্যাঁ, তুমি ঠিকই জান। পাথর ছাড়া ও আঘাত কেউ সইতে পারে না। পাথরও কেঁপে ওঠে, ক্ষয়ে যায়। আর তুমি তো একরত্তি মেয়ে। আমি পাথরের মূর্তিটাকে বয়ে নিয়ে যাব জলধারার নিচে। তোমার হয়ে পাথর-মেয়ে সেখানে শুয়ে থাকবে। আঘাত লাগবে তার দেহে. তোমার দেহে আঘাত লাগতে দেব না। কিন্তু পাথর-মেয়ের তোমার মতো চুল নেই। একটু কষ্ট

করতে হবে। ব্যথা পাবে, কিন্তু উপায় নেই। তোমার চুলগুলো ছিঁড়ে আমি পাথর-মেয়ের মাথায় লাগিয়ে দেব। সে হবে কেশবতী কন্যা, ঠিক তোমার মতো। পাহাড়-দেবতা দেখতে পেলেও আর কোনো সন্দেহ করবে না। ভাববে, তুমিই শুয়ে রয়েছ। নইলে ।'

বুড়ো চুপ করে গেল। মেয়ে নিঃশব্দে মাথা এগিয়ে দিল বুড়োর কাছে। বুড়ো পাথরে বসে মেয়ের মাথা কোলে নিয়ে কেশরাশি ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। উঃ, কি অসহ্য যন্ত্রণা। চোখ ভরে এল জলে। একটুও শব্দ করল না মেয়ে। আশ্চর্য সহ্যের ক্ষমতা।

মেয়ের চুলগুলো পাথরের মূর্তির মাথায় স্পর্শ করা মাত্র সেগুলো পাথর-মেয়ের মাথায় বসে গেল। পাথর-মেয়ের সত্যিকারের চুল। এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে। সাদা চুলের গোছায় মূর্তির রূপ আরও বেড়ে গেল। সত্যিকারের কেশবতী কন্যা যেন। আর কেশবতী কন্যা দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্তির সামনে,—তার মাথায় কোনো চুল নেই। মেয়ের কান্না পেল।

বুড়োর মুখে হাসি নেই। আকাশের কালো মেঘ সবুজ বুড়োর মুখে। কাঁপা গলায় বলল, 'মেয়ে, এবার তুমি ঘরে যাও। আর কোনো ভয় নেই। গাঁয়ে এখন অনেক জল, ফসলের জমি নরম হয়েছে, চাষ কর, পরিশ্রম কর। সবাই মিলে ফসল ফলাও। তুমি, তোমরা সুখে জীবন কাটাও। ফলে ফুলে শস্যে তোমাদের জীবন ভরে উঠুক।'

সবুজ বুড়ো চোখ নামিয়ে নিল। মেয়েব দিকে আব চেয়ে দেখল না। ভারি পাথরের মূর্তিটা অনেক কষ্টে কাঁধে তুলে নিল। পাহাড়ী পথে এগিয়ে চলল। পাথর পেরিয়ে যাচ্ছে, বুড়ো কাঁপছে, মূর্তি হেলে পড়ছে। বুড়ো এগিয়ে চলল। পৌঁছল আছড়ে-পড়া জলধারার নিচে। শুইয়ে দিল পাথর-মেয়েকে। আছড়ে পড়ল জল, সাদা ফেনায় ভরা জলরাশি। মেয়ের মাথার সাদা চুল ওলোট-পালোট খাচ্ছে; এধার-ওধার করছে, ভেসে উঠছে, লেপটে যাচ্ছে মেয়ের দেহে। জল পাথরের দেহ ছুঁয়ে বয়ে চলেছে আরও নিচে, ফসলের জমির দিকে।

মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বটগাছের নিচে। সে বাড়ির পথে যায় নি। সব দেখছে। বুক ভেসে যাচ্ছে। না, তার কেশরাশি গিয়েছে বলে নয়। তাকে বাঁচাবার জন্য সবুজ বুড়ো যে কষ্ট করছে, তাই দেখে মেয়ে কাঁদছে। আহা, কত ছেলেবেলায় বাবাকে হারিয়েছে সে!

কেশবতী কন্যাব মাথা চুলকোচ্ছে। বিড়বিড় করছে। মাথায় হাত দিল সে। খোঁচা খোঁচা চুল। জমি থেকে ধান কেটে নিলে যেমন থাকে। এ কি! চুল বেডে যাচ্ছে। মাথায় আর খোঁচা খোঁচা লাগছে না। নরম হয়ে আসছে চুলের রাশি। ছেলেদের মাথার মতো চুল। আরও বড়ো হচ্ছে, আরও বড। কাঁধ ছাডাল, বুক ছাডাল, কোমর পেরিয়ে গেল, চুলের রাশি মাটি ছুঁয়ে গেল। থেমে গেল বড় হওয়া। কেশবতী কন্যা দাঁডিয়ে আছে। পাহাডী হাওয়ায় কেশরাশি উড়ছে। হাতের মুঠোয় চুলের রাশি সামনে তুলে ধরল। চোখেব সামনে। দাঁডকাকের গলার পালকের মতো কালো কেশ। লাফিয়ে উঠল আনন্দে। নাচের ছন্দে ঘুরে গেল মেয়ে। দুহাত দুপাশে ছডিয়ে আনন্দে নাচছে কেশবতী কন্যা। সহজ আনন্দে বনের প্রাণী মুক্ত হাওয়ায় নাচছে।

থেমে গেল মেযে। তাকিয়ে রইল পাহাডী পথে। অনেকক্ষণ। পথের দিকে চেয়ে রয়েছে সে। কিন্তু সবুজ বুডো কই ফিরছে না তো? অনেক সময় বয়ে গেল।

হঠাৎ বটগাছের ডালপালা কেঁপে উঠল, পাতাগুলো কেঁপে উঠল। সেই কাঁপা কাঁপা পাতার মাঝখান থেকে ভেসে এল কার কণ্ঠস্বর? সে বলছে, 'ওগো, কেশবতী কন্যা, তুমি বাডি ফিরে যাও। পাহাডের দেবতাকে আমরা সত্যি সত্যি বোকা বানিয়েছি। ভয় নেই, বাডি ফিরে যাও। সুখে থাকো, ভালো থেকো।'

উঁচু পাহাড় থেকে জলধারা আছডে পডছে নিচে, পাথরের ওপরে। মেয়ে সেদিকে চেয়ে রইল। নিচে পাহাডের কোল জুড়ে সবুজ ফসলের ক্ষেত, মাঠের পারে হাসিহাসি মুখে দাঁডিয়ে রয়েছে গাঁয়ের কিষাণেরা, তাদের পাশে উচ্ছল ছেলেমেয়ে আর ডাগর চোখমেলা বধূরা। সবুজ পাতায় ভরা বিরাট বটগাছ, নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়ে। বনের হরিণের মতো চমকে উঠে পাহাড়ী হাওয়ায় চুল ভাসিয়ে গানের ছন্দে মেয়ে নেমে আসছে পাহাড়ী পথে। মেয়ে হাওয়ায় ভেসে আসছে, মেয়ে চলেছে গাঁয়ের পথে। সবুজ ফসলের ওপর দিয়ে জলের ধারার মতো আসছে কেশবতী কন্যা।

মানুষ ওষুধ পেল কেমন করে

সেই আদ্দিকালে মানুষ আর পশু একসঙ্গে বাস করত। যে কালের কথা বলছি সেটা ছিল সৃষ্টির আদ্দিকাল। মানুষ আর পশু ভাই-ভাই হয়ে পাশাপাশি থাকত। ঝগড়া নেই, ঝাঁটি নেই, হিংসে নেই। বড়ই ভাব। কিন্তু ছাড়াছাড়ি হল কেমন করে? পশু কেন মানুষের শত্রু হল? মানুষ কেন পশুর শত্রু হল? সেই কথাই বলছি।

বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায়, গাছের কোটরে মানুষও থাকত, পশুও থাকত। গলাগলি ভাব। কিন্তু বনের এই জীবন মানুষের আর ভালো লাগল না। বড়ই কষ্ট। তাই ভেবেচিন্তে মাথা খাটিয়ে সে কুঁড়ে ঘর তৈরি করতে শিখল। ছাউনি যখন হল, তখন আর গুহায় কিংবা কোটরে থেকে লাভ কি? শুধুই কষ্ট পাওয়া। ফাঁকা মাঠের মধ্যে গাছের ডালপালা আর পাতা দিয়ে সে ঘর তৈরি করল। বন ছেড়ে আলোয় এল। রোদ্দুরে কষ্ট নেই, বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না, শীতেও অনেক আরাম। কি বুদ্ধি মানুষের!

কিন্তু পশুরা রয়ে গেল বনে, পাহাড়ী গুহায়, গাছের কোটরে। ওরা ঘরবাড়ি তৈরি করতে জানত না। বেচারা পশুরা! কি আর করে? বনেই রয়ে গেল। ভাইয়ে ভাইয়ে ছাড়াছাড়ি হল। কিন্তু তখনও হিংসে তেমন ছিল না, কেউ কারও তেমন শত্রু হয়নি।

একবার আমাদের এই এলাকায় ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ল। সে কি কাঁপুনি! ঘরের মধ্যে থাকলেও কাঁপতে হচ্ছে। তখন তো কোনো মানুষ পোশাক পরত না। তাই শীতও লাগে বেশি। এমনি এক ভোরে এক কাণ্ড ঘটে গেল।

এক বুড়ি ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। আকাশে মেঘ, রোদের তেজ নেই। ঘর থেকে বাইরে এসে দেহ গরম করার উপায় নেই। তার ওপরে বাইরে হাওয়া বইছে। বুড়ো সারা রাত ভয়ে ভয়ে থেকেছে,—এই বুঝি বুড়ি মরে যাবে। রাত পোহাল, কিন্তু বুড়ির কাঁপুনি কমছে না। বুড়ো কি যেন ভাবল। চোখ কুঁচকে বাইরে তাকাল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতে তুলে নিল একটা এবড়ো খেবড়ো পাথর আর বুনো লতার একটা গুলঞ্চি। হাঁটা দিল বনের পথে।

অল্পক্ষণ পরেই বুড়ো ফিরে এল। তার হাতে পশুর একটা চামড়া, তখনও গরম রয়েছে, চামড়ার একপাশে লাল টকটকে রঙ। গোটা পশুর গোটা চামড়া। ব্যাস, আর দেখে কে! মানুষে-পশুতে সরাসরি লড়াই শুরু হয়ে গেল। চরম শত্রুতা। একে অন্যকে পেলেই ছিঁড়েখুঁড়ে মেরে ফেলত। আর সেই ভাই ভাই ভাব কোথায় মিলিয়ে গেল। এখন আমরা যেমন দেখতে পাই। শুরু হয়েছিল বুড়োর চামড়া আনার দিন থেকে।

কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। তাই পশুরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা সভা ডাকল। সব পশু এল। সলা-পরামর্শ করা দরকার। মানুষের হাত থেকে তারা বাঁচবে কেমন করে? মানুষ শয়তান, জঘন্য। দুষ্টু বুদ্ধিতে তাদের হারিয়ে দিচ্ছে। ওদের শায়েস্তা করার পথ বাত্‌লাতে হবে। সবাই বলুক, মন খুলে বুদ্ধি দিক। এই মানুষ কি সাংঘাতিক! বড় বড় দাঁত নেই, ধারাল নখ নেই, থাবাও নেই,—আর গায়ের জোরও কিছুই নেই। তবু সবচেয়ে বড় আর শক্তিমান পশুকেও মেরে ফেলছে। তার ছাল ছাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, দেহ গরম করছে। নিজের কিছুই নেই। অথচ তীর-ধনুক-বর্শা, গাছের মোটা ডাল, বুনো লতার গুল্‌তি, এবড়ো খেবড়ো পাথর,—যা পায় তাই কাজে লাগায়। দূর থেকে আমাদের কাবু করে দেয়। আসুক না সামনাসামনি। কিন্তু ওসব কথা বলবে কে? কাপুরুষ কোথাকার! ভীতু কোথাকার! তবু জিতে যাচ্ছে, আমাদের মেরে ফেলছে। নিজের দেহে লোম নেই, আমাদের লোমশ ছালে দেহ গরম করছে। ছিঃ, লজ্জা করে না? লজ্জা নেই। আমরা শুধু মরছি। ওদের মতো তীর-ধনুক-গুল্‌তি যে আমরা বানাতে পারি না। নিজের দেহের বাইরের কিছুই কাজে লাগাতে পারি না। হায়! আমাদের বাঁচার উপায় কি?

কিন্তু পশুদের একটা জিনিস ছিল। সে জিনিস মানুষের ছিল না। পশুরা যাদু জানত। অনেক যাদু। আর যাদু দিয়ে রোগ বানাতে জানত। যাদু দিয়ে তারা অনেক রকমের রোগ আবিষ্কার করেছিল।

সেই আদিকালে কোনো রোগ-বালাই ছিল না। কোনো মানুষ কখনও অসুস্থ হয়ে পড়ত না। অসুখের নামগন্ধ ছিল না। অন্য অনেক কষ্ট ছিল, কিন্তু অসুখের কষ্ট ছিল না। বড়ই সুখের দিন ছিল।

কিন্তু প্রতিশোধ নেবার জন্য পশুরা নানা ধরনের রোগকে পাঠাতে লাগল মানুষের গাঁয়ের দিকে। এক একটা নতুন নতুন রোগ আবিষ্কার করে আর

পাঠিয়ে দেয় মানুষদের কাছে। হায়! হায়! গাঁয়ে দেখা দিল হামজ্বর, সকাল সন্ধ্যে কাঁপুনি-জ্বর, সর্দি-কাশি, হাঁটুর ব্যথা, পিঠের ব্যথা, বমি। আরও কত কি। সবচেয়ে সাংঘাতিক রোগ হল বাতের ব্যথা। কাজ না করলে খাবার আসবে কেমন করে? অথচ বাতের ব্যথায় কিছুই করা যায় না। মানুষজন ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। গাল-গলা ফুলে যাওয়া রোগ কে পাঠিয়েছিল আমি বলতে পারব না। কিন্তু শোনা যায় বাতের ব্যথার রোগ পাঠিয়েছিল হরিণ। কেননা, সেই সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী ছিল।

রোগ আসছে, রোগ আসছে,—রোগ বাড়ছে। ভীষণ প্রতিশোধ। লোক মরছে, লোক মরছে, লোক খোঁড়া হচ্ছে, অকেজো হচ্ছে। ভীষণ প্রতিশোধ। শেষকালে এমন হল, মানুষ বুঝি শেষ হয়ে যাবে। আর কেউ বেঁচে রইবে না।

মানুষ জানতেও পারেনি এমন সব রোগ এল কেমন করে। আগে তো ছিল না। অনেক ভাবল সে, কোনো কুল-কিনারা করতে পারল না। কোনো উপায় বের করতে পারল না। মরতে লাগল।

পশুদের মহা ফুর্তি। অনেক নিশ্চিন্ত তারা। আর কিছুদিন বাদেই একেবারে নিশ্চিন্ত হবে। ছাল ছাড়ানো বের করছি। সন্ধ্যেবেলা গুহার মুখে বসে প্রায়ই তারা এসব আলোচনা করে।

সেই গুহার ওপরে ছিল আইভি লতার গাছ। একটা লতা বাড়তে বাড়তে গুহার মুখে ঝুলে পড়েছিল। পশুরাও খেয়াল করে না, গায়ে লাগলেও সেদিকে তাকায় না। বনের পশু,—ওরকম কত লতাপাতা রোজ গায়ে লাগে।

সেই সবুজ লকলকে আইভি লতা একদিন পশুদের কথা শুনে ফেলল। সে আঁৎকে উঠল। তাহলে? তাহলে পশুরাই রোগ পাঠিয়ে মানুষের এমন সর্বনাশ করছে? সে ভয়ও পেল। মন তার কেঁদে উঠল। সে শক্ত তালগাছকে বলে দিল। তাল গাছ কেঁপে উঠল। চুপিচুপি নিচু গলায় হাওয়াকে বলে দিল। হাওয়া দুলে উঠল। সে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে মাঠের ঘাসকে বলে দিল। ঘাস পাশের নলখাগড়াকে বলে দিল। এই সাংঘাতিক খবর বনের আগুনের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। চুপিচুপি, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি। যেমন বনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বনের লতা-গাছ-ঘাস তখন এক সভা ডাকল। সবাই বেশ চিন্তিত। বনের মধ্যে ফাঁকা মাঠে বিরাট সভা বসল।

তালগাছ বলল, 'আমার মনে হয় মানুষকে এভাবে মরতে দেওয়া ঠিক হবে না। মানুষ মরছে পোকার মতো। এটা ঠিক নয়। কেননা, কেন যেন আমার মনে হচ্ছে মানুষ একদিন দারুণ কিছু করবে। অসাধারণ সব জিনিস-পত্তর বানাবে। ঠিক কি করবে আমি বলতে পারব না, কিন্তু বিরাট কিছু করবে। বেচারারা এখনও খুবই গরিব। সবাই পোশাক-আশাকও পরে না ঠিকই। কিন্তু একদিন তারা বাঘ আর দেবদারু গাছের মতোই বিরাট হবে, শক্তিমান হবে।'

খেজুর গাছ বলল, 'মানুষের ছেলেমেয়েরা ফুলের কুঁড়ির মতো সুন্দর। আমার মুকুলের মতো সজীব। পশুর হাত থেকে ওদের বাঁচাতেই হবে।'

আইভি লতা বলল, 'আহা, ফুলের মতো উজ্জ্বল ওরা, ফুলের মতো হাসিখুশি ওরা। ওরা মরছে,—খুব কষ্ট হচ্ছে আমার।'

সব গাছ পাতার শব্দ করে সায় দিল। ঠিক কথা, ঠিক কথা। মানুষকে বাঁচাতে হবে।' কিন্তু কয়েকটি লতা গাছ আর বিষাক্ত ছোট ঝাঁকড়া গাছ মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল। না, তাদের সায় নেই। মানুষ যখন-তখন আমাদের কেটে শেষ করে দিচ্ছে। বিছুটি ভীষণ রেগে গেল। তাকেই বেশি মার খেতে হয়। সে রোঁয়া ফুলিয়ে বলল, 'ওসব মানি না। সুযোগ পেলেই আমি ওদের গায়ে বিষ ঢালব। লাল চাকাচাকা দাগ করে দেব। ফোস্কার মতো জ্বালা ধরিয়ে দেব। মানি না ওসব ভালো কথা।'

দু-একজনের কথায় কেউ কান দিল না। শুধু রসাল আগাছা বলল, 'আমি তক্ষুনি রস লাগিয়ে চাকাচাকা দাগ সারিয়ে তুলব।' ওদের কথায় আর কোনো কথা-কাটাকাটি হল না।

গাছ-গাছালি লতা-পাতা ঘাস-শ্যাওলা সবাই নিজের দেহের অংশ থেকে রোগের ওষুধ তৈরি করল। পাতা-ডাল-বাকল-শেকড় সব থেকেই ওষুধ তৈরি হল। শিখিয়ে দিল মানুষকে। পশুরা যে যে রোগ আবিষ্কার করছে, গাছ-পালা তারই ওষুধ তৈরি করে ফেলছে। মানুষ সেরে উঠছে। মানুষ বেঁচে যাচ্ছে।

ছেলেমেয়েরা, তোমরা যদি চোখ মেলে চেয়ে দেখ, দেখতে পাবে সব গাছ-গাছালি থেকেই ওষুধ তৈরি হয়। আমরা অনেক গাছের গুণ ভুলে গেছি। কিন্তু বাপ-ঠাকুরদারা জানত। বিষাক্ত গাছ থেকেও ওষুধ তৈরি হয়। সব গাছেই ওষুধ তৈরি হয়। তাই সব গাছ আমাদের দেবতা। ওদের গায়ে আঘাত দিতে নেই। ওদের জন্যই আমাদের রোগ সারে।

শেয়াল ও সিংহ

অনেক কাল আগে একবার গরম কালে পাহাড়ী এলাকার সব ঝরনা শুকিয়ে গেল। কাঠফাটা রোদ, গরম হাওয়া। তার ওপরে তেষ্টা মেটাবার জল নেই। সে এক ভীষণ কষ্টের দিন। পশুরা জিব বের করে হাঁপাচ্ছে, তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। এবার বোধহয় তেষ্টার জ্বালায় সবাই মারা পড়বে।

দুঃখের দিনে সবাই শত্রুতা ভুলে যায়। পশুদেরও তাই হল। তারা হিংসা ভুলে গেল। সবাই পাহাড়ের ছায়ায় বসে পরামর্শ করল। কি করা যায়! বাঁচতে তো হবে। একটা উপায় দেখতে হয়। সবাই মিলে জলের খোঁজে চলল। হাল ছাড়লে চলবে কেন?

খুঁজতে খুঁজতে শেষকালে একটা ঝরনা পাওয়া গেল। শ্যাওলা আর ছোট ছোট পাথরে তার মুখ ছোট্ট হয়ে এসেছে। সেই ছোট্ট মুখ থেকে ঝির্‌ঝির্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। তবু সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বাঁচার আশা জাগল।

পশুর রাজা সিংহ বলল, 'সবাই লেগে পড। গর্তের মুখ বড করতে হবে। পাহাড়ের পাথর যত শক্তই হোক ঝরনার মুখ অনেক বড় করতে হবে। দেহের ব্যথা-বেদনা ভুলে সবাই কাজে লেগে পড়।' একথা বলেই সিংহ নিজেই থাবা বসাল। কয়েকটা নুড়ি খসে পড়ল। সিংহের থাবার নখে ব্যথা করছে, তবু সে থামল না।

সবাই কাজে লেগে গেল। ঝুর্‌ঝুর্‌ করে মাটি পড়ছে, নুড়ি পড়ছে, পাথর পড়ছে। ঝরনার জল বাড়ছে। কাজ থেমে নেই।

সেই দলে ছিল এক শেয়াল। সে কুড়ের বাদশা। কোনো কাজ করতে চায় না। ঝরনা খোঁড়ার কোনো কাজই সে করল না। ছায়ায় শুয়ে রইল। ভাবল, জল তো বেরোক, তারপরে দেখি কে আমার জল খাওয়া ঠেকায়।

সূর্য পাহাড়ের কোলে ঢলে পড়ল। আঁধার হয়ে এল। সবাই গুহায় ফিরে গেল। ঠিক হল, পরদিন খুব ভোরে সবাই এখানে চলে আসবে।

পরের দিন খুব ভোরে সবাই চলে এল। সিংহ এল সবার আগে। আর শেয়াল এল সবার পরে। রোদ উঠবার অনেক পরে। সবাই এসেই কাজে লেগে গেল। শেয়াল তেমনি শুয়েই রইল।

এর মধ্যে হয়েছে কি, একটা কাঠবেড়াল সিংহকে বলে দিয়েছে,—শেয়াল শুধু শুয়েই আছে। এতক্ষণে সিংহের নজর পড়ল। ভীষণ গর্জন করে সিংহ তেড়ে আসছে। বিপদ বুঝেই পেছনের দুই পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে শেয়াল কোথায় যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ পশুরা চিৎকার করে নাচতে লাগল। 'পশুরাজ, তর্‌তর্‌ করে জল পড়ছে। মিষ্টি জল। সাদা ফেনায় উপ্‌চে-পড়া জল।' পশুরাজও নাচতে লাগল। তারা জলের মধ্যে হুটোপাটি খাচ্ছে। অনেক দিন পরে দেহ ঠাণ্ডা হল।

হঠাৎ সিংহ গম্ভীর হয়ে বলল, 'শোনো, সবাই অনেক কষ্ট করেছে, তাই ঝরনা এমন জল দিচ্ছে। কিন্তু একজন কিছুই করে নি। তাকে সবাই চিনেছ। তাকে এই ঝরনার এক ফোঁটা জলও খেতে দেব না। তোমরাও দেবে না।'

'কিন্তু পশুরাজ, ওটা ভীষণ শয়তান। অনেক কায়দা জানে। খুব বুদ্ধি। আমরা কি পারব ওকে ঠেকাতে?'

'বেশ, তাহলে আমিই ঝরনা পাহারা দেব। আজ থেকে আমি ঝরনার পাশে ঐ গুহাতেই থাকব। দেখি, কেমন করে ও জল খেতে পায়। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে ও মরবে।' ভেজা গায়ে সিংহ জোরে জোরে কথাগুলো বলল। পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে তার কথা অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ল।

সবাই গুহায় ফিরে যাচ্ছে। পেছন থেকে তারা সিংহের কথা শুনতে পেল,—'অনেক দিন শেয়ালের মাংস খাই না। যদি ও জল খেতে আসে, তবে এবার বোধহয় শেয়ালের মাংস খেতে হবে। ছাড়াছাড়ি নেই।'

পশুরা একথা শুনে খুব খুশি হল। খুব আনন্দ হল তাদের। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বড্ড বেড়েছে শেয়াল। কুঁড়ের বাদশা কোথাকার। এবার মজাটা বুঝবে। সিংহের প্রতিজ্ঞা!

বেশ কয়েক দিন কেটে গেল। শেয়াল ঝরনার পথ মাড়ায় নি। আশে পাশে কোথাও তাকে দেখা যায় নি। সবাই ভাবল, শেয়াল ভয়ে এই এলাকা ছেড়ে দূরে কোথাও পালিয়েছে। কেউ কেউ ভাবল, তেষ্টায় বুঝি শেয়াল মরেই গিয়েছে।

কিন্তু এসব কিছুই হয়নি। একদিন দেখা গেল শেয়াল ঝরনার একটু দূরে বসে রয়েছে। সিংহ গুহার মুখে বসে সব দেখছে। ভাবছে, শেয়াল ঝরনার জলে মুখ দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু না, শেয়াল ঝরনার দিকে চেয়েও

দেখছে না। জল খাওয়ার কোনো ইচ্ছেই তার নেই।

সিংহ দেখল, শেয়াল কালো মতো কি একটা জিনিস থেকে কি যেন খাচ্ছে আর আপন মনে হাসছে। অবাক কাণ্ড! কি খাচ্ছে শেয়াল? সিংহ আস্তে আস্তে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। শেয়ালের পাশে বসল। শেয়াল ফিরেও দেখল না। আপন মনে খেয়ে চলেছে।

হঠাৎ সিংহের দিকে চেয়ে শেয়াল বলল, 'পশুরাজ, ওসব বাজে জলটল খাওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আমি এখন থেকে মধু খেয়ে থাকব। এই মধু খাচ্ছি। অপূর্ব, আঃ, কি স্বাদ! কোথায় লাগে ঝরনার ঐ বিচ্ছিরি জল? থাক্‌গে ওসব কথা।'

সিংহের জিবে জল এল। কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পারল না। শেয়াল আরামে আধবোজা চোখে খাচ্ছে আর হাসছে। সিংহ আর পারল না। শেষকালে বলেই ফেলল, 'তা শেয়াল, একটু মধু দেবে নাকি?'

মৌচাক থেকে এক ফোঁটা মধু নিয়ে শেয়াল সিংহকে দিল। আঃ, কি সুন্দর খেতে। কোনো দিন খাইনি এমন মধু। কি মিষ্টি! সিংহ বলেই ফেলল, 'বন্ধু, এত অল্প দিলে। দাও না একটু বেশি করে।'

শেয়াল লেজ নেড়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'হ্যাঁ. এটা ঠিক, অনেকটা না খেলে পুরো স্বাদ পাওয়া যায় না। এ মধুর যে কি স্বাদ তা জানতে হলে মুখ ভর্তি করে খেতে হবে। ঠিক কথাই বলেছেন।'

'তাহলে, শেয়াল তুমি কি......।' জিব দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল সিংহের।

'হ্যাঁ পশুরাজ, আমি মোটেই কৃপণ নই। দেব বৈকি! আপনি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি মৌচাক থেকে মধু আপনার মুখে ঢেলে দি।'

সিংহ চারটে থাবা তুলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। হাঁ করা মুখ, দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে। আনন্দে থাবা চারটে কাঁপছে, নখগুলো এধার-ওধার নড়ছে।

কাছে গিয়েই শেয়ালের মুখ শুকিয়ে গেল। কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'পশুরাজ, আমার ভয় করছে, বুকে উঠে মধু ঢালতে গিয়ে যদি নখের খোঁচা লাগে? তাহলেই হয়েছে! তার চেয়ে এক কাজ করি। আপনার থাবাগুলো ভালোভাবে বেঁধে দি। তাহলে আর ভয় থাকবে না, কেমন?'

'যা করবে তাড়াতাড়ি কর। বেশিক্ষণ দেরি করতে পারছি না।'

শেয়াল দৌড়ে গেল পাহাড়ের কোলে। বুনো লতা ছিঁড়ে আনল। বেশ শক্ত করে সিংহের থাবা চারটে বেঁধে ফেলল। সিংহ আর থাবা নাড়াতে পারছে না।

ফিক্ করে হেসে শেয়াল ঝরনার দিকে হাঁটা দিল। প্রাণ ভরে মিষ্টি ঠাণ্ডা জল খেল। উঠে এল ঝরনা থেকে। সিংহের পাশ দিয়ে শেয়াল বাড়ির পথে হাঁটা দিল। ফিরেও দেখল না সিংহকে।

হঠাৎ সিংহ চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'ও শেয়াল, যাচ্ছ কোথায়? আমায় ফেলে যেও না। দোহাই তোমার। এমন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলে সব পশুপাখি আমায় ঠাট্টা করবে। পশুরাজের এমন অবস্থা দেখে তারা হাসবে। দোহাই তোমার! পশুদের ওপরে আমার প্রভুত্বই চলে যাবে, আমি রাজা হয়ে মুখ দেখাব কেমন করে? আমার বাঁধন খুলে দাও। তুমি যত খুশি যখন খুশি ঝরনার জল খেও। কেউ নিষেধ করবে না। আমি কথা দিচ্ছি। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যেও না।'

আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে শেয়াল ভাবল,—আমি যদি সিংহের বাঁধন খুলে না দি, তবে কেউ না কেউ খুলে দেবেই। এখুনি পশুরা হয়তো চলে আসবে। আর তখন পশুরাজ কি আমায় ছেড়ে দেবে? প্রতিশোধ সে নেবেই, গোটা জঙ্গল পাহাড় খুঁজে ফিরবে। আর তখন আমাকে ···· ···। উঃ, কি সাংঘাতিক ব্যাপার! তার চেয়ে ওকে বিশ্বাস করাই ভালো। এতে বাঁচলেও বাঁচতে পারি। কিন্তু বাঁধন খুলে না দিলে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

এইসব সাতপাঁচ ভেবে শেয়াল ফিরে এল। সিংহের থাবা থেকে লতাগুলো খুলে ফেলল। বাঁধন খুলে ফেলল। বাঁধন খুলে ফেলেই মৌচাক এগিয়ে দিল সিংহের সামনে। না, সিংহ শেয়ালকে কিছু বলল না। মধু খেল। তারপরে সব পশুকে বলে দিল, এখন থেকে শেয়াল সবার মতো নিশ্চিন্তে ঝরনার জল খাবে। কেউ যেন কিছু না বলে। পশুরা মেনে নিল আদেশ। সেদিন থেকে শেয়াল হল সিংহের বন্ধু।

শেয়াল আর সিংহ তো বন্ধু হল। সিংহ বাধ্য হয়ে শেয়ালকে বন্ধু করল। নইলে, শেয়াল যদি তার বোকামির কথা অন্য পশুদের বলে দেয়! কি লজ্জা!

এদিকে শেয়াল বুঝল, সিংহের সঙ্গে এই বন্ধুত্ব বেশিদিন টিকবে না। হাজার হলেও পশুরাজ তো! কখন কিরকম মেজাজ থাকবে কে বলতে পারে। আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো।

এইসব চিন্তা করে শেয়াল পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় এক গুহায় থাকতে

লাগল। ছেলেমেয়ে আর বৌকে নিয়ে গেল সেই উঁচু গুহায়। এখন, ঐ গুহায় উঠতে হলে পাহাড়ী গাছের লতা বেয়ে উঠতে হত। শেয়াল সেই লতা কেটে দিল। আর গুহায় রেখে দিল সেই লতা। ছেলেমেয়ে কিংবা বৌ কেউ পাহাড়ের চূড়া থেকে নামত না। শুধু নামত শেয়াল। শেয়াল-বৌ লতা ঝুলিয়ে দিত, তাই বেয়ে শেয়াল নামত। আবার লতা তুলে নিত। শেয়াল শিকার নিয়ে ফিরে এলে বৌ আবার লতা নামিয়ে দিত। খুব নিরাপদ আস্তানা।

এমনি করে দিন যায়। হাজার হলেও সিংহ হল পশুরাজ। মেজাজই অন্যরকম। দিনে দিনে সিংহ সেই আগের বোকামির ঘটনা ভুলে গেল। এবার শেয়াল পড়ল বিপদে।

দুজনে একসঙ্গে শিকার করত। কিন্তু শিকারের ভালো ভালো মাংস সিংহ নিয়ে নিত, শেয়ালের জন্য পড়ে থাকত হাড়গোড। তাছাড়া বেশি অংশই নিয়ে নিত সিংহ। সিংহের দাঁত আর থাবার দিকে তাকিয়ে শেয়াল কিছু বলত না।

শেয়াল ভাবত,—মজা তো মন্দ নয়। আমি প্রাণের মায়া ছেড়ে কত কষ্টে শিকারেব হদিস্ এনে দি, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই ওকে। আর উনি কি করেন? একটু পেছনে সরে এসে বিদ্যুতের মতো লাফ দেন, শিকার ছট্‌ফট্ করে, মরে যায়! ব্যাস্, আর কোনো কাজ নেই। অথচ শিকারের প্রায় সবটাই ও নিয়ে নেয়। আর সহ্য করা যায় না। কিন্তু করিই বা কি। যা দাঁত আর নখ! একবার আদর করলেই ......।

শেয়াল ভাবে আর ভাবে। কূল-কিনারা পায় না। এখন আবার আর এক ফ্যাসাদ। সিংহকে শিকারের খোঁজও নিতে হয় না। ঘুরে-ফিরে বেড়াতে হয় না। তাই সে দিনে দিনে ভীষণ কুঁড়ে হয়ে উঠল। শিকারের মাংস সিংহ বয়ে নিয়ে গুহায় যেত না। সেটাও পৌঁছে দিতে হত শেয়ালকে। শেয়াল বুঝল, এতদিনে সত্যিই সে সিংহের 'ক্রীতদাস' হয়ে গিয়েছে। 'ক্রীতদাস'—এই কথাটা মনে আসতেই শেয়াল ঠিক করে ফেলল এবার তাকে কি করতে হবে। অনেক হয়েছে, আর নয়।

একদিন তারা একটা বুনো বাচ্চা ঘোড়া শিকার করেছে। সিংহ ঘোড়ার রক্ত চেটে শেয়ালকে বলল, 'খুব কচি মাংস। সবটাই আমার গুহায় পৌঁছে দাও। পরে গুহায় এসো। আমাদের খাওয়ার পরে যদি

কিছু বাঁচে. নিয়ে যেও।' একথা বলেই সিংহ তুল্‌কি চালে গুহার পথে হাঁটা দিল।

আর নয়, এবার অন্য পথ ধরতে হবে। বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে। এই না ভেবে শেয়াল সমস্ত মাংস কেটে কেটে উঁচুতে তুলল। খুব ধকল গেল। কিন্তু মনে খুব আনন্দ। সিংহের কথায় আর চলছি না, ওকে মানব না। দেখি না কি হয়।

রাত ভোব হয়ে এল। শেয়াল সিংহের গুহায় ফিবল না। খিদেতে, অপমানে, বাগে সিংহ চিৎকাব করতে কবতে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। শেয়ালের পায়ে গন্ধ শুঁকে শুঁকে পাহাড়ের অনেক উঁচুতে উঠল। ওপরেই শেয়ালেব গুহা। কিন্তু মসৃণ, ওখানে ওঠা যাবে না।

সিংহ কিছুক্ষণ ভাবল। তারপব বলল, 'শেয়াল, বন্ধু, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। আমি তো তোমাব অনেক কালেব বন্ধু। তাই, লতাটা ফেলে দাও। ওপরে উঠব। ভয় নেই বন্ধু।'

শেয়ালের বৌয়েব দাঁত কপাটি লেগে গেল। ছেলেমেয়ে গুহার কোণে গিয়ে ঠক্‌ঠক্‌ কবে কাঁপছে। লেজ ঢুকে গিয়েছে পেছনের দু'পায়ের মধ্যে। সে এক কাণ্ড।

শেয়াল কিন্তু ঠোঁটেব কোণে হাসছে। গলা বাড়িয়ে বলল, 'পশুরাজ' কি সৌভাগ্য। আপনি এসেছেন আমাব গুহায়! কি আনন্দ! এখানে আজকের খাবার খেতে হবে কিন্তু। আপনি হলেন আমাদের রাজা। আমি লতা নামিয়ে দিচ্ছি। আস্তে আস্তে উঠুন। কি সৌভাগ্য আমার।'

শেয়াল লতা নামিয়ে দিচ্ছে। বৌ নিষেধ করতে গেল, কিন্তু দাঁতে দাঁতে এমন ঠক্‌টক্‌ হচ্ছে যে সে কথাই বলতে পারল না। ছেলেমেয়েরা আরও সিঁটিয়ে গেল।

সিংহ লতা বেয়ে উঠছে। ওপরে, আরও ওপরে। মাঝখানে সিংহ ঝুলছে, দেহ ভারি, তাড়াতাড়ি ওঠা যায় না। হঠাৎ......পটাং করে আওয়াজ হল। লতা গেল ছিড়ে। পাহাড়ের একেবারে নিচে ধপাস্‌ করে একটা আওয়াজ হল। একটু গোঙানি। তারপর সব চুপচাপ।

শেয়াল বৌয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লতাটা খুব পলকা। তাই না? ওটা আগেই এনে গুহায় রেখে দিয়েছিলাম।'

শেয়ালের চোখে-মুখে হাসি ঝরে পড়ছে।

আদাপা আর দখিনা বাতাস

এক যে ছিল কিশোর। তার নাম আদাপা। একদিন ভোরবেলায় সে গিয়েছে মাছ ধরতে। কি শান্ত সমুদ্র! তিরতির করে তার ছোট নৌকো ভেসে চলেছে। এমন শান্ত সমুদ্র সে অনেক কাল দেখেনি। আজ মাছ ধরা অনেক সহজ। আজ অনেক মাছ ধরা পড়বে। কিশোর আদাপা খুব খুশি।

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ঝড়ের বেগে দখিনা বাতাস বয়ে গেল। কিছু বোঝাব আগেই পাল হেলে পড়ল জলে, নৌকো কাত হয়ে উল্টে পড়ল। আর কিশোর ছিট্‌কে পড়ল নোনা জলে। একটু হাবুডুবু খেয়েই সে সাঁতার কাটতে লাগল। বেশ কষ্ট করে তীরে পৌছল। বালিতে বসে হাঁপাতে লাগল।

ভেজা দেহে ভেজা চোখে চেয়ে রইল জলের দিকে। উল্টে-যাওয়া নৌকো অল্প অল্প দুলছে। আরও দূরে সরে যাচ্ছে। আদাপার কান্না পেল। আর তখন দখিনা বাতাস তার কানের চারপাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে বইছে আর হাহা করে হাসছে। চারপাশে হাসি আর মনের মধ্যে কান্না। চাপা কান্না।

হঠাৎ আদাপা লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাগে লাল হয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'শয়তান কোথাকার! তোমায় যদি দেখতে পেতাম তবে ডানাদুটো দুমড়ে ভেঙে দিতাম। পাজি শয়তান!'

হাঃ হাঃ হাসির শব্দ হল। দখিনা বাতাস দেখা দিল। তার দেহ দাঁড়িয়ে রয়েছে আদাপার সামনে। দখিনা বাতাস এখন আর না-দেখা বাতাস নয়। বিরাট দানবী। অর্ধেক নারী, অর্ধেক পাখি। আদাপা তার কাছে ছোট্ট শিশু। কিন্তু সে ভয় পেল না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবীর ওপর। জড়িয়ে ধরল তাকে, কিছু বুঝবার আগেই তার ডানাদুটো দুমড়ে ভেঙে দিল।

হঠাৎ দানবী দখিনা বাতাস উবে গেল, হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু হাওয়ায় আর্তনাদ ভেসে আসছে। বালুতীরে কিছু গড়াগড়ির শব্দ হচ্ছে,—মনে হচ্ছে ভাঙা ডানা ঝাপটাচ্ছে

কেউ। গুমরে গুমরে কাঁদছে সে, সে কান্না হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। আদাপা দাঁড়িয়ে রয়েছে বীরের মতো। এখন মজা বুঝুক, নৌকো উল্টে দেবার মজা বুঝুক। শয়তান কোথাকার!

দিন বয়ে যায়। রাত বয়ে যায়। এদিকে হয়েছে কি, দখিনা বাতাস ফিরছে না। দেবতাদের রাজা আনু বসে রয়েছেন স্বর্ণ সিংহাসনে। প্রাসাদের মস্ত ঘরে তিনি বসে রয়েছেন। সব জানলা রয়েছে খোলা তবু দখিনা বাতাস তার প্রভুর কাছে ফিরে এল না। অনেক সময় বয়ে গেল। সাগর জলে জাহাজ চলেছে শান্তভাবে, ক্ষেতের ফসল পাকা সোনার রঙ ছড়িয়ে নুয়ে পড়েছে মাটিতে, শুকনো মাটি রোদের আগুনে ঝল্সে গেল,—তবু দখিনা বাতাস বইল না। বর্ষার কালো মেঘ উড়ে এল না,—দখিনা বাতাস বইছে না যে। দেবরাজ আনু অস্থির হয়ে উঠলেন। এ কি হল? এমন তো কখনও হয় নি?

শেষকালে দেবরাজ তার এক দূতকে পৃথিবীতে পাঠালেন। সে খুঁজছে দখিনা বাতাসকে। পাওয়া গেল তাকে। কিন্তু হায়, এ কি দশা তার! কি করুণ অবস্থা! স্বর্গের দখিনা বাতাস বালুতীরে কাঁদছে আর গড়াগড়ি দিচ্ছে। দূত তাকে তুলে নিয়ে দেবরাজের কাছে উড়ে গেল।

দেবরাজ তার ভৃত্যের এই দশা দেখে রাগে জ্বলে উঠলেন। পড়ন্ত বিকেলের রক্তরাঙা সূর্যের মতো রেগে লাল হয়ে উঠলেন। দেহ কাঁপছে, চোখ জ্বলছে।

বাজ পড়ার শব্দ হল। আনু আদেশ দিলেন, 'যে মানুষ আমার ভৃত্যের এই দশা করেছে, তাকে নিয়ে এসো। এখুনি।'

রাতের অন্ধকার। ঘুমিয়ে রয়েছে আদাপা। চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোয় আদাপার ঘুম ভেঙে গেল। আলোয় চোখ সয়ে এলে আদাপা দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক আলোকিত দেহ, তার ডানাদুটো অল্প অল্প কাঁপছে।

আলোকিত দূত বলল, 'দেবরাজ আনু তোমাকে ডেকেছেন। তোমায় যেতে হবে তার বিচারসভায়। তুমিই সেই মানুষ-যে দখিন। বাতাসের ডানাদুটো দুমড়ে ভেঙে দিয়েছ।'

বাছারা, আজকে আমি তোমাদের বলতে পারব না, কেমন করে আদাপা দেবরাজের বিচারসভায় গিয়েছিল। দূত তাকে পথ বলে দিয়েছিল

কিনা তাও আমি জানি না। আমার মনে হয়, সমুদ্রের যে পথ দিয়ে সূর্য আকাশে ওঠে, সে পথ দিয়েও আদাপা যেতে পারে। কিংবা ঐ দূর পাহাড়ের কোলে হয়তো কোনো রথ ছিল, সে রথেও সে যেতে পারে। আমি ঠিক জানি না।

আলোকিত দূত অদৃশ্য হল। আদাপা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। বাবাকে জাগিয়ে তুলে আদাপা বলল, 'বাবা, সব শেষ হয়ে গেল। আর আমাদের আনন্দের দিন ফিরে আসবে না। জাল নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরা হবে না, তোমার সঙ্গে আর নৌকোয় যেতে পারব না। ঘন বনের ছায়ায় ছায়ায় তোমার হাত ধরে আর ঘুরে বেড়াতে পারব না। সব শেষ। দেবরাজ আনু ভীষণ রেগে গিয়েছেন। আমি নাকি মস্ত অপরাধ করেছি। তিনি আমাকে তার বিচারসভায় ডেকেছেন। আমার বিচার হবে।'

বাবার বুক কেঁপে উঠল। তার যে আর কেউ নেই! আদাপাই তার সব। চোখের কোল ভিজে উঠল। তবু শক্ত মনে বাবা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাছা, দেবরাজ যখন ডেকেছেন, তখন যেতেই হবে। শোকের পোশাক পরে তুমি যাবে। বিনয়ী হয়ে কথা কইবে। উদ্ধত হবে না। আবার অকারণে মাথাও নত করবে না। মধুর কথায় তার কাছে ক্ষমা চাইবে। কেন তুমি ডানা ভেঙেছ তাও জানাবে। দেবরাজ যদি তোমায় ক্ষমা করেন, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে আমাদের এই পৃথিবীতে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। স্বর্গের কোনো খাবার খাবে না, কোনো পানীয় স্পর্শ করবে না। পৃথিবীকে যদি ভুলতে না চাও, তবে এই নিষেধের কথা মনে রেখো। পৃথিবী বড় সুন্দর।'

অল্পক্ষণ তাকিয়ে রইল বাবার মুখের দিকে, তারপরে আদাপা রওনা দিল। এক আশ্চর্য উপায়ে আদাপা স্বর্গের পথ পেয়ে গেল। পৌঁছে গেল মেঘের রাজ্যে। মেঘরাজ্যে দেবরাজের বিচারসভা। বিচারসভার দ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন দৈত্য। তাদের দেহের দুপাশে বিশাল ডানা। মাথা নামিয়ে আদাপা তাদের অভিবাদন জানাল। বড় বিনয়ী মানুষ। তারা পথ ছেড়ে দিল।

বিচারসভার ঐশ্বর্য দেখে আদাপার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কিন্তু সে ঐশ্বর্যও ম্লান হয়ে পড়েছে দেবতাদের কাছে। অমর দেবতারা বসে রয়েছেন,

তাদের পোশাক আকাশের তারায় খচিত। অপরূপ সুন্দর দেবতারা। মাঝখানে রয়েছেন দেবরাজ। সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল তিনি, চারিদিকে আভা। আদাপা হাঁটু ভেঙে বসে দেবরাজ ও দেবতাদের প্রণাম জানাল। আলোর ছটায় চোখ খুলে রাখা যায় না।

বাজ পড়ার শব্দ হল। দেবরাজ বললেন, 'মানুষ হয়ে এত সাহস কোথায় পেলে? আমার ভৃত্যের ডানা ভেঙেছ? কোথায় পেলে এই সাহস?'

আদাপা ভয় পেল না। কথা জড়িয়ে গেল না। বিনয়ী হয়ে মিষ্টি সুরে বলল, 'হে দেবরাজ, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। দখিনা বাতাস আমার নৌকো উল্‌টে দিয়েছিল। আমি মাছ ধরছিলাম। মাছ না ধরলে আমরা যে অনাহারে থাকব। হঠাৎ রেগে গেলাম, তার ডানাদুটো দুম্‌ড়ে ভেঙে দিলাম। হ্যাঁ, আমিই ভেঙেছি। কিন্তু সত্যি বলছি, দখিনা বাতাস যে আপনার ভৃত্য রাগের মাথায় আমি সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। রাগ মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়। সেই ভুলে আমি স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দার গায়ে হাত তুলেছিলাম। আমি অনুতপ্ত. আমায় ক্ষমা করুন।'

তাকিয়ে রয়েছে আদাপা। চোখের সামনে ভেসে উঠল বাবার সুন্দর মুখখানি। না, সে ভয় পায় নি। না, সে উদ্ধত হয়নি। না, মাথা নত করে নি।

দেবতারা বলে উঠলেন, 'ছোট্ট মানুষটি সত্যিই অনুতপ্ত। সে অপরাধ করেছে, অপরাধ বুঝে স্বীকার করেছে। সে অনুতপ্ত।'

দেবরাজ কথা বললেন। বাজ পড়ার শব্দ হল না। মধুর সংগীত ভেসে এল, 'ছোট্ট মানুষ, তোমায় ভালো লেগেছে। তুমি অনুতপ্ত। তুমি ক্ষমা চেয়েছ। তোমায় ক্ষমা করলাম। কিন্তু তুমি আর পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে না। স্বর্গরাজ্যে যা দেখে গেলে, পৃথিবীর মানুষকে তা জানাতে দেব না। এটাই নিয়ম। আজ থেকে তুমি স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা হবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে। চিরকালের জন্য। অমর হয়ে রইবে তুমি। পৃথিবীর মানুষের মতো মৃত্যু তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না। স্বর্গীয় সুরা পান করে অমরত্ব লাভ কর। দূত, ওকে সুরার পাত্র এগিয়ে দাও।'

মেঘের আড়াল থেকে দূত এগিয়ে আসছে। আলোকিত দূতের হাতে

সুরার পাত্র। স্বর্গীয় সুরা। বাবার মুখ ভেসে উঠল। দূত আরও এগিয়ে আসছে। আরও কাছে। সুরার পাত্রে বাবার মুখ ভেসে উঠছে। আদাপা দেবরাজের পায়ের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাতরভাবে বলে উঠল, 'ওগো দেবরাজ, তুমি রেগে যেও না, তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমার তুচ্ছ সৃষ্টিকে দয়া কর। আমি তোমার স্বর্গীয় সুরা পান করতে পারব না। কিছুতেই পারব না।'

বাজ পড়ার শব্দ হল। প্রতিধ্বনি তুলে সে শব্দ শতগুণ হয়ে আছড়ে পড়ল। আগুনের মতো রাঙা হয়ে দেবরাজ বললেন, 'আমার দেওয়া প্রসাদ তুমি ফিরিয়ে দিলে? স্বর্গীয় সুরা পান করতে অস্বীকার করলে? বুঝেছি, তুমি ভেবেছ আমি তোমায় বিষ পান করতে দিয়েছি। এ সুরা পান করলে তুমি বুঝি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। তাই না? হতচ্ছাড়া খুদে মানুষ কোথাকার! মনে শুধুই বদ বুদ্ধি। আমি তোমায় দেবতার আসনে বসাতে চেয়েছিলাম। অমরত্বের স্বাদ পেতে আহ্বান জানিয়েছিলাম। সহ্য হল না।' বাজের শব্দ থেমে গেল।

মাথা নত করে আদাপা বলে গেল, 'ওগো দেবরাজ, তা নয়। আমি ভুল বুঝিনি। তুমি সত্যের পিতা, তুমি সত্যকে জানো। আমি তা ভাবিনি। আমি করুণার দানকে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু দেবরাজ, আমি যে তার উপযুক্ত পাত্র নই। আমি সামান্য মানুষ। তোমার বিচার-সভায় আসবার আগে আমি বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদি তুমি আমায় ক্ষমা কর, তবে আমি তাড়াতাড়ি বাবার কাছে ফিরে যাব। তুমি ক্ষমা করেছ, তাই আমি ফিরতে চাই। বাবা বলেছে, পৃথিবী বড় সুন্দর। তুমি ফিরে যেতে আদেশ দাও।' আদাপা করুণ চোখে চেয়ে রইল দেবরাজের মুখের দিকে।

দেবরাজের রাগ মিলিয়ে গেল। অদ্ভুত হাসি ফুটল মুখে। 'পৃথিবী বড় সুন্দর! ফিরে যেতে চাও সেখানে? বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ? অমরত্ব চাও না? বেশ তাই হবে। ফিরে যাও পৃথিবীতে। সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, দুঃখ-কষ্ট, রোগজ্বালা, বার্ধক্যে নুয়ে পড়া, কান্না আর ভয়াবহ মৃত্যু। এই তো। মানুষের ভাগ্য। এ যদি তোমার ভালো লাগে, ফিরে যাও তোমার সুন্দর পৃথিবীতে।'

আদাপার মুখে হাসি। সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আদাপা পৃথিবীর পথে রওনা দিল।

হ্যাঁ, আদাপা পৃথিবীতে ফিরে এল। সে অমরত্ব চায় নি। সে দেবরাজের ভিক্ষা মাথা পেতে নেয় নি, তার প্রসাদ ফিরিয়ে দিয়ে বাবার আদেশ মাথা পেতে নিয়েছে। দেবরাজের চেয়েও আদাপার কাছে তার বাবা অনেক বড়। অমর হয়ে দেবলোকে শান্তিতে সে থাকতে চায় নি। সে মেনে নিয়েছে মানুষের সহজ আনন্দকে, মানুষের দুঃখ-কষ্টকে—সব মানুষ যেভাবে বাঁচবে মরবে, সে-ও সেভাবেই থাকবে। অনেক কষ্ট জীবনে, তবু পৃথিবী বড় সুন্দর। আদাপার পৃথিবী, মানুষের পৃথিবী।

কাঠবাদামের গাছ

পাহাড়ের কোলে বিরাট বন। নানা জাতের গাছ-গাছালি। সেই বনে ছিল একটা কাঠবাদামের গাছ। মস্ত উঁচু। সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডালপালায় ভরা গাছ। অনেক বয়েস হয়েছে। বুড়ো গাছ। অনেক কিছু দেখেছে সে।

শরৎকাল এসে গেল। ডালেডালে কাঠবাদাম। কাঠবাদামে ছেয়ে গিয়েছে গাছ। বাদামি রঙ ধরেছে ফলে। ফলগুলো সব পেকে উঠেছে। গাছ আরও সুন্দর হয়েছে।

পাশেই থাকত এক কাঠবেডাল। ঝড়ে ভেঙে-পড়া একটা মরা গাছের কোটরে সে থাকত। ঢোকার মুখটা ছোট্ট, কিন্তু ভেতরে বিরাট ঘর। কাঠবেডাল তরতর করে কাঠবাদামের গাছে উঠে পড়ল। ফল পড়তে লাগল নিচে। যা ধারাল দাঁত! দাঁত বসাচ্ছে আর ফল পড়ছে নিচে। সব বাদাম শেষ। গাছে আর একটাও ফল নেই। নিচে নেমে এল সে। খুব তাড়াতাড়ি এক জায়গায় জড়ো করল ফলগুলো।

কান্না-কান্না গলায় গাছ বলল, 'বন্ধু কাঠবেড়াল, সব ফল নিয়ে যেও না। একটা ফল গাছের নিচে রেখে দাও। একটি মাত্র ফল। বুড়ো হয়েছি। বনে তো এ গাছ আর নেই। আমি মরে গেলে কেউ রইবে না। বাচ্চা একটা চারা গজিয়ে উঠুক। আমার সন্তান। দোহাই তোমার, সব নিয়ে যেও না। একটা ফল রেখে দাও।'

'ওসব হবে না। কারও কথা ভাববার সময় নেই। এই তো শীত আসছে। বরফ পড়বে, বরফের ঝড় বইবে। তখন খাব কি? বাইরে যাব কেমন করে? ওসব শুনছি না। না খেতে পেয়ে মরলে তুমি দেখবে? কেউ দেখে না।' কাঠবেড়াল লেজ তুলে মুখ ঝামটা দিল।

একটা কাঠবাদামের খোলা ভাঙে আর মুখে করে গাছের কোটরে রেখে আসে। কাঠবেড়াল ভীষণ ব্যস্ত। খোলাগুলো জমে উঠছে। অনেক খোলা, খোলা বেড়েই চলেছে। কোনোদিকে তাকাচ্ছে না সে, শুধু এক কাজ।

ঝাপ্‌সা চোখে গাছ,
ঘন পাতার গাছ,
দেখছে নিচে ফল,
ফেলছে চোখের জল।

হঠাৎ ঘন ঝোপের আড়াল থেকে তীরের বেগে ছুটে এল একটা খেঁকশেয়াল। কাঠবেড়াল তার দাঁতে আটকে গেল। খেঁকশেয়াল মেরো ফেলল কাঠবেড়ালকে যে কাঠবেড়াল কাঠবাদাম খাচ্ছিল।

ঝাপ্‌সা চোখে গাছ,
ঘন পাতার গাছ,
দেখছে নিচে ফল,
ফেলছে চোখের জল।

হঠাৎ গাছের ফাঁক থেকে লাফিয়ে পড়ল একটা বুনো কুকুর। ছট্‌ফট্‌ করল খেঁকশেয়াল। বুনো কুকুর মেরে ফেলল খেঁকশেয়ালকে, যে খেঁকশেয়াল মেরেছিল কাঠবেড়ালকে, যে কাঠবেড়াল কাঠবাদাম খাচ্ছিল।

ঝাপ্‌সা চোখে গাছ,
ঘন পাতার গাছ,
দেখছে নিচে ফল,
ফেলছে চোখের জল।

আধবোজা চোখে নেকড়ে হাড় চিবোচ্ছে। আর ক্ষিদে নেই। পেট ভর্তি। তবু হাড় চিবোচ্ছে। আঃ! একটু জিরিয়ে নিয়ে গুহায় ফেরা যাবে।

হঠাৎ একটা হলুদ তীর ছুটে এল। চিতা লাফিয়ে পড়েছে নেকড়ের দেহের ওপর। কামড়ে ধরেছে নেকড়ের গলা। ঝটাপটি, মারামারি। নেকড়ে নিথর হয়ে গেল। চিতা মেরে ফেলল নেকড়েকে, যে নেকড়ে বুনো কুকুরকে মেরেছিল, যে বুনো কুকুর খেঁকশেয়ালকে মেরেছিল, যে খেঁকশেয়াল কাঠবেড়ালকে মেরেছিল, যে কাঠবেড়াল কাঠবাদাম-খাচ্ছিল।

ঝাপ্‌সা চোখে গাছ,
ঘন পাতার গাছ,
দেখছে নিচে ফল,
ফেলছে চোখের জল।

খাচ্ছে, খাচ্ছে, চিতা মাংস খাচ্ছে। তুলতুলে মাংস, রক্তমাখা নরম মাংস। পেট ভরে গেল। যাওয়ার তাড়া নেই। চোখ বুজে লম্বা হয়ে শুয়ে রইল গাছের নিচে। গাছের পাতা কাঁপছে। ঘন পাতার ছায়া। আরামে চোখ বন্ধ হয়ে এল চিতার। সে ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। অনেক বয়েস হয়েছে গাছের, আর তেমন শক্তি নেই। হাওয়ার তেজ সহ্য করতে পারল না। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল গাছ। ঠিক চিতার পেটের ওপর। চিতা তক্ষুনি মরে গেল, যে চিতা নেকড়েকে মেরেছিল, যে নেকড়ে বুনো কুকুরকে মেরেছিল, যে বুনো কুকুর খেঁকশেয়ালকে মেরেছিল, যে খেঁকশেয়াল কাঠবেড়ালকে মেরেছিল, যে কাঠবেড়াল কাঠবাদাম খাচ্ছিল।

কোথা থেকে আকাশে মেঘ জমল। মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের আলো। হঠাৎ বাজ পড়ল নিচে, কাঠবাদাম গাছের ওপর। দাউ দাউ জ্বলে উঠল কাঠবাদাম গাছ, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল গাছ, যে গাছ চিতার ওপর পড়েছিল, যে চিতা নেকড়েকে মেরেছিল, যে নেকড়ে বুনো কুকুরকে মেরেছিল. যে বুনো কুকুর খেঁকশেয়ালকে মেরেছিল, যে খেঁকশেয়াল কাঠবেড়ালকে মেরেছিল, যে কাঠবেড়াল কাঠবাদাম খাচ্ছিল।

বাজের আওয়াজ আর বিদ্যুৎ চমকানো থেমে গেল। ঝমঝম্ করে বৃষ্টি নামল। চারিদিকে আঁধার করা বৃষ্টি। ছাই পচে গেল। শেষকালে একদিন গাছ মাটির সঙ্গে মিশে গেল, যে গাছে বাজ পড়েছিল, যে গাছ চিতার ওপরে পড়েছিল, যে চিতা নেকড়েকে মেরেছিল, যে নেকড়ে বুনো কুকুরকে মেরেছিল, যে বুনো কুকুর খেঁকশেয়ালকে মেরেছিল, যে খেঁকশেয়াল কাঠ-বেড়ালকে মেরেছিল, যে কাঠবেড়াল কাঠবাদাম খাচ্ছিল।

মাটি ভিজে রয়েছে। বর্ষাকাল। বর্ষার জলে, পচে-যাওয়া গাছের ছাইয়ে সেখানকার জমি আরো ভালো হল। উর্বর হল। এল বসন্ত। সেই জমিতে অনেক কাঠবাদামের গাছ। কচি ডাল, সবুজ পাতা। অনেক ফল ছড়িয়ে ছিল সেই গাছের নিচে। আজ গাছের অনেক ছোট্ট চারা। সেখানে কাঠবাদামের বন হয়ে গেল। ঘন বন। অনেক বাদামের গাছ। কাঠ বাদাম গাছের সন্তান।

সেই থেকে বনে বনে কাঠবাদামের গাছের বন হল। একটা কাঠ-বাদামের গাছ তাই তোমরা কখনও দেখতে পাবে না। ওরা ডালে ডালে লেগে থাকে, এক গাছের ডাল অন্য গাছে। আর তো একা নয়, তাই ভয়ও নেই।

ধ্রুবতারা ও শুকতারা

অনেক অনেককাল আগে বনের মধ্যে এক গাঁয়ে থাকত এক সর্দার। সে ছিল গাঁয়ের সব মানুষের মাথা, সে গোষ্ঠীপতি। তার ছিল এক ছেলে। এমন দুষ্টু ছেলে কমই দেখা যায়। একটা দুষ্টুমি করেই সে আর একটা কি দুষ্টুমি করবে তা ভাবতে থাকে। বেশিক্ষণ ভাবেও না। দুষ্টুমির খেলা খেলতে তাকে কোনোদিন বেশি কিছু ভাবতে হয় না।

একদিন গুলতি নিয়ে খেলছে। বাড়ির পাশের গাছে অনেক পাখি বসে রয়েছে। এর মধ্যেই গোটা তিনেক পাখিকে সে মেরেও ফেলেছে। এমন সময় দেখে পথ দিয়ে যাচ্ছে এক বুড়ি। মাথায় তার জলভর্তি কলসি। একটু হাসল সর্দারের ছেলে। টং করে আওয়াজ হল। কলসি গেল ভেঙে। বুড়ি ভিজে গেল।

অনেক দূরের পাহাড়ী ঝরনা থেকে খাওয়ার জল আনতে হয়। বুড়ি রেগে গিয়ে বলল, 'কোথাও শান্তি পাবি না। পাজি ছেলে কোথাকার! গোটা দুনিয়া চষে বেড়ালেও শান্তি পাবি না। ঐ দূরের অমর রাজ্যে গেলেও তুই শান্তি পাবি না, এক মুহূর্ত বিশ্রাম পাবি না। এই বলে দিলাম।'

কথাটা শুনে দুষ্টু ছেলে কেমন পাল্‌টে গেল। গুলতি ফেলে দিল দূরে। মুখ নিচু করে ঘরে ঢুকল। শুধু চিন্তা করছে বুড়ির কথা। মন খারাপ থাকে সবসময়। দুষ্টুমি করতে যায় না। শুধু ভাবে আর ভাবে। সে বেরিয়ে পড়তে চায় বিরাট দুনিয়ায়,—কোথায় রয়েছে অমর রাজ্য, সে সেখানেই যাবে। কয়েকদিন ভাবনার পর সে সব ঠিক করে ফেলল। সর্দার-বাবার কাছে গিয়ে সে নতুন পোশাক চাইল, চাইল তরবারি আর একটা মোটা লাঠি। কথা শুনল না, বাবা-মায়ের কথাও না। এইসব নিয়ে সে অজানা পথে রওনা দিল। নিজের বাড়ি পেছনে পড়ে রইল।

সে পথ হাঁটছে। কত পথ পেছনে পড়ে রইল। কত গ্রাম পেরিয়ে গেল সে। বন পেরিয়ে এল, নদী পেরিয়ে এল। সে হাঁটছে, সে হাঁটছে।

শেষকালে বনের মধ্যে সে একজন সন্ন্যাসীর কুঁড়েঘর দেখতে পেল। পল্‌কা দরজায় টোকা মারল। সন্ন্যাসী দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল। চোখ

কুঁচকে বলল, 'বাছা, তুমি কি চাও? এমন জায়গায় তুমি?'

ছেলে বলল, 'বলতে পার, কোথায় রয়েছে অমর রাজ্য? আমি সেখানে যাব।'

সন্ন্যাসী অবাক হয়ে চেয়ে রইল। একটু পরে বলল, 'অমন রাজ্য তো আমি কখনও দেখি নি। অমর রাজ্যের নামও কখনও শুনিনি। কি জানি কোথায় সে রাজ্য!'

ছেলে দুঃখ পেল। সন্ন্যাসীও সে রাজ্যের কথা জানে না? বিড়্‌বিড়্‌ করে বলল, 'তাহলে এখন আমি কি করি? বাড়িতে তো ফিরতে পারব না। কখনই না।'

এই কথা শুনে সন্ন্যাসী আস্তে আস্তে বলল, 'সামনেই পড়বে ঘন বন। আলো ঢোকে না ঐ বনে। নিচের দিকে অন্ধকার। ঐ বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাও। বনে রয়েছে অসংখ্য হিংস্র প্রাণী। যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই নত হয়ে অভিবাদন জানাবে, প্রত্যেককে। শেষকালে তুমি পৌঁছে যাবে একটা বিশাল রাজপ্রাসাদের সামনে। দেখবে, সামনে শুয়ে রয়েছে মস্ত বড় একটা সাপ। তাকেও নত হয়ে অভিবাদন জানাবে। মাথা সরিয়ে সে তোমায় পথ করে দেবে। সেখানে গেলে জানতে পারবে কোন্‌দিকে কতদূরে যেতে হবে। এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

এগিয়ে চলল ছেলে। বনের ঘন অন্ধকারে সব পশু-পাখি-কীটপতঙ্গকে সে নত হয়ে অভিবাদন করল। কেউ কিছু বলল না। শেষকালে বন পেরিয়ে এল রাজপ্রাসাদের সামনে। বিশাল এক সাপ এধার-ওধার পথ জুড়ে শুয়ে আছে। ছেলে বলল, 'বাঃ! কি সুন্দর তোমার সোনালী দেহের রঙ্‌-বাহার। তোমায় অভিবাদন জানাই।'

সাপ খুব খুশি হল। মাথা একধারে সরিয়ে নিল। বলল, 'খুব ভাগ্যবান তুমি। যদি আমায় অভিবাদন না জানাতে, এখুনি মেরে ফেলতাম তোমায়। খুব ভাগ্য ভালো তোমার।'

অল্প দূরে গিয়ে ছেলে থামল, পেছন ফিরে বলল 'আমাকে মারতে এলে তোমাকেও তালগোল পাকিয়ে দিতাম। কিংবা তুমি পড়ে থাকতে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে। তুমিও ভাগ্যবান।'

সর্দারের ছেলে রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেখা হল এক

বুড়োর সঙ্গে। বুড়োর বয়স এই পৃথিবীর বয়সের সমান। খুব বুড়ো। সে বলল, 'বাঃ, খুব সাহসী ছেলে তো! সাবাস্। তা তুমি এখানে এলে কেন?'

'আমি অমর রাজ্য খুঁজতে বেরিয়েছি। এখনও পাই নি।'

'সে তো অনেক অনেক দূর। বহু দূরে। আজ পর্যন্ত কেউ সেখানে যেতে পারে নি, কেউ তার পথ জানে না। আমি জানি, শুধু আমি জানি। তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। তাছাড়া, আমার সব জীবজন্তুকে তুমি অভিবাদন জানিয়েছ, এতেও আমি খুশি। ওরা আমার আদরের ছেলেমেয়ে। তোমায় আমি পথ বলে দেব। এই গোল বলটি তোমায় দিলাম। আসলে এতে জড়ানো আছে সোনার সুতো। এই তোমাকে পথ দেখাবে। এটাকে গড়িয়ে দেবে, আর এর পেছন পেছন যাবে। খুব ভালো লেগেছে তোমায়।'

ছেলে নত হয়ে বুড়োকে বিদায় জানাল। বলটি মাটিতে জোরে গড়িয়ে দিল। বল পাহাড় ডিঙিয়ে, উপত্যকা ছাড়িয়ে, শস্যক্ষেত পেরিয়ে, মরুভূমি ছাড়িয়ে গড়িয়ে গেল। পেছনে পড়ে রইল সরু সুতো, সোনার সুতো,—ঠিক মাকড়সার জালের মতো। সুতোর পথ বেয়ে এগিয়ে চলল ছেলে। শেষকালে পৌছল এক ওক গাছের নিচে। সেখানে সে থামল। সত্যি ক্লান্ত সে। বসে পড়ল গাছের নিচে।

গাছের নিচে পড়ে ছিল ওক ফলের একটা বীজ। ছেলে না দেখে তার ওপরেই বসে পড়ল। বীজ ফেটে গেল, অঙ্কুর বেরিয়ে পড়ল। এত চাপ কি ছোট্ট বীজ সহ্য করতে পারে? সে ব্যথা পেয়ে বলে উঠল, 'তুমি কে? তুমি তো খুব সুন্দর। তা তুমি চলেছ কোথায়?'

'আমি এক সর্দারের ছুট্টু ছেলে। আমি চলেছি অমর রাজ্যে। চিরকাল সেখানেই থাকব। সেখানেই যাচ্ছি।'

'বেশ, ভালো, কিন্তু তুমি অমনভাবে আমার ওপরে বসে থেকো না। সবে আমার অঙ্কুর গজিয়েছে। এখনও আমি খুবই ছোট, বড়ই দুর্বল। তোমার চাপে গুঁড়ো হয়ে গেলাম। তুমি ওঠ। আমাকে বড় হতে দাও। ইচ্ছে করলে তুমি এখানেই থাকতে পার। কিছুদিন পরে আমি মস্ত বড় গাছ হব, ডালপালা-পাতায় ছড়িয়ে পড়ব। ততদিন তুমি আমার কাছেই থাক।

তোমাকে একটা কথা বলি, আমি অনেক অনেকদিন বাঁচব, তারপর বুড়ো হব, ভেঙে পড়ব ঝড়ে, ধুলোর সঙ্গে মিশে যাব, ছোট ছোট পাখি সেই ধুলোয় আনন্দে গড়াগড়ি যাবে। সেই তখন তোমার শেষ দিন ঘনিয়ে আসবে, তার আগে নয়।'

সর্দারের ছেলে একথা শুনে উঠে দাঁড়াল। নরম মাটি এনে অঙ্কুরের চারপাশে দিল, এটা ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পারবে। বিদায় জানিয়ে ছেলে রওনা দিল।

অনেকদিন ধরে ছেলে পথ চলল। শেষকালে এক আঙুর ক্ষেতে এল। আঙুরের ভারে লতানো গাছ নুইয়ে পড়েছে। গাছের নিচের ছায়ায় সে বসে পড়ল। খুব ক্লান্ত সে। হাত বাড়িয়ে পাকা আঙুর তুলে খেতে লাগল। একটু পরে আঙুর গাছ বলল, 'ওগো সুন্দর ছোট্ট ছেলে, তুমি একা একা কোথায় চলেছ?'

'আমি চলেছি অমর রাজ্যে। চিরকাল সেখানেই থাকব।'

আঙুর গাছ বলল, 'আঙুরের একটা বীজ এই মাটিতে পুঁতে দাও। এই বীজ একদিন বড় হবে, তাতে অনেক আঙুর ফলবে। ইচ্ছে হলে তুমি এখানেই থেকে যেতে পার। আঙুর গাছ এত বড় হয়ে উঠবে যে মাটির নিচে আর শেকড় যেতে পারবে না, পাতা এত বেশি হবে যে সূর্যের নিচে জায়গায় কুলোবে না। ততদিন তুমি এখানে থেকে যাও আর আঙুর খাও। তুমি বাঁচবে ততদিন।'

ছেলে আঙুরের একটা বীজ ভালোভাবে মাটিতে পুঁতে দিল, নরম মাটি চারপাশে রেখে দিল। তারপর বলল, 'কত ভালো তুমি, তোমার ফলের রস খেয়ে আর আমার ক্লান্তি নেই। তোমার বীজ বড় হোক, তার ডালপালা ফুলে-ফলে ভরে উঠুক। কিন্তু আমায় যে আরও অনেক দূর যেতে হবে বন্ধু!'

আঙুর গাছ বলল, 'তুমি যাও, তোমার পথের বাধা দূর হোক। বিপদ না আসুক।'

এগিয়ে চলল ছেলে। চলছে, চলছে,……হঠাৎ বনের পথে দেখতে পেল একটা ঈগল পাখি আহত হয়ে পড়ে রয়েছে। ছেলের দুষ্টুবুদ্ধি জেগে উঠল। তীর-ধনুক নিয়ে তাকে মারতে গেল। করুণ গলায় ঈগল বলল, 'ওগো সুন্দর ছেলে, তীর নামাও, আমাকে মেরো না। আমাকে

একটু জল দাও, আমাকে সুস্থ করে তোল। আমি তোমার অনেক উপকার করব। আমাকে মেরো না, দোহাই তোমার। তুমি যখন কোনো বিপদে পড়বে, শুধু একবার আমার কথা মনে আনবে, আমি তক্ষুনি তোমার কাছে উড়ে যাব। তোমার বিপদে পাশে থাকব।'

তীর-ধনুক পিঠে রেখে দিল ছেলে। জল এনে ঈগলকে সুস্থ করে তুলল। তার ভাঙা ডানায় হাত বুলিয়ে দিল, গাছের রস লাগিয়ে দিল। গাছের ফল এনে তাকে খেতে দিল। আবার এগিয়ে চলল সামনে।

একটু পরেই সে পৌঁছে গেল সমুদ্রের কাছে। বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে দেখতে পেল, তার সামনে সাদামতন কি যেন চক্‌চক্‌ করছে। আরও একটু এগিয়ে গেল। অবাক হয়ে গেল। ঢেউ পেছনে সরে গেল, মাছেদের রাজা বালির ওপর ছট্‌ফট্‌ করছে। সূর্যের তাতে বালি গরম হয়ে রয়েছে। মাছেদের রাজা চব্বিশ হাত লম্বা আর মানুষের মতো উঁচু। তার পাখ্‌না রুপোলি রঙের আর আঁশ সোনালী রঙের। কোনো মানুষ এমন মাছ আগে দেখেনি।

ছেলে মাছের পাশে গিয়ে বলল, 'এমন সুন্দর দেখতে যে মাছ তার স্বাদও নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে। খিদেও পেয়েছে……।'

সোনালী মাছ বলে উঠল, 'ওগো সুন্দর ছেলে, তুমি আমাকে খেয়ো না। তুমি আমাকে মেরো না। সমুদ্রের গভীর জলে তুমি আমায় ভাসিয়ে দাও। যখনই তুমি বিপদে পড়বে, শুধু আমার কথা মনে করবে, আমি বিপদে তোমার পাশে থাকব।'

মস্ত বড় একটা মোটা লাঠি কুড়িয়ে আনল সে। তারপর আস্তে আস্তে গড়িয়ে মাছেদের রাজাকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিল।

আবার রওনা দিল ছেলে। হঠাৎ দেখতে পেল, একটা শেয়াল প্রাণের ভয়ে ছুটছে আর তার পেছনে অনেকগুলো বুনো কুকুর। শেয়ালের দেহ ক্ষতবিক্ষত, জিব্‌ বের করে সে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটছে। দুষ্টু বুদ্ধি জেগে উঠল ছেলের মনে। তীর-ধনুক ঠিক করছে এমন সময় শেয়াল বলে উঠল, 'ওগো সুন্দর ছেলে, আমাকে মেরো না, দোহাই তোমার। আমাকে বাঁচাও, বুনো কুকুরদের হাত থেকে বাঁচাও। আমার আঘাত ভালো করে দাও। একদিন হয়তো তোমার বিপদে কাজে লাগতেও পারি।'

সর্দারের ছেলে বুনো কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে দিল, শেয়ালের গায়ে গাছের ঠাণ্ডা রস লাগিয়ে দিল। বেশ কয়েকদিন ধরে তার কাছে থাকল। শেয়াল ভালো হয়ে উঠল। বিদায় নেবার সময় শেয়াল বলল, 'তুমি খুব ভালো ছেলে। তোমার ভালো হোক। যখনই তুমি বিপদে পড়বে, শুধু আমার কথা মনে করবে, আমি বিপদে তোমার পাশে থাকব।'

আবার পথে নামল ছেলে। যতই এগোয় সোনার সুতোর বল ততই এগিয়ে যায়। কিন্তু বলটি ছোট হয়ে আসছে, অনেক সোনালী সুতো পেছনে রয়ে গিয়েছে। হঠাৎ ছেলে দেখতে পেল একটা গাছ। তার দুই ডালের মাঝখানে মাকড়সার জাল। সেই জালে আটকে পড়েছে একটা মশা। সে তাকে দেখেই কেঁদে উঠল, 'ওগো সুন্দর ছেলে, আমাকে বাঁচাও, যেমন করে পারি তোমাকে সাহায্য করব। আমি জানি তুমি কোথায় চলেছ। অমর রাজ্যে। আমাকে যদি বাঁচাও, তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।'

এই কথা শুনে ছেলে থামল, মাকড়সার জালের কাছে গেল। হাত বাড়িয়ে জালের মধ্যে থেকে মশাকে তুলে আনল। তখনও মশা ছট্‌ফট্ করছে। মশা বলল, 'ছেলে, তোমার মন খুব ভালো, বড় দয়া তোমার। যখন কোনো বিপদে পড়বে, আমার কথা মনে করবে, আমি তোমার পাশে থাকব। এগিয়ে যাও, কোনো বিপদ হবে না। তোমাকে আর বেশি দূর যেতে হবে না, সামনেই তুমি একটা প্রাসাদ দেখতে পাবে। সোজা ঢুকে পড়বে, দেখবে রাজা বসে আছে সিংহাসনে। তার কাছে গিয়েই বলবে, আপনার ছোট মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিন। বিয়ে না হলে তুমি অমর রাজ্য শাসন করতে পারবে না। এগিয়ে যাও।'

সর্দারের ছেলে এগিয়ে চলল। সোনালী সুতোর বল ছোট হচ্ছে, আরও ছোট হচ্ছে। আপেলের মতো হয়ে গেল, বাদামের মতো হয়ে গেল, মটরশুঁটির মতো হয়ে গেল,—মিলিয়ে গেল এক প্রাসাদের দরজার সামনে।

অপূর্ব প্রাসাদ। প্রাসাদের সিংহদ্বার বন্ধ। ছেলে দ্বারে আঘাত করল। রাজা সেই আঘাত শুনে একজন সৈন্যকে পাঠালেন। সৈন্য দ্বার খুলে বলল, 'কে তুমি, কোথা থেকে এসেছ, কেন এসেছ, কোথায় তুমি যেতে চাও?'

সব প্রশ্নের উত্তর দিল সর্দারের ছেলে। তার উত্তর শুনে রাজা তাকে তার সামনে আনতে বললেন। ছেলে মাথা উঁচু করে বলল, 'মহারাজ, আপনাকে প্রণাম জানাই। আমি এখানে এসেছি আপনার ছোট মেয়েকে বিয়ে করতে। আপনি কি রাজি আছেন? আপনার ছোট মেয়ে হবে আমার বৌ।'

রাজা হেসে বললেন, 'কেন রাজি থাকব না? আমার ছোট মেয়েকে তোমার হাতেই দেব। কিন্তু একটা কথা। তোমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে, যদি কেউ খুঁজে না পায় তবেই মেয়ের বিয়ে দেব। তোমার সঙ্গে তখন ধুমধাম করে ওর বিয়ে দেব, তুমি চিরকাল থাকবে আমাদের কাছে। কেননা, আর যাওয়ার পথ নেই। এই প্রাসাদের এই সিংহদ্বার থেকে শুরু হয়েছে অমর রাজ্য।'

অমর রাজ্যের কথা শুনেই ছেলের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবার সঙ্গে সঙ্গে মুখে মেঘও নেমে এল। কেননা, সে কেমনভাবে লুকোবে তা জানে না। কেউ দেখবে না এমনভাবে লুকোতে হবে। সে তা এসব জানে না! সে ভাবছে, ভাবছে—হঠাৎ সেই আহত ঈগল পাখির কথা মনে পড়ল। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই ছেলে দেখল তার পাশে ঈগল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'এত মন খারাপ কেন বন্ধু? কি হয়েছে?'

'তুমি এসে গিয়েছ ঈগল? বড় বিপদে পড়েছি। এমন বিপদ আগে বুঝিনি....।' ছেলে খুলে বলল বিপদের কথা।

'এই ব্যাপার। কিচ্ছু ভাবতে হবে না।' ঈগল আশ্বাস দিল।

ঈগল ছেলেকে তুলে নিল। উঁচু, উঁচু, আরও উঁচু আকাশে লুকিয়ে ফেলল তাকে। নিচে নয়টা মেঘের স্তর। কেউ দেখতে পাবে না ছেলেকে।

সেই রাজার ছিল তিন মেয়ে। তিনজনকে একই রকম দেখতে। তাদের মুখের গড়ন এক, মাথার চুল এক, পোশাক এক, জুতোও একই রকমের। রাজা বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন, হাতে তার খোলা তরবারি। বড় মেয়েকে বললেন, 'ছেলেকে খুঁজে বের করো। যদি না পাও, এক আঘাতে তোমার মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।'

বড় মেয়ে বাগানে গেল, এক সাজিভর্তি ফুল তুলল। তারপরে বাবার সঙ্গে ছেলেকে খুঁজতে গেল। মেয়ে পৃথিবীর চারদিকে তাকিয়ে দেখল, ছেলেকে দেখতে পেল না। মেয়ে সাগরের চারদিকে দেখল, ছেলেকে দেখতে পেল না। মেয়ে আকাশের দিকে চাইল, ছেলেকে দেখতে পেল। বলল, 'ছেলে, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এস। তোমায় দেখে ফেলেছি।'

চোখের পলকে ঈগল ছেলেকে নিয়ে মেঘের আড়াল থেকে মাটিতে নেমে এল। তার দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, 'ছেলে, তোমার মাথা কি লুটিয়ে দেব? তরবারি খোলা রয়েছে।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বড় মেয়ে বলে উঠল, 'বাবা, প্রথমবারে ও হেরে গিয়েছে, ওকে ক্ষমা করো।'

রাজা ক্ষমা করলেন, 'শোনো, আমার মেজ মেয়ে যদি তোমায় খুঁজে পায়, তোমার মাথা কিন্তু দেহের ওপরে থাকবে না।'

রাজা প্রাসাদে চলে গেলেন মেজ মেয়েকে আনতে। আহা! বেচারী ছেলে, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ভাবতে লাগল। কেমন করে এ বিপদ কাটবে? কোনো পথ তো জানা নেই। হঠাৎ তার মনে পড়ল মাছেদের রাজার কথা। হঠাৎ সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেল, ঢেউ এসে লাগল প্রাসাদের দেয়ালে। আর ঢেউয়ের মধ্যে থেকে উঠে এল মাছেদের রাজা। 'এত মন খারাপ কেন? কি হয়েছে তোমার বন্ধু?'

ছেলে সব বলল। এবার ঠিকমতো লুকোতে না পারলে রাজা তার মাথা কেটে নামিয়ে দেবেন। বড় বিপদ তার।

'কোনো চিন্তা নেই। সমুদ্রের অতল গভীরে অনেক লুকোবার জায়গা আছে। আমি জানি। আমি তোমায় নিয়ে যাব।' মাছেদের রাজা ছেলেকে মুখের ভেতর ঢুকিয়ে নিল, তারপরে গভীর সমুদ্রে মিলিয়ে গেল।

রাজা মেজ মেয়েকে নিয়ে প্রাসাদের বাইরে এলেন। খোলা তরবারির দিকে চেয়ে বললেন, 'ছেলেকে খুঁজে বের করো। যদি না পার, মাথা লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।'

মেজ মেয়ে বাগানে গেল, সাজিভর্তি ফুল তুলে এনে বাবার সঙ্গে চলল। মেয়ে পৃথিবীর চারদিকে দেখল, ছেলেকে খুঁজে পেল না। মেয়ে আকাশের চারদিকে দেখল, সূর্যের পেছনে চাঁদের পেছনে, ছেলেকে খুঁজে পেল না।

শেষকালে সমুদ্রের নিচে চোখ ফেরাল, দেখতে পেল ছেলেকে, 'বেরিয়ে এস সমুদ্রের গভীর তলা থেকে, আমি তোমায় দেখে ফেলেছি।'

মাছেদের রাজা ছেলেকে চোখের পলকে রাজার সামনে নিয়ে এল। রাজা বললেন, 'এবার তাহলে মাথা নিচু করো।'

মেজ মেয়ে ছুটে গিয়ে রাজার হাত ধরে বলল, 'বাবা, দ্বিতীয়বারেও হেরে গিয়েছে, ওকে এবারও ক্ষমা করো।'

'বেশ, তোমার কথাই রাখলাম। দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমা করলাম। ছেলে, আমার মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তোমায় ক্ষমা করলাম। কিন্তু তৃতীয়বারেও যদি তোমায় খুঁজে পাই, তাহলে সবুজ ঘাসে তোমার আর পা পড়বে না। সেই মুহূর্তেই .... ।'

রাজা প্রাসাদের মধ্যে চলে গেলেন। ছেলে মাথায় হাত দিয়ে সবুজ ঘাসের ওপরে বসে পড়ল। তার বুক কাঁপছে, চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে উঠেছে। এখন সে কি করবে? রাজার তরবারি তার দেহের কাছে আসবে, তারপর সব শেষ। কোথায় পড়ে রইল তার বাবা-মা, কোথায় তার অমর রাজ্য। অনেক পুরনো কথা মনে পড়ছে।

হঠাৎ আহত শেয়ালের কথা মনে পড়ল। তাকিয়ে দেখে, পাশে বসে রয়েছে সেই শেয়াল। 'এত মন খারাপ কেন? কি বিপদ হয়েছে তোমার বন্ধু?'

'শোনো বন্ধু, আমার বিপদের কথা।' .....

'শান্ত হও। মন খারাপ করো না। এর জন্য অত ভাবতে হবে না। আমার সঙ্গে এস, আমি জানি কি করতে হবে।'

শেয়াল এগিয়ে চলল। পেছনে পেছনে যাচ্ছে সর্দারের ছেলে। মুখচোখে কালো মেঘ। শেয়াল ফুলের বাগানে ঢুকল। ছেলেও। শেয়াল হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, লেজ দিয়ে ছেলের দেহ স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে সুন্দর ফুল হয়ে গেল। বাহারী রঙিন ফুলগাছের মধ্যে সে মিশে থাকল। সবচেয়ে সুন্দর ফুল হয়ে রইল।

রাজার ছোট মেয়ে ফুলের বাগানে ঢুকল। সাজিতে একটিমাত্র ফুল তুলল। ঐ ফুলটাই তার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। এত সুন্দর ফুল বাগানে আর দুটি নেই। সাজি হাতে বেরিয়ে এল বাগান থেকে। বাবার কাছে। বাবা খোলা তরবারির দিকে চেয়ে বললেন, 'খুঁজে বের

করো সেই ছেলেকে, নইলে তরবারির এক আঘাতে মাথা লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।'

ছোট রাজকুমারী পৃথিবীর চারদিকে দেখল, ছেলেকে খুঁজে পেল না। মেয়ে সমুদ্রের চারদিকে দেখল, ছেলেকে খুঁজে পেল না। মেয়ে আকাশের চারদিকে দেখল,—তবু খুঁজে পেল না ছেলেকে। মেয়ে আবার পৃথিবীর গভীরে, সমুদ্রের তলায়, তারার ওপাশের আকাশে বারবার চেয়ে দেখল, কিন্তু খুঁজে পেল না সেই লুকনো ছেলেকে।

রাজা বললেন, 'ভালোভাবে খুঁজে দেখ। তুমিই তাকে লুকিয়ে রেখেছ।'

গান ঝরে পড়ল গলায়। বিষাদের গান, 'বাবা, আমি চারদিকে খুব ভালোভাবে দেখেছি, খুঁজেছি। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি তার ছায়া দেখছি, কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

রাজার আর কিছু করার নেই। তিনি বলে উঠলেন, 'সাবাস সাহসী ছেলে, তুমি এবার বেরিয়ে এস। আমার মেয়ে তোমায় খুঁজে পায়নি।'

দুষ্টু ছেলে ছোট রাজকুমারীর ফুলের সাজি থেকে লাফিয়ে পড়ে বলে উঠল, 'মহারাজ, এই তো আমি এখানে, আপনার সামনে।'

'সত্যি তুমি বেজায় সাহসী। ছোট ছেলে, তোমার কাছে হেরে গিয়েছি।'

রাজা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। তার সব বাজনাদারদের ডাকলেন। ছেলেকে নিয়ে গেলেন প্রাসাদের মধ্যে। যদি ছেলে ঠিকমতো ছোট রাজকুমারীকে চিনতে পারে, তবে এক্ষুনি হবে তাদের বিয়ে। আর যদি চিনতে না পারে, তবে ছেলের মাথা লুটিয়ে পড়বে প্রাসাদের মেঝেতে।

ছেলে ভেবেছিল, তার সব বিপদ কেটে গিয়েছে। কিন্তু নতুন বিপদ এল। তিনজনকেই যে একই রকম দেখতে। এখন উপায়? সবচেয়ে বড় বিপদ। সে কেঁদে ফেলল, অনেকক্ষণ কাঁদল। তার চোখদুটো লাল হয়ে উঠল। 'এইবার আমার জীবনের শেষ, সব শেষ। এবার রাজা ঠিক আমার মাথা কেটে ফেলবেন। রক্ষা নেই।'

হঠাৎ তার সেই মশার কথা মনে পড়ল। দেখতে পেল, মশা তার কানের কাছে উড়ে এসে বসেছে। 'বন্ধু, এত মেঘ কেন তোমার মুখে? এমন করে কাঁদছ কেন? আমি তো রয়েছি।'

'বন্ধু, তুমি একটা ছোট্ট মশা। কি করবে তুমি! আমি ভেবেছিলাম,

আমার সব বিপদ কেটে গিয়েছে। কিন্তু রাজা এবার সত্যিই আমার মাথা নামিয়ে দেবে। কেমন করে বলব, কেমন করে বলব, কোন্‌জন রাজার ছোট মেয়ে। তিনজনেই যে একই রকম দেখতে!'

'কিচ্ছু ভেবো না বন্ধু। আমি সব জানি। কে বড়, কে মেজো আর কে ছোট মেয়ে আমি বুঝতে পারি। আমি যে ওদের সঙ্গেই বেড়ে উঠেছি। ওদের চিনব না? রাজা যখন তিন রাজকুমারীকে নিয়ে আসবে, আমি ছোট মেয়ের নাকের ওপরে উড়ে গিয়ে বসব। তাহলেই তুমি বুঝবে...।'

রাজার পেছনে তিন মেয়ে এগিয়ে এল। পাশাপাশি দাঁড়াল। এক চোখ, এক মুখ, মাথায় এক, পরে রয়েছে একই পোশাক। কেউ বলতে পারবে না, কে বড কে মেজো কে ছোট। অসম্ভব। সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। ছেলের কানের ওপর থেকে মশা উড়ে গেল। ছোট মেয়ে হাত তুলে নাকের ওপরে বসা মশাকে তাড়াতে গেল। ছেলে এগিয়ে গিয়ে ছোট রাজকুমারীর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, 'মহারাজ, এই মেয়েই ছোট রাজকুমারী।'

রাজা অবাক হলেন। হেসে বললেন, 'সাবাস ছোট্ট ছেলে, তুমি ঠিক চিনতে পেরেছ। হ্যাঁ, ঐ আমার ছোট মেয়ে।'

ছোট মেয়ে সকাল বেলার সূর্যের মতো সুন্দরী, ফুটন্ত তুলসী ফুলের মতো মিষ্টি।

রাজা ছেলেকে বরের সাজে সবার সামনে নিয়ে এলেন, পাশে রয়েছে ছোট রাজকুমারী। রাজা ছেলের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তোমায় আমার ছোট মেয়েকে তুলে দিলাম। সেই সঙ্গে দিলাম আমার গোটা রাজ্য। আজ থেকে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে। মৃত্যু কি, তা তুমি কোনোদিন জানতে পারবে না, তুমি অমর হয়ে চিরকাল বেঁচে রইবে। তোমার রাজ্যে তুমি ঘুরে বেড়াও। এ রাজ্য আজ থেকে তোমার। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে, প্রাসাদের যে দ্বার দিয়ে তুমি একদিন এখানে ঢুকেছিলে, ভুলেও কখনও তার বাইরে যাবে না। তাহলে সর্বনাশ নেমে আসবে। ভীষণ বিপদ।'

ধুমধাম করে দুজনের বিয়ে হয়ে গেল। ছেলে প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। সে সোনালী বাগানে যায়, সোনালী গাছে গাছে ফল ধরেছে, ফলের ভারে গাছ মাটিতে নুইয়ে পড়েছে। প্রাসাদের ঘরগুলো

সোনায় মোড়া, রুপোয় মোড়া, তার মধ্যে অমূল্য সব উজ্জ্বল পাথর। প্রাসাদের কুয়োগুলো শ্বেতপাথরের, মধু আর দুধে ভর্তি নদীগুলো। ডালে-ডালে গান-গাওয়া পাখি, পথগুলো সবুজ ঘাসে ঢাকা, ছোট ছোট লতানো ফুলে সাজানো। তার ওপরে সকালের শিশির জমে, মনে হয় মুক্তো ঝরে আছে। এমন প্রাসাদ কেউ দেখেনি। সে রাজ্যে সূর্য ওঠে না, সূর্য ডোবে না। সূর্য সবসময় থাকে প্রাসাদের ওপরে। তার মিষ্টি নরম আলো প্রাসাদকে সবসময় উজ্জ্বল করে রাখে।

ছেলে যেন বাস করছে স্বর্গের উদ্যানে। একদিন ছেলে গিয়েছে শিকার করতে। হাতে তীর-ধনুক। প্রাসাদের প্রাচীরের দিকে তীর ছুড়েছে। প্রাচীর টপ্‌কে তীর ওধারে চলে গেল। তীরটা কোথায় পড়েছে? সে প্রাচীরের ওধারে তাকিয়ে দেখল। নিচে বেশ দূরে। তীরটা আনা দরকার। সে সিংহদ্বার খুলে ফেলল। ভুলে গেল রাজার নিষেধের কথা। দ্বারের বাইরে এসেই সে দেখতে পেল, সেখানে পড়ে রয়েছে সোনালী সুতোর ছোট্ট বল। মনে পড়ল বাড়ির কথা, বাবা-মায়ের কথা। এতদিন সব ভুলে ছিল। বাবা-মায়ের কাছে যাবার জন্য মন কেমন করে উঠল। বুকের মধ্যে বেদনা। সে একটু চিন্তা করল। তারপর ঠিক করে ফেলল, 'সব কিছু পেছনে ফেলে যাব, যাব আমার বাবা-মায়ের কাছে। কেমনভাবে আমার বাবা-মা রয়েছে, তা দেখতে যাব। যাবই। আহা! কতদিন বাবা-মাকে দেখিনি।'

রাজা শুনে বললেন, 'বাছা, গিয়ে কোনো লাভ নেই। তুমি অনেক কিছু জানো না। এখানে তোমার বহুকাল কেটে গিয়েছে। এখানে থাকলে ওসব বোঝা যায় না। তোমার বাবা-মা বেঁচে নেই। এমন কি তাদের নাতি-পুতিও বেঁচে নেই। বুড়ো হয়ে মরে গিয়েছে। গিয়ে কোনো লাভ নেই বাছা। তুমি যেয়ো না।'

সর্দারের সাহসী ছেলে রাজার কথা বিশ্বাস করতে পারল না। তাই কি কখনও হয়? বাবা-মা মরে গিয়েছে? তা কেমন করে হবে? এই তো সেদিন এলাম তাদের ছেড়ে! না, যেতে হবেই। ছেলে তৈরি হয়ে নিল। সে তার অস্ত্রগুলো সঙ্গে নিল। রাজাকে প্রণাম জানাল। বৌয়ের হাত ধরে একটু তাকিয়ে রইল, বেরিয়ে পড়ল প্রাসাদ থেকে।

রাজা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, বৌয়ের বুক ভিজে গেল।

সোনালী সুতোর পথ ধরে ছেলে পেছন-পানে চলল। যে পথ দিয়ে সে অমর রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছিল, সেই পথ ধরে চলল। আবার অবিরাম চলা।

সে এল আঙুরের ক্ষেতে। ছোট আঙুরের গাছ ছড়িয়ে পড়েছে। পাহাড় পেরিয়ে গিয়েছে, কোথায় তার শেষ কেউ জানে না। আঙুর গাছ তাকে চিনতে পেরে বলল, 'ওগো সাহসী ছেলে, আমার ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো। তুমি বড় ক্লান্ত।'

'আঙুর গাছ, তোমার কথা রাখতে পারছি না। কিছু মনে করো না। আমার সময় নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছতে হবে।'

এগিয়ে গেল ছেলে। পৌঁছল ওক গাছের নিচে। ওক গাছ তাকে চিনতে পারল, 'সাহসী ছেলে, অল্পক্ষণ জিরিয়ে নাও আমার ছায়ায়। তুমি আমার অনেক উপকার করেছিলে। সেদিনের কথা আমি ভুলিনি। যে ছোট্ট বীজকে তুমি সেদিন বাঁচিয়েছিলে, সেই আমি আজ এত বড় হয়েছি। অনেক কাল কেটে গিয়েছে।'

সর্দারের ছেলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওক গাছের দিকে। সেই ছোট্ট বীজ আজ এত বড় হয়েছে? এই তো সেদিন আমার দেহের চাপে ওর অঙ্কুর বেরুল। এত সময় পেরিয়ে গিয়েছে? বিশ্বাস করতে পারছে না সে। ভাবতে ভাবতে ছেলে এগিয়ে গেল।

শেষকালে পৌঁছল সেই জায়গায় যেখানে সে সোনালী সুতোর বল পেয়েছিল। সেইখানেই সে সেই সাপটাকে দেখতে পেল। একি? সাপটা বুড়ো অথর্ব হয়ে পড়েছে। তার বিশাল দেহ শুকিয়ে ছোট হয়ে গিয়েছে। তবু সে চিনতে পারল ছেলেকে, খুব খুশি হল। মাথা নেড়ে বলল, 'আমি বুড়ো হয়েছি, তবুও তোমায় গিলতে গিয়েছিলাম। যেই তুমি অভিবাদন জানালে, তক্ষুনি তোমায় চিনতে পারলাম। ভালো আছ তো?'

প্রাসাদে ঢুকল ছেলে। বুড়ো বসে রয়েছে। তার দাড়ি বরফের মতো সাদা, বিরাট লম্বা। শোবার সময় দাড়িকে ভাগ করে এক গুচ্ছের ওপরে সে শুয়ে পড়ে, অন্য গুচ্ছ গায়ে চাপা দেয়। তাহলে অনেক অনেক বছর পেরিয়ে গিয়েছে। ছেলে বুড়োকে দেখে ভাবছে। বুড়ো কোঁচকানো মুখে চোখের ভারি পাতা তুলে বলল, 'তোমায় ঠিক চিনেছি ছেলে।

যদি আবার এপথ দিয়ে কখনও যাও, যেমন করে পার আমার সঙ্গে দেখা করো. ভুলো না।'

বুড়োর কাছে বিদায় নিয়ে ছেলে আরও এগিয়ে গেল। তার গাঁয়ের বাড়ি আর বেশি দূর নয়। সে পৌঁছে গেল সন্ন্যাসীর কুড়েঘরের কাছে। কিন্তু কুড়েঘর নেই, সন্ন্যাসী নেই। ঘন জঙ্গলে ভরে উঠেছে সেই জায়গা। এত ঘন জঙ্গল যে তার ভয় হল, এখুনি হয়তো নেকড়ে বেরিয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

কুড়েঘরের জায়গায় এত ঘন জঙ্গল দেখে এবার সত্যিই ছেলের বুক কেঁপে উঠল। মুখেচোখে কালো মেঘ। সত্যিই তাহলে বহু কাল কেটে গিয়েছে! এত ঘন জঙ্গল হতে তো অনেক দিন সময় লাগে। তাহলে বাবা-মা বেঁচে নেই? সে ঠিক করে ফেলল, না ফিরেই যাই বৌয়ের কাছে।

তবু ফিরে যেতে পারল না। বাবা-মা তাকে টানছে, তার গ্রাম তাকে টানছে। সেই বুড়ির কথা মনে পড়ল। সে এগিয়ে চলল। শেষকালে নিজের ছেড়ে-আসা গ্রামে পৌঁছল। সে এদিকে-ওদিকে চাইল, কাউকে দেখতে পেল না। এক বিশাল ধ্বংসস্তূপ দেখতে পেল। অনুমানে বুঝল, এই তার সর্দার-বাবার মাটির প্রাসাদ।

ফোকরের মধ্যে দিয়ে সে একটা কুড়েঘর দেখতে পেল। তার মধ্যে বসে রয়েছে এক বুড়ো, তার বয়স তিনশো বছর। বুড়ো বলল, 'হ্যাঁ, আমি আমার ঠাকুরদার কাছে শুনেছি, এখানে এক সর্দারের প্রাসাদ ছিল, আমি সে সর্দারকে চোখে দেখিনি। শুনেছিলাম, তার একটা দুষ্টু ছেলে ছিল। সে বেরিয়ে পড়েছিল বিশাল পৃথিবীতে, সে যেতে চেয়েছিল অমর রাজ্যে, যেখানে মৃত্যু নেই, যেখানে মানুষের বয়েস বাড়ে না, যেখানে অনন্ত সুখ। আমি শুনেছি এসব কথা। তারপরে গাঁয়ে মহামারী লাগল। সব মানুষ মরে গেল। সব পশুপাখি। এসব আমার শোনা কথা।'

সর্দারের ছেলে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। অমর রাজ্যের রাজার কথা মনে পড়ল। তাহলে সব কথাই সত্যি। চোখের জল মুছে ছেলে ফিরে চলল। অনেক পথ পেরিয়ে সে অমর রাজ্যের সিংহদ্বারে পৌঁছল। অবাক হল সে। দ্বারের সামনে মাটির পাহাড় জমেছে। পা দিয়ে লাথি মেরে সে মাটি সরাতে লাগল। পাগলের মতো লাথি মারছে, মাটি এধার-ওধার ছিটকে পড়ছে। বেরিয়ে পড়ছে দরজার সামনের চৌকাঠ।

হঠাৎ মাটির ফাঁক থেকে মৃত্যু বেরিয়ে এল, তার সারা দেহ কালো পোশাকে ঢাকা। মৃত্যু খুব রোগা, দেহ হাড় জির্‌জিরে। তার কাঁধে একটা কাস্তে।

ছেলে মৃত্যুব দিকে তাকিয়ে ভাবল, 'তাহলে আমার সব শেষ হল আজ। চবম মুহূর্ত। মৃতু সামনে দাঁড়িয়ে।'

মৃত্যু খ্যান্‌খেনে গলায় বলল, 'তাহলে. শেষ পর্যন্ত তুমি এলে। কতকাল তোমাব জন্য এখানে বসে বয়েছি।'

এক মুহূর্ত চিন্তা কবে নিল ছেলে। মৃত্যু তার দিকে চেয়ে হাসছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো ঘুবে দাঁড়াল ছেলে। প্রচণ্ড বেগে হাওয়ার গতিতে দৌড় দিল উল্‌টো মুখে।

পৌছে গেল বুড়ো রাজাব প্রাসাদে। আর দৌড়তে পারছে না। সে সাপকে অভিবাদন জানাল, খুব খুশি হয়ে সাপ মাথা সবিয়ে নিল, ছেলে প্রাসাদে ঢুকে পড়ল। ক্লান্ত দেহে হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলে বলল, 'ওগো বুড়ো মানুষ, আমাকে বাঁচাও। আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ো না। আমাকে বল কি করতে হবে। মৃত্যু আমাকে ধাওয়া করেছে।'

বুড়ো তখুনি তাকে পশমেব একটা কটিবন্ধ দিল। বলল, 'এই নাও, মৃত্যুকে এই পশমেয় কটিবন্ধ দাও। তাকে বল, যতক্ষণ সুতো থাকবে ততক্ষণ সে যেন এটা কোমরে জড়াতে থাকে। এই পশমের সুতো শেষ হলেই সে শুধু তোমার কাছে আসতে পারবে।'

মৃত্যু এসে পড়েছে সাপেব সামনে। কাস্তে তুলে মৃত্যু সাপকে টুক্‌রো করে কাটতে গেল। বিরাট হাঁ করল সাপ, তার জিব আগুনের মতো লাল। আগুন বেরুতে লাগল সাপের মুখ থেকে। মৃত্যু কাছে আসতে পারছে না। সাপ চেঁচিয়ে বলছে, 'নিষ্ঠুর মৃত্যু, তুমি থামো। এগিয়ো না। কেন মিছিমিছি মানুষের পেছনে ধাওয়া করো?'

'সে ভাবনা তোমার নয়। ওসব তুমি বুঝবে না। আমাকে প্রাসাদে ঢুকতে দাও।' মৃত্যু কাস্তে চালাচ্ছে।

'আমাকে তুমি অভিবাদন জানাও নি। তোমায় এক পা এগোতে দেব না। বাঁচতে চাও তো পালাও। কাছে এলে পুড়ে মরবে।'

সাপের মূর্তি দেখে, আগুনের হল্‌কায় ভয় পেয়ে মৃত্যু কিছু দূরে সরে গিয়ে চেঁচাতে লাগল. 'প্রাসাদের বুড়ো মানুষ, সর্দারের ছেলেকে বের করে

দাও। নইলে একটা একটা করে তোমার দাড়ি উপড়ে ফেলব।'

এমন সময় পশমের কটিবন্ধ হাতে নিয়ে সর্দারের ছেলে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল, 'মৃত্যু, এই কটিবন্ধ নাও, এটাকে কোমরে জড়াও, যখন পশমের সব সুতো জড়ানো শেষ হবে, তখন আমার কাছে এস।'

মৃত্যু কটিবন্ধ নিয়ে কোমরে জড়াতে লাগল। দৌড় দিল ছেলে, তীরের বেগে। পৌঁছে গেল ওক গাছের নিচে। ওক গাছ বলল, 'আবার এসেছ তুমি, খুব ভালো লাগছে আমার। আমার ছায়ায় একটু জিরিয়ে নাও।'

'বন্ধু, সে সময় আমার নেই। মৃত্যু আমার পেছনে ধাওয়া করেছে।'

ওক গাছ কেঁপে উঠল, দুঃখ পেল। বলল, 'মৃত্যু যখন তোমার কাছে আসবে, তাকে এই লোহার ছড়িটা দেবে। বলবে, এই ছড়ি নিয়ে তুমি ঘুরে বেড়াও, নিচ থেকে এর হাতল পর্যন্ত যখন ক্ষয়ে যাবে তখন আসবে আমার কাছে।'

ওক গাছকে বিদায় জানিয়ে ছেলে দৌড় শুরু করল। মৃত্যু তার পিছনে। পথ ছেড়ে দিয়ে ছেলে মাঠঘাট পেরিয়ে, নদী পেরিয়ে ছুটছে। কোনো জ্ঞান নেই তার। হঠাৎ মৃত্যু একদিন তার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'অনেক ছুটেছ সাহসী ছেলে, এবার থামো। তোমার দিন শেষ।'

'বেশ, দিন যদি শেষ হয়েই থাকে ভয় পাই না। কিন্তু তার আগে এই লোহার ছড়িটা নাও, এই ছড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াও। নিচ থেকে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যখন হাতল পর্যন্ত ক্ষয়ে যাবে তখন এসো আমার কাছে।'

মৃত্যু লোহার ছড়ি নিয়ে চলে গেল। মাটিতে ঠুকে ঠুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেশি বেশি করে ঘুরছে, যাতে ছড়ি তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়।

মুক্ত হয়ে ছেলে আবার দৌড় দিল। তার যেন ডানা বেরিয়েছে, সে যেন হাওয়ায় ভেসে দৌড়চ্ছে। পৌঁছে গেল আঙুর ক্ষেতের কাছে। দূর থেকে তাকে চিনতে পেরেই আঙুর গাছ বলে উঠল, 'সাবাস বন্ধু, আবার দেখা হল। অনেক আঙুর পেকেছে। ছায়ায় বসে বিশ্রাম করো, আঙুর খাও, ক্লান্তি দূর করো।'

'খুব ইচ্ছে করছে তোমার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করি। কিন্তু উপায় নেই। অনেক পথ চলতে হবে, আমার চলার পথ আঁকাবাঁকা হয়ে উঠছে। সময় কোথায় বন্ধু! মৃত্যু আমার পেছনে ধাওয়া করেছে।'

'তাই বুঝি? তা অত ভাবনা কিসের? দেখি তোমার জন্য কি করতে পারি।'

'বন্ধু, আর কিছু চাই না, শুধু তুমি আমায় বলে দাও কেমন করে নিষ্ঠুর মৃত্যুকে ঠেকাব। কি করলে মৃত্যু আমায় স্পর্শ করতে পারবে না? এটা বলে দাও।'

'যদি সত্যিসত্যি মৃত্যু তোমার এত কাছে এসে থাকে, তুমি তাকে তোমার তববারি দিয়ে বলবে, এই তরবারি যখন মরচে পড়ে পড়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন তুমি আসবে আমার কাছে।'

'তুমি ভালো থেকো আঙুর গাছ, আমি তাই করব। মৃত্যু এলে তার পায়ের ওপরে আমার তববারি ফেলে দেব। বিদায় বন্ধু।'

আবাব মাঠঘাট পেরিয়ে ছেলে ছুটে চলল। চলছে. চলছে। হটাৎ মৃত্যু একদিন তাব সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'এবার থামো সর্দাবের ছেলে. তোমার দিন ফুরিয়েছে।

'বেশ, তাতে আমি ভয়·পাই না। শেষবারের মতো তোমায় একটা জিনিস দেব, শেষবারের মতো। এই তরবারি আমি কোনোদিন কাছছাড়া করিনি। তবু তোমায় দিলাম আমার এই প্রিয়তম বস্তু। মরচে পড়ে পড়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে এটা যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন এসো আমার কাছে। তখন আর কোনো অনুরোধ জানাব না। আর যদি এটা ক্ষয়ে না যায়, আমার পেছনে এসো না, আমি অমর রাজ্যে পৌঁছে যাব।'

ছেলে তার প্রিয়তম তরবারি ফেলে দিল মৃত্যুর পায়ের ওপরে। আবার চলল এগিয়ে, বায়ুবেগে। তরবারিতে মরচে ধরল, ক্ষয়ে গেল, কিছুই বাকি রইল না। মৃত্যু ছুটে আসছে তার পেছনে, ধনুকের ছিলা থেকে ছাড়া-পাওয়া তীরের মতো।

কিন্তু ছেলে পৌঁছে গিয়েছে প্রাসাদে, সিংহদ্বার খুলে গিয়েছে। ছোট মেয়ে ছুটে এল বরের কাছে। বরের একটা হাত ধরে ফেলল। কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে মৃত্যুও ঢুকে পড়েছে, তীরের বেগে মৃত্যু ছেলের একটা পা চেপে ধরল। বলল, 'থামো, তুমি এখন আমার। কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

ছোট রাজকুমারী কেঁপে কেঁপে বলে উঠল, 'না, ও তোমার নয়, ও আমার, শুধু আমার।'

'না, ছেলে আমার। আমি মৃত্যু, ওকে ছেড়ে দাও।'

মেয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলল, 'তাই যদি হয়, তবে আমি ছেলেকে একটা সোনার আপেল করে দেব, সোনার আপেলকে দূর আকাশে ছুড়ে দেব। যে তাকে ধরতে পারবে সে হবে তারই।'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে সর্দারের ছেলেকে সোনার আপেল করে দিল। আপেলটি হাতে নিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিল। আকাশের পথে যেতে যেতে দূর আকাশে মিলিয়ে গেল আপেল,—সে হল আকাশের ধ্রুবতারা।

এমন সময় রাজা ও অন্য দুই মেয়ে বেরিয়ে আসছে। তক্ষুনি তাবা বুঝে ফেলল কি হয়েছে। ছোট মেয়েকে তারা সোনার আপেল করে দিল, হাতে নিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিল। আপেলকে বলল, 'আকাশে যাও, ছেলেকে খুঁজে নিয়ে আবার ফিরে এসো প্রাসাদে। তখন মৃত্যু আর তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। সে অমর হয়ে রইবে।'

মেয়ে আপেল হয়ে আকাশের পথে যেতে যেতে দূর আকাশে মিলিযে গেল,—সে হল আকাশের শুকতারা।

মৃত্যু এইসব দেখে ভীষণ রেগে গেল। রাগে কাঁপতে লাগল। শেষকালে রাজা ও দুই মেয়ের ছায়াকে পদাঘাত করল, সঙ্গে সঙ্গে তারা তিনটি পাথরের স্তম্ভ হয়ে গেল।

সেদিন থেকে ধ্রুবতাবা আর শুকতারা আকাশে দেখা দিল, উজ্জ্বল হয়ে সেখানেই রয়ে গেল। আর আজও সেই দূর অমর রাজ্যের সিংহদ্বারের কাছে তিনটি পাথরের স্তম্ভ দেখতে পাবে। সেই থেকে সব প্রাসাদের সামনেই পাথরের স্তম্ভ থাকে।

বর-বৌ অমর হয়ে ধ্রুবতারা-শুকতারা হয়ে আকাশেই রয়ে গেল।

কাঠবেড়াল খুব কাজের লোক। এক মুহূর্ত সে চুপ করে বসে থাকে না। সবসময় কাজ করে। সেইসঙ্গে চট্‌পটেও খুব। শুধু যখন আব্‌ছা আঁধার ঘনিয়ে আসে, চোখে দেখতে পায় না,—তখনই ফিরে আসে গাছের কোটরের বাসায়। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে তার, তার ওপরে বুড়ো বাবা-মা রয়েছে। এতগুলো মুখে খাবার যোগাতে তাকে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়।

আকাশ ফুটো হয়ে গিয়েছে। শুধু জল পড়ছে। জমি নরম হয়েছে। পাথুরে জমিও শেষকালে নরম হল। কাঠবেড়ালের ছিল এককালি জমি। সময় নষ্ট না করে সে কাজে লেগে গেল। টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টির মধ্যেই জমিতে নেমে গেল। গায়ের লোম ভিজে উঠেছে, বারবার চোখ থেকে জল সরাতে হচ্ছে। খুব কষ্ট। তবু কাজের বিরাম নেই। কিন্তু একটা কাজ করতে সে ভুলে গেল। জমিতে যাওয়ার আলপথ সে তৈরি করেনি। সে সাদাসিধে মানুষ। বিপদ যে এদিক থেকে আসবে তা আঁচ করতে পারেনি। আর তাছাড়া অত ঘোরপ্যাঁচও সে বোঝে না। এই তো অল্প ফসল, এর জন্য আবার আলপথের কি দরকার! গাছে গাছে লাফিয়ে, এদিক-ওদিক তিড়িং-বিড়িং লাফিয়েই সে জমিতে পৌঁছে যায়।

সেই বনে এক গাছের বাসায় থাকত এক মাকড়সা। ভারি চালাক। ভীষণ দুষ্টুবুদ্ধি তার। বসে বসে খাওয়ার ফন্দি আঁটে। মোটেই খাটে না, খাটতে চায়ও না। এমনি একদিন সে খাবার খুঁজতে বেরিয়েছে। যেতে যেতে দেখে এক কালি জমিতে সবুজ ফসল ফলে আছে। সবুজ ফিকে হয়ে আসছে। ফসল পাকতে আর দেরি নেই। জমিটা ভালোভাবে দেখে মাকড়সা অন্য কোথাও চলে গেল।

কয়েকদিন কেটে গিয়েছে। মাকড়সা প্রতিদিনই এসে জমি দেখে যায়। লুকিয়ে লুকিয়ে। বাঃ, ফসল পেকে গিয়েছে। এবার ফসল কাটার সময়।

পরের দিন ভোরবেলা ছেলেমেয়ে নাতিপুতি নিয়ে মাকড়সা জমিতে চলে এল। সঙ্গে কয়েকটা ছোট ধামা। তারা এসেই আলপথ তৈরি করতে লেগে গেল। জাল দিয়ে পথ বানাল। জালের পথ হয়ে গেল। তারা

কুটুস্ কুটুস্ করে ফসলের গোড়া কাটতে লাগল। আঁটি বেঁধে জমির একপাশে জড়ো করে রাখল। আঁটি বাঁধছে আর জড়ো করছে।

জমির ফসল পেকে উঠছে। আগাছা আর বাছতে হচ্ছে না। তাই জমিতে কোনোই কাজ নেই। কাঠবেড়ালও দু-তিন দিন এদিকে আসে নি। আসার তো আর কোনো দরকার নেই! সেদিন জমিতে এসেই তার চোখ কপালে উঠে গেল। সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বুক কাঁপতে লাগল। তার সব পাকা সোনার ফসল মাকড়সা কেটে ফেলেছে, জমির পাশে জড়ো করে রেখেছে।

চোখ-ভর্তি জল নিয়ে কাঠবেড়াল বলল, 'বন্ধু, মাকড়সা, এ তুমি কি করছ? আমার জমির ফসল তুমি কাটছ কেন? কত কষ্টের ফসল আমার।'

মাকড়সা গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'তার মানে? এ জমি বুঝি তোমার? এ ফসল তুমি ফলিয়েছ? কেমন করে জমি চষলে?'

ভেতরে ভেতরে খুব রেগে উঠল কাঠবেড়াল। তবু রাগ চেপে নরম গলায় বলল, 'এ জমি আমার। আর ফসল ফলিয়েছি আমি নিজেই। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, আধপেটা খেয়ে। আজ এসেছি ফসল কাটতে। এ ফসল আমার নয়তো কার? এসব কি কথা বলছ তুমি?'

ফন্দিবাজ মাকড়সা। চট্ করে বলে বসল, 'বেশ, মেনে নিচ্ছি তোমার কথা। ভালো কথা। কিন্তু, এ জমি যদি তোমার হয়, এ ফসল যদি তোমার হয়, তবে জমিতে আসার আলপথ কোথায়?'

কাঠবেড়াল অবাক হয়ে বলল, 'আলপথ? আমার তো পথের দরকার হয় না। গাছে গাছে লাফিয়ে, তিড়িং-বিড়িং লাফিয়ে আমি সব জায়গায় যেতে পারি। এমনি করে জমিতেও পৌঁছে যাই। কি দরকার আমার পথের?'

মাকড়সা চোখদুটো আরও গোল করে ঠাট্টা করে বলল, 'বাঃ! বেশ মজার কথা শোনালে তো! জমি তোমার, সেই জমি তুমি চাষ করেছ, আর আলপথ বানাও নি? কে বিশ্বাস করবে তোমার কথা? কেউ কবে শুনেছে এমন কথা? তুমি আমাকে বোকা বানাবে? বাঃ! বাঃ! বেশ।

কাঠবেড়াল গো-বেচারী, সাদাসিধে মানুষ। অত মারপ্যাঁচ বোঝে না। কি আর করে? দৌড়ে গেল পশুদের কাছে। সব খুলে বলল। কেঁদেও ফেলল।

সর্দার পশুরা বলল, 'কাঠবেড়াল, এ তো ঠিক কথা নয়। এ তো বিশ্বাস করা যায় না। তুমি জমি চাষ করেছ অথচ আলপথ বানাও নি? এ কেমন করে হবে? আর মাকড়সা? সে জমি চাষ করেছে, তার নিজের মতো করে জালের পথও বানিয়েছে। সে পথ বানিয়ে জমি চাষ করেছে। ও ফসল মাকড়সার। তুমি আজকাল বড্ড মিছে কথা বলতে শিখেছ।'

হাই তুলছে সর্দার পশুরা। তাদের সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। গা চুলকোচ্ছে সর্দার পশুরা। তাদের থাবা-নখ দেখা যাচ্ছে। সেদিকে কয়েকবার তাকিয়ে কাঠবেড়াল ফিরে চলল। পথ দেখতে পারছে না। বন-পথ-আকাশ ঝাপ্‌সা লাগছে। চোখ-ভর্তি জল। ফিরে এল গাছের কোটরের বাসায়। সেখানে অনেকগুলো ক্ষুধার্ত মুখ তার পথ চেয়ে বসে রয়েছে। তার চোখ আরও লাল হয়ে উঠেছে। চোখের কোল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। এবার বোধহয় সবাইকে না খেয়েই মরতে হবে। বুক বুঝি ফেটে যাবে।

ওদিকে ফসলের পাহাড় বয়ে মাকড়সা চলেছে বাড়ির পথে। জালের পথ বেয়ে। খুব ছোটরাও ছোট্ট ছোট্ট আঁটি নিয়েছে। সার বেঁধে চলেছে তারা।

এমন সময় একটা দম্‌কা হাওয়া এল। পটাং করে ছিঁড়ে গেল জালের পথ। আঁটি সমেত মাকড়সারা ঝুপ করে পথের ওপরে পড়ে গেল। আচম্‌কা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এমন সময় নামল বৃষ্টি। ওরা তাড়াতাড়ি একটা শুকনো গাছের কোটরে ঢুকে পড়ল। আর একটুখানি পথ বাকি রয়েছে। এ বৃষ্টি আর কতক্ষণ। থেমে গেলেই ফসল তোলা যাবে গাছের বাসায়। সোনার ফসলে ভরে উঠবে গাছের কোটর। সারা বছর আর ভাবতে হবে না। বুদ্ধি থাকলে তেমন খাটতে হয় না। মাকড়সা ভাবছে, কার ফসল কে ঘরে তোলে। চোখে দুষ্টুমির হাসি।

শেষকালে বৃষ্টি ধরে এল। টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে। এতে অসুবিধে কিছু হবে না। মাকড়সা কোটর থেকে বেরিয়ে এল, পেছনে পেছনে আর সবাই। গুটিগুটি আসছে। কিন্তু এ কি? মাকড়সার চোখ যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসবে।

একটা মস্ত বড় বাজপাখি তার বিরাট দুটো ডানা দুপাশে মেলে ফসলের ওপরে বসে রয়েছে। বৃষ্টির জলে দেহের ডানা-পালক সব ভিজে কাল্‌চে হয়ে

উঠেছে। লাল চোখ জ্বলছে। বাজপাখি বৃষ্টি থেকে ফসল বাঁচাচ্ছে। ঠোঁটদুটো অল্প ফাঁক করা রয়েছে, বুক ওঠাপড়া করছে।

বাজপাখি বেজায় রাগী, ভীষণ হিংসুটে। গায়ের জোর খুব, ঠোঁটের ধার ভীষণ। চোখদুটো তার জ্বলছে। তবু ভয়ে ভয়ে মাকড়সা এল বাজপাখির সামনে। চোখের দিকে তাকিয়ে মাকড়সার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। কোনোরকমে চোখ নামিয়ে ঢোক গিলে বলল, 'প্রভু, আপনি খুব ভালো, খুব উপকারী। আমার ফসলগুলোকে কত কষ্টে বৃষ্টি থেকে বাঁচিয়েছেন।' গলা আটকে গেল মাকড়সার, আর কোনো শব্দ বেরুল না।

কর্কশ আওয়াজ হল। হাওয়ায় ধাক্কা খেয়ে আওয়াজ অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ল। মাকড়সা দু-পা পিছিয়ে এল। আকাশ থেকে বুঝি বাজ পড়ল। চোখ ঘুরিয়ে বাজপাখি বলল, 'কি? কি বললি? তোর ফসল? কে কবে শুনেছে,—নিজের জমির ফসল পথের মাঝে ফেলে রেখে কেউ চলে যায়? চালাকি করিস্ না আমার সঙ্গে। এক ঠোকরে তোর...। এ ফসল আমার। এক কুটোও পাবি না। আর একবার মুখ খুললে উবে যাবি।'

পেছন দিকে হাঁটতে লাগল মাকড়সা। চোখ রইল বাজপাখির দিকে। বেশ দূরে এসে সে থামল। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি! টুক্ করে বাজের মুখে ঢুকে যেতাম। খুব বাঁচা বেঁচেছি। ঢের হয়েছে, আর না।

পায়ের নখে ফসলের আঁটি চেপে ধরল বাজপাখি, ডানা মেলে দিল, ওপরে উঠল। তারপর হাওয়ায় ভেসে চলল। অনেক নিচ থেকে মাকড়সা দেখল,—বাজপাখি দূরে আরও দূরে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। ভাবল,—কার ফসল কে ঘরে তোলে।

ওদের বাড়িঘর সেই দূরের আকাশে। ওরা দুই বোন। একজনের নাম হাইনে-ওয়াই, সে বড় বোন। সে আকাশের আলো, সে বৃষ্টি নামায় পৃথিবীতে। ছোট বোন হাইনে-পুকোহু-রানগি, সে কুয়াশাকুমারী। আকাশে তেমন টলটলে জল নেই, কিন্তু ওরা দুজন চান করতে খুব ভালোবাসে। তাই প্রতিদিন ভোরবেলায় দুই বোন নেমে আসে পৃথিবীতে, টলটলে জলে চান করে। ভোরের বেলায় অল্প আলোয় আমরা যে কুয়াশা দেখি, আসলে তারা সেই দূর আকাশের দুই বোন, আলো-কুমারী আর কুয়াশাকুমারী।

এমনি করে দিন বয়ে যায়। কোনো বিপদ-আপদ ঘটে না। সূর্যের আলো একটু বেশি হলেই তারা আকাশ-পথে উড়ে যায়।

এখন হয়েছে কি, সেইখানে থাকত এক কিশোর। টলটলে জলধারার কাছে সে সকাল বেলায় ঘুরে বেড়াত। জলে মাছ কেমন খেলা করে, গাছের ফাঁকে পাখি কেমন বাসা বাঁধে, এসব সে দেখে বেড়াত। কিশোরের নাম উয়েনুকু। একদিন সে হঠাৎ দেখতে পেল, কুয়াশাকুমারী আর আলোকুমারী জলে চান করছে। কুয়াশাকুমারীকে দেখে সে আর চোখ ফেরাতে পারে না। এমন রূপ, এমন সুন্দরী। ঠিক করল, মেয়েকে সে বিয়ে করবে। মেয়েকে তার মনের কথা বলবে। ভাবছে, এমন সময় দুজনেই আকাশ-পথে মিলিয়ে গেল। অবাক হয়ে চেয়ে রইল উয়েনুকু।

এমনি করে দিন কাটে। সব দিন ভোরবেলায় ঝোপের আড়াল থেকে সে তাদের দেখে। পেছন ফিরে চান করছে ওরা, ডুবছে, ভাসছে, জলে ঢেউ তুলছে,—হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল উয়েনুকু। কিছু বুঝবার আগেই সে ধরে ফেলল কুয়াশাকুমারীকে। আলোকুমারী আকাশ-পথে মিলিয়ে গেল।

ধরা পড়ে কুয়াশাকুমারী কাঁদছে। কিশোর বলল, 'তুমি আমায় বিয়ে করবে? তুমি আমার বৌ হবে? তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না। করবে বিয়ে?'

অবাক হল কুয়াশাকুমারী। অবাক চোখে চেয়ে রইল। কিশোরকে তারও বড় ভালো লেগে গেল। সে রাজি হল। কিন্তু একটা শর্তে।

আকাশের মেয়ে তার বৌ হবে। কিন্তু সে দিনের বেলায় পৃথিবীতে বরের কাছে, বরের বাড়ি থাকবে না। সূর্য যখন অনেক নিচে নেমে যাবে, চারদিক যখন অঁাধার হয়ে আসবে, তখন দূর আকাশ থেকে নেমে আসবে আকাশী মেয়ে। সারারাত থাকবে। আবার সূর্য যখন নিচ থেকে ওপরে উঠবে, সেই আলো-হওয়া ভোরের একটু আগেই আবার সে চলে যাবে দূর আকাশে। আর একটা কথা, গাঁয়ের কাউকে তার কথা বলা চলবে না। কেউ তাকে দেখতে আসতে পারবে না। তার বৌয়ের কথা শুধু জানবে তার বর। তবে অনেক দিন নয়, তাদের যখন ফুটফুটে একটা ছেলে হবে তখন কিশোর সবাইকে বলতে পারবে আকাশী মেয়ের কথা, ছেলেকে কোলে নিয়ে কুয়াশাকুমারী তখন সবার সামনে আসবে। এই কথা ভুলে গেলেই আকাশের মেয়ে সেই যে দূরে চলে যাবে, আর ফিরবে না কোনোদিন।

উয়েন্নুকু মাথা নাড়ল, সে রাজি। এ মেয়েকে ছাড়া সে বাঁচবে কেমন করে? তাদের দুজনের বিয়ে হয়ে গেল। দুজনেই হাসছে।

এমনি করে দিন কাটে। সন্ধ্যের আঁধার নেমে এলেই আকাশের মেয়ে বরের ঘরে ঢুকে পড়ে। কেউ দেখতে পায় না। ভোরের আলো আবছা হয়ে ফুটলেই দিদি আলোকুমারী বরের দোরের কাছে এসে বোনকে ডাকে। বোন ফিরে যায় আকাশে, দিদির পাশেপাশে। ভালোভাবে ভোর হবার আগেই দুই বোন মিলিয়ে যায়।

এমনি করে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। সুখেই দিন কাটতে লাগল। তবু উয়েন্নুকুর মনে বড় দুঃখ। তার এমন সুন্দরী বৌ, অথচ সে কাউকে বৌয়ের কথা বলতে পারে না। গাঁয়ে কুয়াশাকুমারীর চেয়ে রূপসী মেয়ে আর একটাও নেই। অথচ সে কাউকে দেখাতে পারে না। গাঁয়ের কেউ আজ পর্যন্ত তার বৌকে দেখতে পেল না। নাঃ, এভাবে মন মানে না। সে সবাইকে তার বৌ দেখাবে। মনে মনে ঠিক করে ফেলল। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখিয়ে দেবে।

একদিন সন্ধ্যে হবার আগেই সে ঘরের সব ফাঁক-ফোকর ভালোভাবে বন্ধ করে দিল। দরজার ফাঁক, জানলার ফাঁক সব বন্ধ। সকালের আলো যাতে একটুও ঢুকতে না পারে। সব ব্যবস্থা করে সে নিশ্চিন্ত হল। সকাল হবে, বাইরে আলো ঝলমল করবে কিন্তু ভেতরে একেবারে অঁাধার। বৌ বুঝতেই পারবে না,—সকাল হয়েছে, আলো ফুটেছে। আঃ, বৌ

কেমন বোকা বনে যাবে। সবাই তখন বৌকে দেখতে পাবে, গাঁয়ের সবচেয়ে সুন্দরী বৌকে তারা দেখবে।

কুয়াশাকুমারী নেমে এল ঘরে। আঁধার ঘর। সে কিছুই বুঝতে পারল না। অন্য দিনের মতোই সবকিছু ঠিকঠাক আছে। রাতে কত গল্প, কত কথা, কত আনন্দ। শেষকালে আকাশী মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কিশোর কিন্তু ঘুমোতে পারল না, জেগে রইল সারারাত। ভোর হলেই গাঁয়ের লোক আসবে তার ঘরে। সব আগে থেকে বলা হয়ে গিয়েছে।

সূর্য ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। আবছা আলো পুব কোণে ফুটে উঠেছে। আকাশ থেকে নেমে এল দিদি আলোকুমারী। বোনকে ডাকল। কোনো ডাকই পৌঁছল না বোনের কানে। সব যে বন্ধ। অনেক, অনেকবার ডাকল দিদি, বোন তো আসছে না। কি আর করে সে। এদিকে আলোর তেজ বাড়ছে। দিদি আবার আকাশ-পথে চলে গেল।

সকাল হতেই গাঁয়ের মানুষজন চলে এসেছে কিশোরের বাড়িতে। খুব আগ্রহ তাদের, নতুন বৌ দেখবে। নতন বৌয়ের রূপের কত কথাই না তারা উয়েনুকুর কাছে শুনেছে। সেই গল্পের বৌ, রূপকথার বৌকে আজ তারা প্রথম দেখবে। দলের প্রথমেই রয়েছে গাঁয়ের অন্যসব বৌ।

উয়েনুকু বিছানা থেকে নেমে আস্তে আস্তে পাশের দরজা খুলছে। খুব সাবধানে। দরজা খুলে গেল। সকালের মিষ্টি রোদের আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। বাইরে দরজার সামনে অনেক মানুষজন। তারা উঁকি দিল। বৌয়ের চোখে আলো পড়ল, বৌ চমকে উঠল। উঠে বসল বিছানায়। অবাক চোখে চাইল,—দেখল উয়েনুকু দাঁড়িয়ে মিষ্টি চোখে হাসছে, দরজার ওপাশে অনেক অবাক-করা চোখ।

আকাশী মেয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল। দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মাঝখানে। মাথার খোলা চুল দেহ বেয়ে পায়ের কাছে পড়েছে। অপরূপ দেবীমূর্তি। সে এগিয়ে গেল দরজার সামনে। বেরিয়ে এল বাইরের উঠোনে। সবাই পথ করে দিল। উঠোন পেরিয়ে সে একটা ঘন গাছের নিচে এল। চোখে জল, ঠোঁট কাঁপছে। সে গান গেয়ে উঠল। বিদায়ের গান। মিষ্টি গলার করুণ গান। গাঁয়ের মানুষজন আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের বুকেও বেদনা, চোখ ভিজে উঠেছে। মেয়ের বিদায়ের গান শুনে। আকাশ থেকে ঘন কুয়াশা নেমে আসছে।

ঠিক গাছের ওপর থেকে। ঘন কুয়াশা নেমে এসে গাছের ওপরে থেমে গেল। মেয়ে তখনও গান গাইছে। গান শেষ হল। কুয়াশা আরও নিচে নেমে এল, মেয়েকে ঢেকে দিল। হঠাৎ কুয়াশার মেঘ ওপরে উঠতে লাগল। পাক খেতে খেতে কুয়াশা ওপরে উঠছে। মাঝখানে মেয়ে, কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না। একটু পরে কুয়াশা আকাশের সাদা মেঘে মিলিয়ে গেল।

উয়েনুকু কান্নায় ভেঙে পড়ল। এ কি হল তার? ছলনা করতে গিয়ে সে সবকিছু হারাল। গাছের নিচে আছড়ে পড়ল কিশোর।

কুয়াশকুমারী চিরকালের জন্য ফিরে গেল আকাশ-রাজ্যে। তার বর কথা রাখেনি। ছোট্ট ফুট্‌ফুটে ছেলে হবার আগেই সবাইকে বলে দিল। আকাশী মেয়ে আর কোনোদিন ফিরে আসেনি উয়েনুকুর ঘরে।

কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেল কিশোরের। মনেও খুব কষ্ট। সে এ কি করল? তাকে ছাড়া বাঁচবে কেমন করে। শেষকালে ভাবল, তাকে খুঁজে আনবই, তাকে খুঁজে পেলে ক্ষমা চাইব। একদিন এই পৃথিবীতে তাকে পেয়েছিলাম, আবার তাকে ফিরিয়ে আনব। মনে দুঃখ নিয়ে উয়েনুকু ঘর ছাড়ল, গাঁ ছাড়ল। সে পথে বের হল।

নদী পেরিয়ে, বন পেরিয়ে, পাহাড় পেরিয়ে কিশোর চলেছে। সমুদ্রের পাশে পাশে হেঁটে চলেছে। ক্লান্ত হয়, বিশ্রাম নেয়, আবার চলে। গাছের তলায় রাত কাটায়, সূর্য ঘুম থেকে জাগলে সে-ও জেগে ওঠে, পথ চলে। অবিরাম পথ চলা। কিন্তু কোথাও সে তার বৌকে খুঁজে পেল না। তবু খোঁজার বিরাম নেই। কোথায় তার গ্রাম, কোথায় তার জন্মভূমি,—সব ভুলে গেল সে। কোনদিকে তার ঘরবাড়ি, কিছুই আর মনে পড়ে না। মনে শুধু একটি ছবি, সে ছবি কুয়াশাকুমারীর।

বহু বছর কেটে গিয়েছে, তবু পথ চলায় ক্লান্তি নেই তার। বয়স তো থেমে থাকে না। শেষকালে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতেই কিশোর একদিন বুড়ো হল। তার সব চুলদাড়ি পেকে কুয়াশার মতো সাদা হয়ে গেল। এখনও সে খুঁজে পায় নি কুয়াশাকুমারীকে।

দেহ আর চলে না, দেহ কাঁপে,, চোখে ঝাপ্‌সা অন্ধকার। দূরের জিনিস ভালোভাবে ঠাওর হয় না। এক ঘন গাছের নিচে বসে পড়ল বুড়ো উয়েনুকু। মাথার তলায় হাত দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু দূরে বিশাল সমুদ্র। হাওয়া বইছে এলোমেলো। উয়েনুকু চোখ বন্ধ করল। সে

চোখ আর খুলল না। নিস্পন্দ পড়ে রইল তার দেহ,—গাছের নিচে ঘাসের ওপরে।

আকাশের ওপরে যেসব দেবতা থাকেন তারা সব দেখেছেন। বৌকে খুঁজতে কিশোর কি করেছে সব তারা জানেন। পৃথিবীর মানুষের মধ্যে এমন ভালোবাসা তারা আগে দেখেন নি। তারাও অবাক হয়েছেন। মৃত্যুর পরে তারা উয়েনুকুকে রামধনু করে আকাশে রেখে ছিলেন, সাতরঙা রামধনু। যে আকাশ থেকে কুয়াশাকুমারী নেমে এসেছিল, কিশোর সেখানেই রামধনু হয়ে রইল। আমরা আকাশে রামধনু দেখলেই বুঝতে পারি, আসলে এ হল আমাদের পৃথিবীর উয়েনুকু। সে একদিন বৌকে ঘরে তুলেছিল, আবাব চিরকালের জন্য তাকে হারিয়েছিল।

সেই সেদিন থেকেই সূর্য ওঠার সময়েই প্রভাতী আলো ছড়িয়ে পড়ে, আর বুড়ি পৃথিবীমায়ের বুক চিরে রূপসী কুয়াশাকুমারী দেখা দেয়। আস্তে আস্তে সে আকাশ-পথে এগিয়ে যায়। আর উয়েনুকু বামধনু হয়ে তখন থেকেই আকাশের এক দিক থেকে অন্য দিকে ছড়িয়ে পড়ে,—সে এখনও আকাশের চারপাশে আলো ফেলে কুয়াশাকুমারীকে খুঁজছে। উয়েনুকু এখনও বৌকে ভুলতে পারে নি।

বোকা স্বামী

অনেক অনেক কাল আগে এক গাঁয়ে থাকত একটা লোক। সে বেজায় বোকা। বোকা কিন্তু খুব ভালোমানুষ ছিল। সবার উপকার করত। তাই বোকা হলেও গাঁয়ের মানুষজন তাকে খুব ভালোবাসত। তার একটা নাম ছিল ঠিকই, কিন্তু সে নামে তাকে কেউ ডাকত না। তাকে ডাকত বোকা ছেলে বলে। এমনি ডাকতে ডাকতে একদিন সবাই তার আসল নাম ভুলেই গেল।

এমনি করে দিন যায়। বোকা ছেলের বয়স হল তিরিশ বছর। তবু তার বিয়ে হল না। কোন্ মেয়ে এমন বোকাকে বিয়ে করবে? শেষে কি না খেতে পেয়ে মরবে? বোকা বলে তার অবস্থাও ছিল খুব খারাপ। একটা নোংরা ছোট্ট কুঁড়েঘরে সে একা একাই থাকত।

কোনোরকমে দিন কেটে যায়। একদিন সন্ধ্যেবেলা বোকা কুঁড়ের মধ্যে বসে রয়েছে। মনে বড় কষ্ট। এমন সময় খোলা দরজা দিয়ে একটি মেয়ে কুঁড়েঘরে ঢুকল। পরমা সুন্দরী মেয়ে। বোকা তো কোনো-দিন এমন সুন্দরী মেয়ে দেখেই নি। সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'বড় বিপদে পড়েছি, এই রাত্তিরটা আমায় এখানে থাকতে দেবে? কালই চলে যাব।'

বোকা অবাক হয়ে গিয়েছে। সে খুশি মনে রাজি হয়ে গেল। তার মনে আজ খুব আনন্দ। এমন মেয়ে থাকতে চেয়েছে আর সে রাজি হবে না?

গভীর রাতে হঠাৎ মেয়েটি বলল, 'কত বড় আমাদের এই দ্বীপ, তবু তোমার আপনজন কেউ নেই দেখছি। আমারও কেউ নেই। বড় একা। তুমি কি আমায় বিয়ে করবে? তোমার বৌ করবে আমাকে? আর একা থাকতে হবে না।'

বোকা হাসিহাসি মুখে তখনই রাজি হয়ে গেল। তার যে এমন পরমা সুন্দরী রাজকন্যার মতো বৌ হবে সে ভাবতেই পারেনি। সে রাজি হবে না?

গাঁয়ের সবাই খুশি। বোকার শেষকালে বৌ জুটল। এমন সুন্দরী

গাঁয়ে আর ছিল না। মেয়েও খুব ভালো। হাসিখুশি, কাজেকর্মেও ভালো। সবাই ভাবল, বোকা এবার ভালোভাবে থাকতে পারবে।

সেই বৌকে বোকা এমন ভালোবেসে ফেলল যে সব সময় শুধু বৌয়ের চিন্তাই করে। বৌ ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না।

বোকা শক্ত ঘাসের জুতো তৈরি করছে। বাজারে বিক্রি করে টাকা আনবে। বৌ একটু দূরে রান্না করছে। হাতে কাজ করছে বোকা কিন্তু একমনে চেয়ে রয়েছে বৌয়ের মুখের দিকে। জুতো বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে,—তার খেয়ালই নেই। যখন খেয়াল হল, দেখল,—জুতো এত বড় হয়ে গিয়েছে যে কোনো মানুষের পায়ের মাপে লাগবে না। কে কিনবে অত বড় জুতো?

বর্ষা আসছে। মাঠে মাঠে ফসল বুনতে হবে। বৃষ্টির জন্য মাথা বাঁচাতে পাতার টোকা দরকার। বোকা টোকা বানাচ্ছে, বাজারে বিক্রি করবে। হাতে কাজ করছে, কিন্তু চেয়ে রয়েছে বৌয়ের মুখের দিকে। টোকা বোনায় মন নেই। টোকা বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে,—তার খেয়ালই নেই। যখন খেয়াল হল, দেখল,—টোকা এত বড় হয়েছে যে কেউ মাথায় পরতে পারবে না। এতবড় টোকা কিনবে কে?

বৌ স্বামীর কাজকর্ম দেখে আর ভাবে, হায়রে আমার বোকা স্বামী। মুখে কিছু বলে না, কিন্তু মনে মনে কষ্ট পায়।

শেষকালে বৌ ভাবল,—বাড়িতে বসে কাজ করে বলে অমন হয়। স্বামীকে এবার মাঠের কাজে পাঠাবে। বর্ষাকাল, ফসলের জমিতে কত বাড়তি লোক লাগে। স্বামীকে সে জমির কাজে মাঠে পাঠাল। ভাবল, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্বামী মাঠে কাজ করছে। বেশিক্ষণ হয়নি। হঠাৎ বোকার মনে হল,—বাড়িতে বৌ ঠিক আছে তো? যদি কিছু হয়? মাঠের কাজ ফেলে ছুটে এল বাড়িতে। বৌকে দেখেটেখে আবার গেল মাঠে। আবার কিছুক্ষণ কাটল। আবার মন ছট্‌ফট্‌ করে উঠল। আবার ফিরে এল বাড়িতে।

এমনি করে দিনের মধ্যে বারবার সে কাজ ছেড়ে বাড়িতে ছুটে আসে। জমির মালিক রেগে যায়। কাজও তেমন হয় না। এমন লোককে কাজে রেখে লাভ কি? তবু দয়া করে কাজ থেকে ছাড়ায় না। কিন্তু যা পাবার বোকা তার চেয়ে অনেক কম পায়।

বৌ ভাবে, এমন করলে তো সংসার চলবে না। পেট তো চালাতে হবে! অনেক ভেবে ভেবে সে এক বুদ্ধি করল। সেই গাঁয়ে ছিল একজন শিল্পী। সে লোকের মাটির বাড়ির দেয়ালে পশুপাখি-গাছপালার ছবি আঁকত। সুন্দর ছবি। ছবি এঁকেই তার পেট চলত। বৌ একদিন তাকে বাড়িতে ডেকে আনল। মিষ্টি করে বলল, 'তুমি তো খুব ভালো ছবি আঁকতে পার। শুকনো পাতায় আমার ছবি এঁকে দাও।'

শিল্পী বলল, 'মানুষের ছবি কখনও আঁকি নি। দেখি চেষ্টা করে। ভালো না হলে মন খারাপ করবে না।'

সুন্দর ছবি হল। ঠিক বৌয়ের চেহারার মতো। বৌ খুব খুশি।

পরের দিন সকালে বৌ বোকার হাতে সেই ছবি দিয়ে বলল, 'এই ছবি ঠিক আমার মতো দেখতে। এই ছবি তুমি জমির পাশে তুঁতগাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখবে। কাজ করতে করতে মাঝে-মাঝে দেখবে। যতবার খুশি দেখবে আর মন দিয়ে কাজ কববে। ছুটে ছুটে বাড়ি আসবে না। আমি ডালে তোমার চোখের সামনেই থাকব।'

বোকা ছবি নিয়ে তুঁতগাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়। সারাদিন কাজ করে, বারবার ছবিতে বৌকে দেখে। খুব খুশি সে। কাজও ভালো হচ্ছে। সন্ধ্যেবেলা ছবি খুলে বাড়িতে নিয়ে আসে। বৌ নিশ্চিন্ত হল। সংসার ভালোই চলছে।

এখন হয়েছে কি, একদিন ভর দুপুরে হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া উঠল। ছবি পত্‌পত্‌ করে ডালের এপাশ-ওপাশ দুলছে। হঠাৎ ডাল থেকে খুলে পড়ল ছবি, হাওয়ার মুখে কোথায় উড়ে গেল সেই ছবি। কিছুটা দৌড়ে গেল বোকা, কিন্তু ছবি অনেক আগেই তার হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল। জলভরা চোখে বোকা বাড়ি ফিরে এল। বাড়িতে ঢুকেই সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। বৌ তাকে শান্ত করে বুঝিয়ে বলল. 'ঠিক আছে, আমি আর একটা ছবি আঁকিয়ে নেব। ভাবনার কি আছে?'

এদিকে হয়েছে কি, হাওয়ার বেগে বৌয়ের ছবি এদিকে-ওদিকে উড়তে উড়তে শেষকালে গিয়ে পড়ল এক বাগানে। বাগানটা ছিল ঐ এলাকার সর্দারের। সর্দার বাগানে কাজ করছে, হঠাৎ ছবিটা দেখতে পেল। ছবি দেখেই সর্দার ঠিক করল,—এই মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। যার ছবি এত সুন্দর, সে নিশ্চয়ই আরও সুন্দরী।

সঙ্গে সঙ্গে সে তার অনুচরকে ডাকল। বলল, 'এই মেয়ে কোথায় আছে খুঁজে দেখ। দেখতে পেলেই নিয়ে আসবে। এ আমার বৌ হবে। সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যাও।'

পিঠে-কোমরে অস্ত্র ঝুলিয়ে অনুচর রওনা দিল। পোশাকের মধ্যে বৌয়ের ছবি। গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মেয়ের খোঁজ নিতে লাগল। যে গ্রামে যায় সেখানকার লোককে ছবি দেখিয়ে বলে, 'এই মেয়ে কি তোমাদের গাঁয়ের?' না, তারা এরকম মেয়েকে চেনে না। অনুচর আবার যায় অন্য গাঁয়ে।

শেষকালে অনুচব পৌঁছল বোকার গাঁয়ে। ছবি দেখিয়ে সে একজনকে বলল, 'এই ছবির মেয়ে কি তোমাদেব গাঁয়ের?'

গাঁয়ের মানুষ বলল, 'হ্যাঁ, এই মেয়ে আমাদের গাঁয়ের। বোকার বৌ। ঐ যে তার বাড়ি।'

অনুচর বোকার বাডি গিয়ে দেখে, হ্যাঁ ছবির মেয়ে এই মেয়েই বটে। সে তখন বলল, 'আমাদের সর্দার তোমায় বিয়ে করতে চায়। এক্ষুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে। না গেলে...।'

বোকা অনুচরেব পায়ের ওপরে কেঁদে পডল, 'আমার আর কেউ নেই, তুমি ওকে নিয়ে যেও না। দয়া কর।'

কে শোনে কার কথা। কার কান্না কে বোঝে। বোকার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে, বৌয়ের দুচোখে ঝরনা। বৌ স্বামীকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে বলল, 'সর্দার যখন বলেছে, ওগো, কেঁদেকেটে কোনো লাভ নেই। আমাকে নিয়ে যাবেই। ওরা এরকমই। শোনো, বছরের শেষ দিনে অনেক দেবদারু পাতা মাথায় নিয়ে তুমি সর্দারের প্রাসাদে বিক্রি করতে যাবে। নতুন বছরে পরবের সময় সাজাবার জন্য সবাই দেবদারু পাতা কেনে। তুমি যাবে তখন, আমরা আবার একসঙ্গে থাকতে পারব। তুমি ভুলে যেও না।'

অনুচর চিৎকার করে ডাকছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে। বৌ বেরিয়ে এল, পেছনে বোকা। অনেক গ্রামবাসীর চোখের সামনে সর্দারের অনুচর বৌকে নিয়ে চলে গেল। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বোকা হাউ হাউ করে কাঁদছে, অন্যদের চোখেও জল। বৌ বাঁকের পথে মিলিয়ে গেল। বোকা আছড়ে পড়ল মাটিতে।

বছর ঘুরে গেল। আজ এ বছরের শেষ দিন। বোকা গাছে গাছে উঠে

সুন্দর কচি কচি দেবদারু পাতা পাড়ল। একসঙ্গে বেঁধে মাথায় তুলে রওনা দিল। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছল সেই সর্দারের প্রাসাদের সামনে।

প্রাসাদের মধ্যে বৌ তখন বসে রয়েছে সর্দারের পাশে। সর্দার মদ খাচ্ছে, বৌ দেখছে। হঠাৎ বাইরে থেকে শোনা গেল, 'দেবদারু পাতা নেবে? কাল নতুন বছরের পরব। কচি দেবদারু পাতা। দরজা সাজাবে, বাড়ি সাজাবে। দেবদারু পাতা নেবে?'

বৌ হেসে উঠল। অপরূপ মিষ্টি হাসি। সকালের শিশিরের মতো মুক্তো-ঝরানো হাসি। সাদা ফসলের মতো হাসি। সর্দার মদ খাওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল বৌয়ের দিকে। আজ এক বছর হল বৌ এসেছে এই বাড়িতে। একদিনও হাসে নি, একদিনও হাসিমুখে কথা বলেনি। আর আজ? সর্দার তক্ষুনি অনুচরকে আদেশ দিল, 'নিয়ে এসো ওকে। ওর সব পাতা কিনে নেব।'

মাথায় বোঝা চাপিয়ে বোকা ঢুকল প্রাসাদে। তাকে দেখে বৌ হেসে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। কি সুন্দর হাসি। বৌকে বড় সুন্দর লাগছে আজ।

সর্দারের আনন্দ দেখে কে? আনন্দে গলে গিয়ে সর্দার বলল, 'বৌ, দেবদারুর পাতা বিক্রিওয়ালাকে দেখে তোমার এত হাসি, তাহলে আমিও ঐরকম বিক্রিওয়ালা হতে রাজি আছি। তাহলে তোমার আরও আনন্দ হবে, আরও হাসি ঝরবে। তাই না?'

বৌ কিন্তু কিছুই বলছে না। আরও মিষ্টি করে হাসছে। আরও সুন্দরী লাগছে তাকে।

সর্দার তখন আনন্দে নাচছে। হঠাৎ সে বোকার মাথা থেকে বোঝা নামিয়ে ফেলল। নিজের ঝলমলে পোশাক বোকাকে পরিয়ে দিল। বোকার ছেঁড়া নোংরা পোশাক নিজে পরে নিল। বৌ আরও হাসছে। সর্দার আরও খুশি। সর্দার দেবদারু পাতার বোঝা মাথায় তুলে নিল। নাচতে নাচতে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'চাই দেবদারু পাতা! কালকে নতুন বছরের পরব।'

এই না দেখে বৌ আরও জোরে হেসে উঠল। আগের চেয়ে অনেক বেশি হাসি। হাসির শব্দে আরও খুশি হয়ে সর্দার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাগান পেরিয়ে পথে নামল। পথে চলতে চলতে সে হেঁকে চলেছে, 'চাই

দেবদারু পাতা, কচি কচি পাতা। কালকে নতুন বছরের—।'

শব্দ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। বৌ হাসি থামিয়ে দিল। গম্ভীর হয়ে অনুচরকে আদেশ দিল, 'বাইরের দরজা বন্ধ করে দাও। খুলবে না, কাউকে ঢুকতে দেবে না। আমার আদেশ।'

কাঠের বিশাল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এল সর্দার। দরজা বন্ধ দেখে অবাক হল। বারবার ধাক্কা মারল। দরজা খুলল না, ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। চিৎকার করে বলতে লাগল, 'প্রাসাদের সর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সর্দার। দরজা খোল।' কোনো সাড়াশব্দ নেই। দরজা বন্ধই রইল।

প্রাসাদের মধ্যে বোকা আর তার পরমা সুন্দরী বৌ সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল। কত চাকর বাকর, কত অনুচর, কত ধনদৌলত। কোনো অভাব নেই।

সাগরকন্যা ও আকাশের চাঁদ

অনেক অনেক কাল আগে আমাদের এই সুন্দর দ্বীপে এক রাজা ছিল। বড় ভালো রাজা। রাজা সবার সুখ-দুঃখের খবর নিত। তার সভায় ছিল এক যাদুকর। রাজা সব সময় তার কথা মেনে চলত।

এখন হয়েছে কি, এক মহা বিপত্তি। দ্বীপের জেলেরা এসে কেঁদে পড়ল রাজার পায়ে। রাজা মন দিয়ে সব শুনল আর জেলেদের বাড়ি ফিরে যেতে বলল।

রাজা যাদুকরকে ডেকে বলল, 'অবাক হবার মতো কথা বটে। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। জেলেরা ডিঙি করে অনেক দূরে যায়। ছিপ নামিয়ে দেয় জলে। একই জায়গায় ওরা যায়। কেননা, বহুকাল থেকে ওখানেই ওরা মাছ ধরে। ঐ পাহাড়ের কোলে। ছিপে টান পড়ে না, বড়শীতে মাছ ঠোকরাচ্ছে তাও মনে হয় না। কিন্তু ছিপ তুললেই দেখা যায়, বড়শীর ওপর থেকে সুতো কাটা। বারবার এমন হচ্ছে। মাছও পাওয়া যাচ্ছে না, বড়শীও উধাও হচ্ছে। গরিব মানুষ অত বড়শী পাবে কোথায়? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কিছু উপায় বের কর।' রাজা বেশ চিন্তিত।

যাদুকর হেসে বলল, 'ও, এই ব্যাপার। বুঝেছি। সাগরের অনেক নিচে এক রাজ্য রয়েছে। সেই রাজ্যের নাম লালো-নানা। সেখানে থাকে এক বোন আর দুই ভাই। তারা অপরূপ সুন্দর। এমন রূপ মানুষের হয় না। জেলেরা নিশ্চয়ই লালো-নানা রাজ্যের ওপরে মাছ ধরতে গিয়েছিল।'

অন্য সব কথা রাজা ভুলে গেল। বলল, 'আমি ওদের দেখব। ওরা কেমন তা তোমায় দেখাতেই হবে। যাদুকর, তুমি ওদের নিয়ে এসো।'

যাদুকর বলল, 'তা পারি। চেষ্টা করব। তবে ভাই দুজন তো এখন সাগররাজ্যে নেই। তারা দূর দূর সাগরে বেড়াতে গিয়েছে। শুধু রয়েছে বোন। দেখি চেষ্টা করে বোনকে তীরে আনতে পারি কিনা।'

কয়েক দিন কয়েক রাত কেটে গেল। হঠাৎ একদিন রাতে [illegible] আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজ আরও জোরে হচ্ছে। যেন [illegible] লড়াই বেধেছে। [illegible]

সমুদ্রে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রের গর্জনকেও ছাড়িয়ে গেল।

আওয়াজ পৌঁছল নানা-নানা রাজ্যে। ঘুমিয়ে ছিল সাগরকন্যা হিনা। তার ঘুম গেল ভেঙে। সে জেগে উঠল। অপরূপ সুন্দরী সাগরকন্যা ঝিনুকের মতো চোখ মেলে জেগে উঠল। প্রবাল প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল হিনা, কিছুই বুঝতে পারল না। সাগর-ফুলের বাগানে এল, অসংখ্য রঙিন মাছ হিনার চার পাশে ভেসে ভেসে খেলে বেড়াচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারল না হিনা। এদিকে চাইছে ঝিনুক-চোখ, ওদিকে চাইছে ঝিনুক-চোখ। হঠাৎ সে দেখতে পেল,—মানুষের মতো দেখতে কি যেন সাগরের মাঝখানে ঝুলে রয়েছে। অবাক হয়ে গেল সে। আস্তে আস্তে ভেসে ভেসে সে এগিয়ে গেল। আরও কাছে, আরও কাছে। একেবারে কাছে গিয়ে দেখল, একটা কাঠের মূর্তি, মানুষের মূর্তি। কিন্তু এত সুন্দর কারুকাজ করা যে হিনা চোখ ফেরাতে পারছে না। তার গায়ে সুন্দর ঝল্‌মলে রাজার পোশাক। ঠিক যেন কোনো রাজপুত্র। মূর্তির মাথায় সুতো বাঁধা, সেই সুতোতে ঝুলছে কাঠের রাজপুত্র। নিশ্চয়ই ওপর থেকে কেউ মাছ ধরছে। কিন্তু এমন অদ্ভুত টোপ হিনা কোনোদিন দেখে নি।

সাদা মুক্তোর মত শরীর ভাসিয়ে হিনা সাঁতার দিল। সুতোর পথ ধরে ওপরে উঠতে লাগল। সাগরকন্যা দেখবে, কোন্ সেই জেলে যে এমনভাবে টোপ ফেলেছে। ওরা কেমন ধরনের ছিপ হাতে বড়শী ফেলেছে?

জলের ওপরে অল্প শব্দ হল। হিনা মাথা তুলেছে জলে। এলোমেলো ভেজা চুল কপাল বেয়ে মুখের ওপরে পড়েছে। মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে সে দেখল, এখানে-ওখানে অনেকগুলো ডিঙি জলে ভাসছে। ঢেউ-এর তালে তালে অল্প অল্প দুলছে। ভালোভাবে তাকিয়ে দেখল, ডিঙির সারি সাগরের তীর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। কি সুন্দর লাগছে জলের ওপরে ডিঙির সারি।

হিনা একটা ডিঙির কাছে গেল। মাথা উঁচিয়ে দেখল, তার ওপরে একটা কাঠের-মূর্তি। আর একটা ডিঙির কাছে গেল, আর একটা মূর্তি। সাগরকন্যা সাঁতরে চলেছে এক ডিঙি থেকে আরেক ডিঙিতে। সব ডিঙিতেই একই রকমের মূর্তি। ঠিক জলের তলার মূর্তিটার মতো। তখন তো আকাশে কোনো চাঁদ ছিল না, আকাশে শুধু ছিল তারা। সেই তারার আবছা আলোয় মূর্তিগুলোর পোশাক আর গায়ের গয়না দেখে মুগ্ধ হল হিনা। এমন সুন্দর জিনিস সে আগে কখনও দেখেনি। হিনা ভাবল,

কোনো এক যাদুকর বোধহয় দ্বীপের সব মানুষকে এমন কাঠের মূর্তি করে দিয়েছে। সব মানুষ প্রাণহীন কাঠ হয়ে গিয়েছে।

ডিঙির মূর্তি দেখতে দেখতে হিনা সাগরতীরে পৌঁছে গেল। চারিদিক শান্ত, প্রাণের কোনো সাড়া নেই। নারকেল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রইল হিনা। ভাবল,—কোনো মানুষ নেই দ্বীপে, তাহলে আর ভয় কি! একটু এগিয়ে সে আরও অবাক হল। নারকেল গাছের সারির মধ্যে মধ্যে সেই রকম মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সব কাঠের মূর্তি। তাহলে? তাহলে হিনা যা ভেবেছিল ঠিক তাই! সব মানুষ মূর্তি হয়ে গিয়েছে।

নারকেল গাছের সারির নিচ দিয়ে, ফুলফোটা বনের পাশ দিয়ে, আব্‌ছা আঁধারে সাগরকন্যা ভেসে চলেছে। চুলগুলো পেছনে দুলছে, যেন হাওয়ায় ভাসছে প্রবাল রাজ্যের মিষ্টি মেয়ে।

যেতে যেতে সে একটা ছোট বাড়ির সামনে এল। দোর বন্ধ। আল্‌তো করে হাত দিতেই দোর খুলে গেল। কেউ নেই ভেতরে। অনেকটা সাঁতার কেটেছে হিনা, অনেকটা পথ হেঁটেছে হিনা। ক্লান্ত সে। ধব্‌ধবে বিছানায় শুয়ে পড়ল সাগরকন্যা। ঘুমিয়ে পড়ল হিনা।

কখন ভোর হয়েছে। হিনা ঘুমিয়ে রয়েছে। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে চাইল। দেখল, দ্বীপের রাজা তার দিকে চেয়ে রয়েছে। ভয় পেল না হিনা, খুব ভালো লাগল। রাজার মুখে হাসি, মেয়ের চোখে মুক্তো-ঝরানো হাসি। রাজা দুহাত বাড়িয়ে মেয়েকে বসিয়ে দিল। মেয়ের চোখে সাগরজলের শান্তি।

রাজা বলল, 'তোমাকে আমি বিয়ে করব। তুমি হবে হাওয়াই দ্বীপের রানী।'

মেয়ে কোনো কথা বলল না। অল্প হেসে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, সে রানী হতে চায়। রাজা সাগরকন্যার গলায় পরিয়ে দিল মুক্তোর মালা, হাতে পরিয়ে দিল প্রবালের বালা।

অনেক দিন কেটে গেল। দ্বীপের অপরূপ শোভা আর সৌন্দর্যের মধ্যে তাদের দিন কাটে। সুখে শান্তিতে। দ্বীপের সবকিছুতেই মেয়ে অবাক হয় সবকিছুকেই সে ভালোবাসে।

এমনি করে দিন কাটে। একদিন মেয়ে বলল, 'তুমি আমায় অনেক দিয়েছ। সবচেয়ে ভালো জিনিস এই মুক্তোর মালা আর প্রবালের বালা।

আমি তোমায় কিছু দিই নি। এবার তোমায় একটা উপহার দেব'।

রাজা হেসে বলল, 'বেশ তো, দাও। কি উপহার তুমি দেবে?'

মেয়ে বলল, 'আমার প্রবাল রাজ্যে একজন ডুবুরি পাঠাও। সাগরের নিচে আমাদের প্রাসাদে সে একটা সুন্দর কাঠের বাক্স দেখতে পাবে। তার মধ্যে রয়েছে এক অমূল্য রত্ন। ডুবুরি সেই বাক্স নিয়ে আসবে। কিন্তু পথের মধ্যে সে যেন সেটা না খোলে। আমার হাতে দেবে। আমি আর আমার দুই ভাই বহু বছর ধরে সেই রত্ন রক্ষা করে এসেছি, পাহারা দিয়েছি।'

রাজা দ্বীপের সবচেয়ে ভালো ডুবুরিকে ডেকে সব বুঝিয়ে দিল। ডুবুরি মাথা নুইয়ে রাজাকে প্রণাম করে সাগরজলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ডুবুরি উঠে এল তীরে। তার হাতে কাঠের বাক্স। রাজা প্রাসাদে ফিরে গিয়ে হিনার হাতে তুলে দিল সেই রত্নভরা বাক্স। খোলা আকাশের নিচে প্রাসাদের বাগানে হিনা বসে রয়েছে। বাক্স হাতে নিয়ে হিনা রাজার দিকে চাইল। একটু মিষ্টি হেসে রানী বাক্সের ডালা খুলে ফেলল। চোখ-ধাঁধানো গোল মতন কি যেন বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। গোল-মতন রত্ন ওপরে উঠছে, আরও ওপরে। উঠতে উঠতে সে আকাশে গিয়ে থামল। সে হল চাঁদ। হাওয়াই দ্বীপের মাথায় চাঁদ আটকে গেল। আগে আকাশে ছিল শুধুই তারা, আজ থেকে আকাশে দেখা দিল চাঁদ। অনেক তারার মাঝে একটি চাঁদ। সাগরকন্যার রত্ন।

মেয়ে রাজার মুখের দিকে চেয়ে হাসছে, রাজা আকাশে সেই রত্ন দেখে হাসছে। হঠাৎ মেয়ে সাগরের দিকে চেয়ে চমকে উঠল। সর্বনাশ! চাঁদের প্রতিবিম্ব সাগরজলে! মেয়ের চোখের কোল বেয়ে মুক্তো ঝরে পড়ল। মেয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে রানী বলল, 'হায়! কি হবে? সাগরজলে আকাশের চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখে ভাইরা সব বুঝে ফেলবে। তারা জানবে, আমাদের রত্ন হারিয়ে গিয়েছে, রত্ন হাতছাড়া হয়ে আকাশে চলে গিয়েছে। দূর দূর সাগর থেকে একদিন তারা ফিরে আসবে, এসে দেখবে তাদের বোন প্রবাল রাজ্যে নেই। তারা বুঝবে, বোনই তাদের রত্ন নিয়ে গিয়েছে। তারা বন্যার দেহ নিয়ে আছড়ে পড়বে দ্বীপে। রেগে গিয়ে ভাসিয়ে দেবে আমাদের এই সুন্দর হাওয়াই দ্বীপ।' মেয়ে কেঁদেই চলেছে।

রাজা হেসে বলল, 'রানী, আমার হিনা, কোনো ভয় নেই তোমার।

আমাদের দ্বীপের ঐ ওদিকে রয়েছে মস্ত উঁচু পাহাড়। বন্যা যদি আছড়েই পড়ে, আমার সব লোকজন, পশু আর ধনরত্ন নিয়ে আমরা উঁচু পাহাড়ে উঠে যাব। ওখানে সাগরজল পৌছবে না। কোনো ভয় নেই তোমার।' তবু মেয়ে ভয়ে কাঁদছে।

পরের দিন দ্বীপের সবাই চলল উঁচু পাহাড়ে। পেছনে পেছনে বাড়ির সব পশু। ধনরত্নও সঙ্গেই নিল। সকলের সামনে হেঁটে চলেছে দ্বীপের রাজা আর রানী। তারা পৌছে গেল পাহাড়ে।

এমন সময়ে দূরে ঝড়ের শব্দ শোনা গেল। দূর সাগরের ঐ দিক থেকে শব্দ ভেসে আসছে। হঠাৎ দেখা গেল,—সমুদ্র সাদা হয়ে ফুলে উঠল, প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে আসছে সাগরের জলের ওপরের সেই সাদা মেঘ। আছড়ে পড়ল দ্বীপের ওপরে। ভেসে গেল বাড়িঘর, ডুবে গেল নারকেল বাগান। জল আছড়ে পড়ল পাহাড়ের নিচে।

হিনা পাহাডের ওপর থেকে দেখতে পেল, তার দুই ভাই সাগরফেনার ওপরে বসে রয়েছে, চিৎকার করে বোনকে ডাকছে। হিনা ভয়ে মুখ ঢেকে ফেলল।

সাগরজল নেমে গেল। ঝড়ের শব্দ থেমে গেল। রাজা রানী লোকজন নেমে এল পাহাড থেকে। সাগরজলের বন্যায় সব বাডিঘর পডে গিয়েছে, জমির সব ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে, দ্বীপের সবকিছু এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। দ্বীপ যেন কাঁদছে।

এত লোক, তাদের খাবার কিছু নেই। বাডিঘর তৈরি করতে সময় লাগবে, তারা রয়েছে আকাশের নিচে। কত আনন্দ ছিল, সব মানুষ গরিব হয়ে গেল। রাজারও একই অবস্থা।

রাজা ভাবল, হিনাই দোষী। তার জন্যই এসব হল। সে না থাকলে তো এমন দশা হত না। তখন থেকে রাজা হিনাকে ঘৃণা করতে লাগল। তাকে ভালোবাসে না, তার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলে না, রানীকে অবহেলা করে। এমন অলক্ষণে মেয়েকে কি আর রানী রাখা যায়। তাকে রাজা দাসী ভাবতে লাগল। সে হল রাজার দাসী।

রাজা হিনাকে সকাল থেকে খাটায়। রাত হলে হিনার কাজ শেষ হয়। সবচেয়ে কঠিন কঠিন কাজ তাকে করতে হয়। দেহ চলে না, তবু ভয়ে ভয়ে করতে হয়।

হিনা ভাবে, হায়! এ কি হল! কোথায় গেল রানীর সুখ। কোথায় গেল রাজার ভালোবাসা। দ্বীপের সবচেয়ে গরিব মেয়েকেও এমন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয় না। রাজা যেন আক্রোশের জন্য এমন করছে। দাসীর জীবনও এমন হয় না। হায়! যদি কোথাও শান্তি পেতাম, সেখানেই চলে যেতাম। হিনা ভাবে কিন্তু পথ পায় না।

হিনা ভাবে, ফিরে যাবে সাগবতলে প্রবাল রাজ্যে। কিন্তু ভাইদের ভয়ে তাও সাহস পায় না। কি যে করে এখন! দ্বীপের চারদিকে জল। রাজার হাত থেকে পালাবেই বা কোথায়?

একদিন তীরে বসে মাছ ধরছে সাগরকন্যা। চোখ দিয়ে মুক্তো ঝরছে। হঠাৎ দেখতে পেল, সাগরের ওপার থেকে এপার পর্যন্ত বিরাট রামধনুর উঠেছে। সে ভাবল, আকাশের সূর্যের দয়া হয়েছে। তাই তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে এই রামধনু। রামধনু পথ দেখাচ্ছে। সূর্য যেন বলছে, 'এই পথ ধরে তুমি দ্বীপ থেকে পালিয়ে যাও।

হিনা ছুটে গেল রামধনুর কাছে। রামধনুর পথ বেয়ে সে ওপরে উঠতে লাগল। মনে আশা, সে পালাতে পারবে। ওপরে উঠছে, আরও ওপরে। সূর্যের অনেক কাছাকাছি। চোখ জ্বলছে, দেহ পুড়ে যাচ্ছে সূর্যের তাপে। তবু পালাতে হবে। ওপরে উঠছে জলকন্যা। আর পারছে না সহ্য করতে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল হিনা, হাত আলগা হয়ে গেল। রামধনু সেতু বেয়ে নিচে নেমে আসছে হিনা, ঝড়ের বেগে। হায়! আছড়ে পড়ল বালির ওপরে। আঘাত পেয়ে জ্ঞান ফিরল হিনার। আবার সেই দ্বীপে। দাসী হিনা কেঁদে ফেলল।

হিনা উঠল না। সেখানেই শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল। সূর্য সাগরজলে ডুব দিল। আঁধার হল। আকাশে উঠল চাঁদ তবু হিনা উঠল না।

হঠাৎ হিনা রাজার ডাক শুনতে পেল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে রাজা তাকে ডাকছে। হিনা বুঝল, রাজা এবার তাকে পেলে আর আস্ত রাখবে না। সারাদিন কোনো কাজই সে করে নি। হায়! এখন সে কি করবে? বুক কাঁপতে লাগল। রাজা এসেই তাকে কাজ করতে বলবে। সারাদিনের শেষ-না-করা কাজ করাবে। হায়! সাগরকন্যার এ কি হল?

ঠিক সেই সময় এক অবাক কাণ্ড ঘটল। মেয়ে কোনোদিন আগে এমন জিনিস দেখেনি। তার সামনেই চাঁদের রামধনু দেখা দিল। তার সামনে

থেকে চাঁদের কাছ পর্যন্ত সেই চাঁদের রামধনু।

হিনা মনে মনে বলল, 'আঃ! কি মিষ্টি এই চাঁদের রামধনু। দেহ জুড়িয়ে গেল। আমি চাঁদেই যাব। আমি শান্তি পাব। চাঁদ আমায় এই পথ দেখাচ্ছে। চাঁদের রামধনুর সেতু বেয়ে আমি চাঁদে পৌঁছে যাব।'

দেহে শক্তি পেল হিনা। হিনা উঠে দাঁড়িয়েই চাঁদের রামধনু ধরে ফেলল। সেতু বেয়ে ওপরে উঠছে। কিন্তু এ কি! পা ধরে টানছে কে? রাজা পৌঁছে গিয়েছে সেখানে। দেখল, রুপোলি সেতু বেয়ে হিনা পালাচ্ছে। পা ধরে নিচ থেকে টানছে রাজা, মেয়েও ওপরে উঠতে চাইছে। ভীষণ টানাটানি। মেয়ের পা বুঝি ভেঙেই যাবে। মেয়ে বুঝল, এবার পালাতে না পারলে আর রক্ষা নেই। প্রাণপণ শক্তিতে রুপোলি সেতু ধরে সে ওপরে উঠতে চাইছে। পা দুমড়ে গেল। ব্যথায় কেঁদে উঠল হিনা। তবু চেষ্টা করছে। রাজার হাত ফস্‌কে গেল। হিনা কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে ওপরে উঠতে লাগল। পেছন ফিরে তাকালো না হিনা। অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পেল, রাজা চিৎকার করছে।

শেষকালে সাগরকন্যা হিনা পৌঁছে গেল রুপোলি চাঁদের শীতল রাজ্যে। আঃ! কি শান্তি!

এখনও প্রবাল রাজ্যের রাজকুমারী চাঁদেই রয়েছে। পা ভেঙেছে, খোঁড়া হয়েছে। তবু শান্তি, অনেক সুখ।

তোমরা যখন দেখবে চাঁদের চারপাশে পরীর মতো সাদা মেঘ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, বুঝবে ওগুলো হিনার পশম বোনার কারুকাজ। হিনা পশম বোনে চাঁদে। সেগুলো সাদা মেঘের মতো চাঁদকে ঘিরে থাকে। একদিন যে ছিল প্রবাল রাজ্যের সাগরকন্যা, আজ সে চাঁদের দেশের আকাশী কন্যা। এই চাঁদ যে একদিন তারই বন্দী রত্ন ছিল। যে মেয়ে তাকে অন্ধকার বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়েছে, তাকে সে বুকে টেনে নেবে না?

উলা আর উইম্‌বো

ছোট ছোট পাহাড়। এধারে-ওধারে ঝোপঝাড। পাশেই তিরতিরে ছোট্ট নদী। জলের নিচে পাথর কুচি দেখা যাচ্ছে। দুপুর বেলা। ছোট্ট টিকটিকি উলা খাবার খুঁজছে ঝোপে, ডালে, পাহাডের ফাঁকে। চুপ করে মাথা হেলিয়ে এধার-ওধার চোখ রাখছে। টুপ্‌ করে পোকা-মাকড় ধরছে, গিলেও ফেলছে। উলার পেছনে পেছনে ঘুরছে তিনটে ছোট্ট বাচ্চা টিকটিকি। তারই দুই ছেলে আর এক মেয়ে। মা তাদের মুখেও মাঝে-মধ্যে ছোট্ট পোকা গুঁজে দিচ্ছে। মহা আনন্দ ছেলে-মেয়ের।

হঠাৎ উলা কেমন ভয় পেয়ে গেল। ঝোপের আড়ালে কিরকম যেন শব্দ হচ্ছে। অন্যরকম খস্‌খস্‌ আওয়াজ। উলা মাথাটা ওদিকে নিল, এদিকে ঘোরালো। তেমন দেখলে সে ঠিক পালাতে পারবে। কিন্তু সঙ্গে রয়েছে তিনটে ছানাপোনা। ওরা তো তেমন বড হয়নি, পালাবে কেমন করে? ওদের ফেলে উলা পালাবে কেমন করে? মা তো চুপ করে তাকিয়ে আছে। নডছে না, খাবার খুঁজছে না। বাচ্চা তিনটেও ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। যেদিক থেকে শব্দ আসছে, উলা চোখ ঘুরিয়ে মাথা বেঁকিয়ে ভয়ে ভয়ে সেদিকে চেয়ে রইল।

হঠাৎ একটা সাদা টিকটিকি ওপাশের ঘন ঝোপের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ল উলার ঠিক সামনে। ছেলে টিকটিকি। মাথা তুলে সামনের দুই পায়ে দেহ উঁচিয়ে সাদা টিকটিকি বলল, 'আমি সাদা টিকটিকি। আমার নাম উইম্‌বো। তুমি কালো দলের মেয়ে, তবু আমি তোমায় বিয়ে করব। পালাতে পারবে না। পালালে বাচ্চাদের মেরে ফেলব। চলো আমার সঙ্গে।'

উলা পেছন ফিরে ছানাদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। বুকটা কেঁপে উঠল। চোখে চোখে কি কথা হল, উলা চলল উইম্‌বোর পাশে পাশে. ছানারা চলল মায়ের পেছনে পেছনে। চারজনের বুক কাঁপছে।

গাঁয়ে ঢুকছে উইম্‌বো। সর্দারের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছে। সর্দার দাওয়ায় বসে বর্শা তৈরি করছিল। উইম্‌বো আর ওদের দেখে সব বুঝতে পারল। রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এই হতভাগা, ঐ মেয়েটাকে বিয়ে

করে আনলি কেন? এক্ষুনি কালো দলের লোকেরা ছুটে আসবে। যুদ্ধ বাধবে। গাঁয়ে কি সাদা মেয়ের অভাব আছে? উট্‌কো ঝামেলা বাধাস কেন? কে এখন এসব সামলাবে?'

উইম্‌বো বলল, 'গাঁয়ের সবাই লড়ব। ওদের হারিয়ে দেব।'

সর্দার হাত নেড়ে বলল, 'কেউ লড়বে না। কেন লড়বে? কেন মরবে? তুই করবি বিয়ে আর বিপদ্‌ হবে সবার? তোর হয়ে কেউ লড়বে না। কাউকে লড়তে দেব না।'

উইম্‌বো বলল, 'বেশ, কাউকে লড়তে হবে না। আমি একাই লড়ব। বুদ্ধি করে ওদের হারিয়ে দেব। বিয়ে যখন একবার করেছি তখন বৌকে ছাড়ছি না। বাচ্চাদেরও না। ভয় নেই, গাঁয়ের কারও কিছু হবে না। আমি একাই পারব।'

সর্দারের বাবা কুঁজো হয়ে দাওয়ার একধারে বসে ছিল। সে বলল, 'পারবে, পারবে, ও একাই পারবে। ওর সাহস আছে, ওর আছে বুদ্ধি। ওদুটো থাকলে কেউ হারে না।'

বুড়োর কথা কেউ শুনতে পেল না। সর্দার আবার বলল, 'খুব কথা ফুটেছে মুখে। একা পারবি কেমন করে? ওরা তো আসবে দল বেঁধে।'

উইম্‌বো আর কিছু বলল না। নিজের বাড়ির দিকে চলল। ঘরে ঢুকে পড়ল। উলা আর বাচ্চারাও ঘরে ঢুকল।

সর্দার তাকিয়ে রয়েছে নদীর ওপারে। চোখ কুঁচকে কপালে হাত রেখে শুধুই তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ বলে উঠল, 'যা ভেবেছি ঠিক তাই। ঐ আসছে কালো টিকটিকির দল। ছুটে আসছে। এই হতভাগা, যা এবার। কত সাহস দেখব।'

কথা শেষ না হতেই গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই বাইরে বেরিয়ে এল। নদীর ওপারে দলে দলে কালো টিকটিকি। সবার হাতে তীর-ধনুক-বর্শা-লাঠি।

উইম্‌বো ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার হাতে শক্ত কাঠের একটা মুখোশ। তাকে দেখেই সর্দার বলে উঠল, 'যা, একাই যা। আমরা নেই ওসব বৌ-চুরির মধ্যে।'

ততক্ষণে উইম্‌বো মুখে মুখোশ পরে নিয়েছে। হাতে একটা ছুঁচলো

বর্শা নিয়ে ছুটে গেল নদীর পারে। গাঁয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সবাই দেখতে লাগল।

ছোট্ট নদী। উইম্‌বো চেঁচিয়ে বলল, 'সাহস থাকে এগিয়ে আয়। আমাব নাম উইম্‌বো।'

শত্রুরা এগিয়ে আসছে।, আরও কাছে, নদীর ওপারে। শত শত তীর ছুটে এল এদিকে। দেহ বেঁকিয়ে মুখটা সামনে রেখে হঠাৎ বসে পড়ল উইম্‌বো। দেহে তীর বিঁধল না. অনেকগুলো তীর এসে মুখে লাগল। মুখোশে লেগে পড়ে গেল অনেক তীর। কাঠের শক্ত মুখোশ। কিছুই হল না তার। মুখ রয়েছে মুখোশের পেছনে।

উইম্‌বো নডছে না, পডে রয়েছে মাটিতে। ওরা ভাবল, সে মরে গিয়েছে। একা এসেছে লডতে! একবাব লড়াইতেই শেষ। আমাদের সঙ্গে লড়াই করা?

হঠাৎ উইম্‌বো উঠে দাঁডাল। হাত তুলে বর্শা বাগিয়ে ধরল। ওরা অবাক হল,—তাহলে শত্রু মরেনি!

- আবার তীরের ঝাঁক। আগের চেয়ে শতগুণ বেশি। এধার-ওধার চারবাব থেকে। আবার কায়দা করে বসে পড়ল সে। বর্শা তার হাতেই রইল। কিন্তু এবারও কিছু হল না তার। তীর দেহে বিঁধল না, মুখোশে লেগে পডে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পড়ে রইল উইম্‌বো। এবার আর কি কৌশল করা যায় তাই ভাবছে। এর মধ্যে জল পেরিয়ে শত শত কালো টিকটিকি এপারে চলে এসেছে। তাকে চারধার থেকে ঘিরে ফেলল।

উইম্‌বো এটা বুঝতে পারেনি। চোখ তুলেই দেখে তার চারপাশে শত্রু। এবার পালাবে কোথায়? নাঃ, এবার বুঝি মরতেই হল। হঠাৎ উইম্‌বো দেহ বেঁকিয়ে লাফ দিল নদীর জলে। অনেক কালো টিকটিকি এদিকে এসেছিল জল পেরিয়ে,—তাই জল ঘোলা হয়ে উঠেছে। জলের মধ্যে তারা আর উইম্‌বোকে দেখতে পেল না।

কিন্তু দেখতে না পেলে কি হবে, ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে পড়ল নদীর জলে। টুপ্‌ টুপ্‌ করে তীর পড়ছে জলে। উইম্‌বো বুঝল, বিপদ আরও বেড়ে যাচ্ছে। কোন্‌ তীর যে কখন গায়ে লাগে!

হঠাৎ সে মুখের মুখোশ খুলে ফেলল। লুকিয়ে পড়ল বালি আর পাথর-কুচির মধ্যে। হাঁফ ছাড়ল সে।

কাঠের মুখোশ। দু একবার ওলটপালট খেয়েই ভেসে উঠল জলের ওপরে। ওরা তাকিয়ে দেখল, ওটা জলে ভাসছে। কয়েকটা তীরও গিয়ে লাগল। কিন্তু ওটা আর পালাচ্ছে না। তাহলে? তাহলে উইম্‌বো মরেই গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে চালাকি? উইম্‌বো মরে জলে ভাসছে। হৈ হৈ করে আনন্দ করতে করতে কালো টিকটিকির দল ফিরে চলল। তাবা নদীব ওপারে গেল। তারপর পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

এ গাঁয়ের সবাই দেখছে ওদের লডাই। শত্রুরা ফিবে যাচ্ছে। সর্দাব বলে উঠল, 'অত সোজা একা লড়াই করা? হল তো! এমনি করে মরতে আছে? একটুও বুদ্ধি নেই। একা কখনও লডাই করতে হয়?' সর্দার বসে পডল দাওয়ায়।

গাঁয়ের সবার মন খারাপ। তারা ভাবছে, কি দরকার ছিল ওকে একা পাঠানো? না হয় বিয়ে করেই এনেছে। সর্দার অন্যদের পাঠাতে পাবত। সর্দাব নিষেধ করল, নইলে ওরাও যেত। কিন্তু সর্দার না বললে যায় কেমন করে? অনেক কিছু ভাবছে তারা।

হঠাৎ তারা দেখতে পেল, হাতে কাঠের মুখোশ নিয়ে উইম্‌বো ফিরে আসছে। সে হাসছে। এমনভাবে আসছে,—তাহলে তো ওব গায়ে আঁচরও লাগে নি। সবাই অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

উইম্‌বো গাঁয়ে ঢুকে সর্দারের দাওয়ার সামনে দাঁডিয়ে নরম গলায় বলল, 'সর্দার, আমাদের মোড়ল, ওদের আমি হারিয়ে দিয়েছি। দেহের শক্তিতে নয়, বুদ্ধিতে। আমি একাই লডেছি।'

সর্দার নেমে এল দাওয়া থেকে। হাত বাড়িয়ে উইম্‌বোর দু-কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তুই পারবি, তুই পারবি আমাদের ভালো করতে। তোর অনেক বুদ্ধি। আমি বুড়ো হয়েছি। এবার তুই হবি গাঁয়ের সর্দার। আমরা সবাই তোকে মানব। আমাদের ভালো হবে, বিপদ-আপদ ঘটবে না। তোমরা জেনে রাখো—আজ থেকে উইম্‌বো হবে এই গাঁয়ের সর্দার, আমাদের গোষ্ঠীপতি।'

পরবের মতো খাওয়া-দাওয়া হল। অনেক আনন্দ-গান-নাচ। সবার মনে আনন্দ। নতুন সর্দার আমাদের, আমাদের উইম্‌বো।

সাত বোন

অনেক কাল আগে এক গভীর জঙ্গলে সাত বোন ছিল। তারা খুব সুন্দরী। এমন রূপ কমই দেখা যায়। তাদের সাত জনেরই চুল ছিল কোমর পর্যন্ত লম্বা, আর চুল ছিল যেমন কালো তেমনি ঘন। তাদের দেহের রঙ ছিল সাদা, সাদা বরফের মতো। ছোট্ট ছোট্ট তুষার-কণা দেহে লেগে রইত। কি সুন্দর যে লাগত! যেন তুষার-রঙা ঘামের বিন্দু দেহের ওপরে।

কিন্তু তারা ছিল একটু অদ্ভুত। কারও সঙ্গে তারা মিশত না। সাত জনে একা একা থাকত। সাত বোন একসঙ্গে শিকার করতে যেত। তারা যেমন কারও সঙ্গে যেত না, তেমনি তাদের সঙ্গেও কাউকে নিত না। কারও সঙ্গে তারা সই পাতাতো না, তাদের কেউ বন্ধু ছিল না। বড় অদ্ভুত এই সাত বোন।

পাশের জঙ্গলে থাকত সাত ভাই। তারা দেখত, সাত বোন একসঙ্গে শিকারে যায়। তাদের খুব ইচ্ছে এই সাত বোনকে বিয়ে করে। খুব সুন্দরী বৌ হত তাহলে। সাত বোন যখন শিকারে যায়, পেছন পেছন যায় সাত ভাই। একটু দূরে দূরে থাকে যাতে সাত বোন তাদের দেখতে না পায়। কিন্তু গাছের ফাঁক ফাঁক দিয়ে নজর রাখে,—তারা কোথায় যায়, কি শিকার করে, কোথায় বিশ্রাম করে, সবকিছু নজর রাখে।

এই সাত ভাই একটা জিনিস জানত। অন্য কেউ জানত না। সাত বোনও জানত না। তারা বনের মধুর খবর জানত। চাক ভেঙে কিভাবে মধু জোগার করতে হয় তা তারা খুব ভালোভাবে শিখেছিল। মৌমাছিদের এমন কায়দায় তাড়াত যে সেগুলো তাদের কামড়াতেও পারত না।

কোন্ গাছের ঘন পাতার মধ্যে মধুর চাক আছে? তারা করত কি, একটা মৌমাছিকে ধরত। তার পেছনে গাছের আঠা লাগিয়ে দিত আর আঠার মধ্যে গুঁজে দিত পাখির ছোট্ট একটা পালক। মৌমাছি জোরে উড়তে পারত না, আস্তে আস্তে উড়ত। এরাও পেছন পেছন যেত। মৌমাছি গিয়ে চাকে বসত। তখন ওরা চাক ভেঙে মধু নিত।

একদিন সাত ভাই অনেকটা মধু একটা মাটির ভাঁড়ে রাখল। প্রতিদিন যেখানে সাত বোন শিকার করতে এসে বিশ্রাম করত, সেটা আগে থেকেই সেখানে রেখে দিল। দূরে লুকিয়ে থেকে দেখতে লাগল কি হয়।

মেয়েরা শিকার করে গাছের নিচে বিশ্রাম করছে। হঠাৎ দেখতে পেল সেই মধুর ভাঁড়। এক বোন একটা আঙুল ডুবিয়ে মুখে দিল। অবাক হল। এমন সুন্দর জিনিস সে আগে কখনও খায়নি। সবাই খেল। খুব খুশি। কিন্তু কিভাবে এমন জিনিস এখানে এল তা বুঝতে পারল না। আগেও অনেকবার এখানে এসেছে, কিন্তু কোনোদিন দেখেনি।

এমন সময় সাত ভাই গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তারাই যে এই মধু রেখেছে তাও বলল। তাদের মনের কথা জানাল। সাত ভাই সাত বোনকে বিয়ে করতে চায়। খুব সুখে রাখবে তাদের। সাত বোন কথা বলল না, তাদের সঙ্গে শিকারেও যেতে চাইল না। তারা বিয়ে করতে মোটেই রাজি হল না। হাবভাবে এসব বুঝিয়ে দিল। সাত ভাইয়ের মন খারাপ হয়ে গেল।

এখন হয়েছে কি, এক এলাকায় এক মস্ত শিকারী ছিল। তার নাম উরুরুনাহ্। একদিন সে বাড়ি ফিরছে। সারাদিন বনে বনে শিকার করেছে। খুব ক্লান্ত সে। বিকেল গড়িয়ে গিয়েছে, বাড়ি ফিরল শিকারী। ভীষণ খিদে পেয়েছে তার। বাড়িতে ঢুকেই মায়ের কাছে খাবার চাইল। মা বলল, এখনও খাবার তৈরি হয়নি। ক্লান্তিতে খিদেতে এমনিতেই তার মাথা গরম ছিল। মায়ের কথা শুনে সে আরও বেশি রেগে গেল। ভীষণ ঝগড়া করল মায়ের সঙ্গে।

মা আস্তে আস্তে বলল, 'বাছা, শুধুই রাগ করছিস। কি করব বল? এক ফোঁটাও ঘাসের বীজ বাড়িতে নেই। কি দিয়ে রুটি বানাব? ঘাসের বীজ না থাকলে আমি কি করব? এত গরিব আমরা!'

ছেলে গেল আরও রেগে। রাগের মাথায় ওসব কথা শুনতে ভালো লাগে না। সে চিৎকার করে বলল, 'কাউকে কিছু বানাতে হবে না। আমি নিজেই রুটি বানিয়ে নেব।'

ঘরে ঢুকে হাঁড়ি খুঁজতে লাগল। কিন্তু সব ফাঁকা। কোনো হাঁড়িতে এক তিল ঘাসের বীজ নেই।

ছেলে তীরের বেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তার যেন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। খিদে পেলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে বন্ধুদের বাড়ি গেল। এ বাড়ি সে বাড়ি ঘুরল। ঘাসের বীজ কিছুটা ধার চায়। কিন্তু কোনো বাড়িতেই সে ধার পেল না। কেউ তাকে ধার দিল না।

সবাই বলল, নেই। সে ভাবল, আসলে সবার ঘরেই বীজ আছে, কিন্তু তাকে কেউ দিল না। প্রথমে সে খুব রেগে গেল, রাগে কাঁপতে লাগল। তারপরে তার মনে খুব কষ্ট হল। তার এত খিদে পেয়েছে আর কেউ তাকে ধার দিল না? তাকে বিশ্বাস করে না? এরাই তার গাঁয়ের আপনজন? এত খারাপ এরা? নাঃ, সে আর এদেশে থাকবে না। নতুন মানুষের খোঁজে যাবে। ছেলে আর বাড়ি ফিরল না। বেরিয়ে পড়ল নতুন দেশের খোঁজে।

শিকারী বনের পথে হাঁটছে, হাঁটছে। পেট গুলিয়ে উঠছে, মাথা ঘুরছে। হঠাৎ সে একজন বুড়ো লোককে দেখতে পেল। বুড়ো গাছ থেকে মৌচাক পেড়ে তার থেকে মধু বের করছে। পায়ের শব্দে বুড়ো মুখ তুলে চেয়ে রইল তার দিকে। শিকারী এগিয়ে আসছে বুড়োর কাছে। একেবারে কাছে এসে সে দেখল, বুড়োর কোনো চোখ নেই। অত দেখার সময় নেই, উবুরুনাহ্ বুড়োর কাছে খাবার চাইল। বুড়ো তাকে অনেকটা মধু দিল। সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলল শিকারী। আহ্, প্রাণ বাঁচল। কি শান্তি। বসে পড়ল ঘাসের ওপর।

বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'গাঁ কোথায়? থাকো কোথায়? কত দূরে? ইচ্ছে করলে আমাদের গাঁয়ে থেকে যেতে পার। কোনো ভয় নেই, ভাবনা নেই।'

বুড়োর কথা শুনে শিকারীর খুব ভালো লাগল। আপনজনের মতো কথা। কিন্তু বুড়োর কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে না, বুড়ো চোখে দেখতে পায় না। অথচ তার তো চোখ নেই! অবাক ব্যাপার!

শিকারী বলল, 'তুমি কি দেখতে পাও? কথা শুনে মনে হচ্ছে দেখতে পাও। অথচ চোখ কোথায়?'

বুড়ো মিষ্টি হেসে বলল, 'হ্যাঁ, খুব ভালোভাবে দেখতে পাই। ঠিক তোমার মতো। তবে হ্যাঁ, তোমার মতো চোখ নেই। আমাদের এই আদিবাসী গোষ্ঠীর কারও চোখ নেই। কিন্তু সবাই দেখতে পাই। আমরা নাক দিয়ে দেখতে পাই। নাকই আমাদের চোখ।'

শিকারী এমন অদ্ভুত কথা আগে কখনও শোনেনি। বুড়োর মধু দেওয়া, বুড়োর কথাবার্তা তার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু এমন গোষ্ঠীর মধ্যে তার থাকতে সাহস হল না। যদি কিছু হয়? না, সে থাকবে না। আরও এগিয়ে যাবে। দেহে বলও ফিরে এসেছে।

শিকারী এগিয়ে চলল। দু-একবার পেছন ফিরে দেখল। বুড়ো আবার একমনে কাজ করছে। হাঁটতে হাঁটতে সে এসে পৌছল একটা ছোট্ট হ্রদের তীরে। আঃ, কি স্বচ্ছ টল্‌টলে জল। নিচের বালি-পাথরকুচি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কেউ নেই আশেপাশে। সে এখানেই থাকবে।

হ্রদের টল্‌টলে জল অনেকটা খেল। মাথায় মুখে জলের ছিটে দিল। খুব ভালো লাগল। একটা ঘন গাছের নিচে শুয়ে পড়ল।

সকালের রোদ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তীবের মতো এসে পড়েছে ঘাসে। শিকারী চোখ মেলে চাইল। এক ঘুমেই বাত ফুরিয়ে গিয়েছে। চোখ খুলে সামনে চাইতেই সে অবাক হয়ে গেল। কোথায় গেল সেই হ্রদ? সেই টল্‌টলে জলেব হ্রদ? ঐ হ্রদ থেকেই তো জল খেয়েছিল? এখন মাঠ। সবুজ ঘাসের বিবাট মাঠ। সে অবাক হল, ভয়ও পেল। এ কেমন দেশ?

হঠাৎ আকাশ-জুড়ে মেঘ কবে এল। থম্‌থম্ কবছে চারিদিক। ঝড় আসবে। হ্রদ নিয়ে ভাববাব সময় নেই। একটা আস্তানা তৈবি করতে হবে। ঝড়-জল থেকে বাঁচতে হবে। সে লেগে পড়ল কাজে। গাছের মোটা মোটা ডাল মাটিতে পুঁতে ফেলল। গাছেব বাকল নিয়ে এল। অনেক। ছাদ আর বেড়া কবতে হবে। একটা গাছের সুন্দর বাকল দেখতে পেল। গায়ের জোবে হাত দিয়ে বাকল টানতেই সে অবাক হয়ে গেল। বাকলেব নিচে গাছেব সঙ্গে লেগে রয়েছে একটা অদ্ভুত জন্তু। এমন জন্তু সে আগে দেখেনি। ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল।

হঠাৎ জন্তুটা আকাশ-ফাটা গর্জন করে উঠল, 'আমি বুল্‌গাহ্‌মুন্‌নু। আমি ....।'

বাকল ছেড়ে দিল শিকারী। পেছন ফিবেই ঝড়েব বেগে দৌড় দিল। ভয়ে তাব বুক ভীষণভাবে কাঁপছে। ওঃ, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে!

তারপর সে থামল। আর ছুটতে পারছে না। আর বোধহয় ভয় নেই। শান্ত হয়ে সে বসে পড়ল ঘাসের ওপর।

হঠাৎ শিকারী দেখতে পেল, দূরে একটা নদী। আর অনেক এমু পাখি ঝাঁক বেঁধে সেই নদীতে জল খেতে আসছে। শিকারী ঠিক করে ফেলল, একটা পাখিকে মারতে হবে। তাহলে আর আজকের খাবারের জন্য ভাবতে হবে না। গুটিগুটি এগিয়ে সে নদীর পাশে একটা গাছে উঠে পড়ল। ঘন

পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইল। এমুরা অনেক কাছে এসেছে। শিকারী বর্শা ছুড়ে মারল। বড় শিকারী। বর্শা গিয়ে বিঁধল একটা এমুর গায়ে।

গাছ থেকে নেমে আহত এমুকে সে ধরতে ছুটেছে। এমু ছট্‌ফট্ করছে। হঠাৎ শিকারী বুঝতে পারল, ওগুলো এমু পাখি নয়। ওরা এক অজানা গোষ্ঠী। তাদেরই একজনকে সে বর্শায় বিঁধেছে। ও আর বাঁচবে না। সে পাখি ভেবে মানুষ মেরেছে। শিকারী বুঝল, এখুনি বিপদ হবে। ওরা লোকটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে। এইবার ধাওয়া করবে হত্যাকারীকে। খুঁজবে কে এমন কাজ করল। ওরা অনেকে।

শিকারী পেছন ফিরে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে দৌড় দিল। এঁকেবেঁকে সে ছুটে চলেছে। ও:, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে। ওরা যদি ওকে ধরতে পেত, ওমনিভাবে বর্শা দিয়ে মারত। আর ওপথে নয়।

উরুন্নাহ্ পথ চলছে, বনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। শেষকালে এক জায়গায় এসে সে ঘাসের ওপরে বসে পড়ল। মাথার ওপরে গাছের ঘন ডালপালা। হঠাৎ শিকারী সাত বোনকে দেখতে পেল। অল্প দূরেই তারা বসে রয়েছে। শিকারী উঠে তাদের কাছে গেল।

তারা বলল, 'আমরা সাত বোন। এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াই। অন্য কারও সাথে কথা বলি না, কারও সাথে বন্ধুত্ব পাতাই না। কিন্তু আজ রাতটুকু তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে পার। কালকেই তোমাকে চলে যেতে হবে।'

এই বলে সাত বোন শিকারীকে অনেকটা খাবার দিল। খুব খিদে পেয়েছে তার। সে কোনো কথা না বলে খেতে লাগল। খাওয়ার পরেও সে কিছু বলল না। চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

ভোর হতেই শিকারী এমন ভান করল যেন সে বহু দূরে চলে যাচ্ছে। অন্য পথে সাত বোন রওনা দিল। শিকারী ঘন বনের মধ্যে দিয়ে ঘুরে এসে সাত বোনের পেছন পেছন যেতে লাগল। লুকিয়ে লুকিয়ে সে যাচ্ছে যাতে ওরা দেখতে না পায়।

সাত বোন এক জায়গায় থামল। মাটির গর্তে কি যেন দেখল। সেই গর্ত থেকে কয়েকটা ডিম তুলে নিল। তারপর গোল হয়ে বসে সেই ডিম খেতে লাগল। আপনমনে খাচ্ছে আর গল্প করছে।

শিকারী ঝোপের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে ওদের দিকে এগোচ্ছে। ওদের

পেছনে ওরা রেখে দিয়েছিল অনেকগুলো মেটে আলুর কাঠি। শিকারী হাত বাড়িয়ে দুটো কাঠি চুরি করেই ঝোপে লুকিয়ে পড়ল। ওরা কেউ দেখতে পায় নি।

খাওয়া শেষ করে সাত বোন উঠল। আবার অন্য কোথাও যাবে। মেটে আলুর কাঠি তুলে নিতেই দেখল, দুটো কাঠি নেই! আশ্চর্য তো! এই তো ছিল! গেল কোথায়? কেউ তো আসে নি এখানে? তারা এধার-ওধার অনেক খুঁজল। কিন্তু দুটো কাঠি কোথাও পেল না।

শেষকালে ওরা ঠিক করল, যে দুই বোনের কাঠি হারিয়েছে, তারা এখানেই থাকবে। সেগুলো খুঁজবে। যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ খুঁজবে। খুঁজে পেলে আবার পাঁচ বোনের কাছে যাবে। অন্য পাঁচ বোন ঘন বনে এগিয়ে গেল। দুই বোন খুঁজতে লাগল সে দুটো কাঠিকে।

তারা ঘন ঘাসের মধ্যে খুঁজছে, ঘন ঝোপের মধ্যে খুঁজছে। শিকারী ঝোপ থেকে বেরিয়ে এক জায়গার শক্ত মাটিতে কাঠি দুটো পুঁতে দিল। আবার লুকিয়ে পড়ল ঝোপের আড়ালে। ঝোপের মধ্যে থেকে সবকিছু দেখতে পাচ্ছে।

দুই বোন পেছন ফিরেই কাঠি দুটো দেখতে পেল। মুখে হাসি ফুটল। ছুটে গিয়ে মাটি থেকে কাঠি তুলতে গেল। কাঠি টেনে তুলছে,—শিকারী ঝোপের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে পড়ল। দুই হাতে দুই বোনকে শক্ত করে চেপে ধরল। তারা হাত ছাড়াতে চেষ্টা করল। পারল না। বুঝল, পালানো যাবে না। শান্ত হল দুই বোন।

শিকারী বলল, 'তোমরা আমার সঙ্গে যাবে। তোমরা দুজন হবে আমার বৌ। আমার তাই ইচ্ছে।'

বৌ হতে দুই বোনের একটুও ইচ্ছে নেই। কিন্তু শিকারীর দেহের শক্তি অনেক বেশি। তারা গায়ের জোরে পারবে না। তাই দুই বোন বৌ হতে রাজি হল। উপায় কি?

দুই বোন মনে মনে ভাবল, একদিন না একদিন যেমন করেই হোক শিকারীর কাছ থেকে পালাতে হবে। সুযোগ পেলেই পালাবে।

শিকারী দুই বৌয়ের মনের কথা বোঝে। তাই সব সময় নজর রাখে। সে ভাবে, তার হাত থেকে পালানো অত সহজ নয়! শিকারী কিন্তু খুব খুশি। দুই বৌ পরমা সুন্দরী, কাজকর্মও মন দিয়ে করে। কিন্তু এরা দুজন বড়

অদ্ভুত। কথা প্রায় বলেই না, বেশি রকমের শান্ত। তবু সে খুশি।

মেয়েদের দেহে রয়েছে সাদা তুষার-কণা। এগুলো শিকারীর মোটেই ভালো লাগে না। শিকারী এগুলোকে গলিয়ে দিতে চায়। আগুনের পাশে দুই বৌকে অনেকক্ষণ দাঁড করিয়ে রাখে। বৌ দুজন কিছু বলে না, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। তুষার-কণার ঠাণ্ডা জল বাষ্প হয়ে উবে গেল, কিন্তু তবু তাদের দেহে কণাগুলো জলজল করতে লাগল। উজ্জলতা কমল, কিন্তু দেহ থেকে কণাগুলো একেবারে মুছে গেল না।

এমনি করে দিন যায়। বৌরাও শিকারীকে ভালোবেসে ফেলল। না, তাদের ভালোই লাগছে। শিকারী মানুষ ভালো। তারা সুখী হল। আনন্দে দিন কাটতে লাগল।

তবু দুই বোন যখন একা একা থাকে, অন্য পাঁচ বোনের কথা ভাবে, তাদের কথা বলে। মন কেমন উদাস হয়ে যায়। আহা! ওরা এখন কোথায়? কেমন আছে? ভালো আছে তো? স্বামীর সঙ্গে সুখে থাকলেও দুই বোন চিন্তা করে. একদিন ঠিক দেখা হয়ে যাবে পাঁচ বোনের সঙ্গে। আবার সাত বোন একসঙ্গে হেসেখেলে শিকার করে দিন কাটাবে।

একদিন উর্‌রুনাহ্‌ দুই বৌকে বলল, 'পাহাড়ী দেবদারু গাছের ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে এস। আমার আগুন নিবে আসছে। একবার নিবে গেলে আর তো জ্বালাতে পারব না। আগুন আছে কিন্তু নতুন করে আগুন জ্বালাতে জানি না। সর্বনাশ হবে। গাছের বাকল নিয়ে এস।'

কেঁদে ফেলল দুই বৌ। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ওগো, দেবদারু গাছের বাকল কাটতে বোলো না, ঐ গাছের বাকল কাটলেই আমরা আর তোমার থাকব না। আমাদের হারাতে হবে। ও কাজ করতে দিও না।'

শিকারী ভীষণ রেগে গেল। স্বামীর কথা অমান্য করা? আসলে খাটতে চায় না ওরা। রাগে চিৎকার করে বলল, 'আমি বলছি, এক্ষুনি বাকল কেটে নিয়ে এস। নইলে......।' আগুন কমে আসছে দেখে শিকারী আরও বেশি রেগে গেল।

শিকারী শুনবে না তাদের কথা। বৌ দুজন শিকারীর শিকার করবার কুঠার নিয়ে পাহাড়ী বনে রওনা দিল। গোটা পথ তারা কাঁদছে। তারা দুটো পাহাড়ী দেবদারু গাছের নিচে এসে থামল।

চোখের জল মুছে তারা কুঠার দিয়ে আঘাত করল দেবদারু গাছে। সঙ্গে

সঙ্গে দুটো গাছ বড় হতে লাগল, উঁচু হতে লাগল। মেয়ে দুটো কুঠার সমেত আটকে গেল গাছে। গাছ উঁচু হচ্ছে, মেয়েরা ওপরে উঠছে। গাছও আকাশ-পানে মাথা তুলছে, মেয়েরা আকাশ-পানে উঠছে। উঁচুতে, আরও উঁচুতে। শেষকালে দেবদারু গাছ আকাশে গিয়ে থামল। তাদের উঁচু হওয়া বন্ধ হল। মেয়েরাও সেই দূর আকাশে।

হঠাৎ দুই বোন দেখতে পেল, মেঘের কোলে দাঁড়িয়ে পাঁচ বোন হাত বাড়িয়ে দুই বোনকে ডাকছে। পাঁচ বোন আগেই আকাশে পৌঁছে গিয়েছে। তারা অপেক্ষা করছিল দুই বোনের জন্য। দুই বোন জড়িয়ে ধরল পাঁচ বোনকে। কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল দুই বোন, আবার তাদের ফিরে পেয়েছে। সাত বোন আবার একসঙ্গে হল। আকাশের ঐ দূরের মেঘের রাজ্যে। বড় আনন্দের দিন আজ।

দূর থেকে শিকারী দেখতে পেয়েছে, দেবদারু ওর বৌ দুজনকে নিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। রাগে সে ছুটে এল গাছের কাছে, হাতে তীর-ধনুক বর্শা। কিন্তু সে ওদের নাগাল পেল না। নিচ থেকেই হম্বিতম্বি করতে লাগল। শিকারী লাফাচ্ছে, উঁচু হচ্ছে হাত-পা নাড়ছে আর মুখে বিড়্‌বিড় করে কি যেন বলছে।

সাত বোনের এক কুটুম্ব থাকত আকাশে। সে মাটির ওপরে শিকারীর হম্বিতম্বি দেখে তো হেসেই খুন। কি মজা লাগছে! আহা! বেচারী! সেই কুটুম্বের হাসি আর কোনোদিন থামল না। সে হল শুকতারা। আজও মিট্‌মিট করে হাসছে।

সেই সাত ভাই অনেক দিন বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরল। তারা প্রাণ দিয়ে সাত বোনকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু সাত বোনকে বৌ হিসেবে পায় নি। বড কষ্টে বহু পথ তারা ঘুরেছে। নাঃ, আর কোনোদিন সাত বোনের দেখা পায়নি। আকাশের দেবতা সাত ভাইয়ের মনের ব্যথা বুঝেছেন, তাদের ভালোবাসা তিনি দেখেছেন। আহা! ওরা সাত বোনের কাছাকাছিই থাকুক। তাই আকাশের দেবতা সাত ভাইকে মেঘরাজ্যে ঠাঁই দিলেন।

সাত বোন আকাশ-রাজ্যে তারা হয়ে ফুটে রইল। তারা হল সপ্তর্ষিমণ্ডল, সাত বোন একসঙ্গে রয়েছে। সাত ভাইও এল আকাশে। সারাদিন সাত ভাই মৌমাছি শিকার করে, মধু খায়। আর রাতে আকাশে ফুটে ওঠে তারা হয়ে। এই সাত ভাই হল কালপুরুষের কোমরবন্ধনী আর তরবারি। সাত

তারা-বোন যখন গান গায়. সাত তারা-ভাই তখন আনন্দে নেচে ওঠে।

আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাত তারা-বোনই খুব উজ্জ্বল। কিন্তু এরই মধ্যে দুজনের আলো যেন অল্প কম। ঐ দুটি তারা উবুরুনাহের বৌ ছিল। আগুনের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল শিকারী, তাই তুষার-কণার আভা অল্প কমে গিয়েছে।

সাত তারা-বোন, সাত তারা-ভাই আর কুটুম্ব শুকতারা আকাশে ফুলের মতো ফুটে রয়েছে আজও।

ডিরিরি আর বিব্‌বি

গাছ-গাছালির মধ্যে ছোট্ট একটা বাড়ি। গাছের ডালপালা আর পাতা দিয়ে তৈরি। সেই বাড়িতে থাকত এক মেয়ে। তার নাম ডিরিরি। তার চার মেয়ে। সবাই খুব ছোট। মায়ের বয়েসও বেশি নয়। চার মেয়ের বাবা নেই। বুমেরাং নিয়ে বাবা একদিন শিকারে গেল। আর ফিরল না। শিকার করতে গিয়েই সে মারা গেল। মা এখন বিধবা।

ডিরিরিব বড কষ্ট। সারাদিন খাটে, কাজ করে। নিজে হয়তো সারাদিন কিছুই খেল না। কিন্তু মেয়েদের খুব যত্নআত্তি করত। তার সাধ্যমতো সে মেয়েদের ভালোভাবে রেখেছিল। আহা! বাপ-মরা ছোট ছোট শিশু! ওদের যেন কষ্ট না হয়। মায়ের প্রাণ কাঁদত।

বড় বলতে বাড়িতে সে একা। আশেপাশে কোনো পড়শীও নেই। তাই মেয়েদের নিয়ে মা খুব ভয়ে ভয়ে থাকত। রাত হলে তো কথাই নেই, দিনের বেলাতেও ভয়। ডিরিরি ভাবত,—এই বুঝি বিপদ এল। মেয়েদের কথা ভেবে চম্‌কে উঠত। তার শুধুই বিপদের ভয়। তাই বাড়ি থেকে কখনও সে বেশি দূরে যেত না।

এমনি করে ভয়ে-দুঃখে-কষ্টে তার দিন কাটে। সে ভাবে, কতদিনে যে মেয়েরা বড় হবে? বড় হলে তবে নিশ্চিন্ত।

এই সময় তার বাড়ির খুব কাছে আর একটা বাড়ি তৈরি হল। সারাদিন খেটেখুটে লোকটা বাড়ি তৈরি করল। ডিরিরি সেদিন বাইরেই বের হল না। মেয়েদের কাছে নিয়ে ঘরেই বসে রইল। সব দেখতে পেল ঘর থেকেই। সবসময় বুক কাঁপতে লাগল। এবার বুঝি সর্বনাশ হবে। কে যে এসে বাড়ি করল? কেন, দূরে তো অনেক ফাঁকা জায়গা আছে। এখানে আসার কি দরকার ছিল? কিন্তু এসব মনে মনে ভাবলেও মুখে কিছুই বলতে পারল না।

নতুন বাড়ি করেছে একটা পুরুষ। তার নাম বিব্‌বি। সে একা।

চারদিকে আঁধার হয়ে এল। রাত হল। ডিরিরি মেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে জেগে বসে রইল। শুতে পর্যন্ত পারল না। ভয়ে বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করতে লাগল। ভয় বেড়েই চলল। আর সহ্য করতে পারছে না সে। যদি কিছু

হয় ? ডিরিরি ডুকরে কেঁদে উঠল, 'হায়! হায়! ডিরিরি! হায়! ডিরিরি!' সারা রাত ধরে এমনিভাবে সে কেঁদে গেল। কান্না তার থামল না। শেষকালে আলো ফুটল, মেয়েরা জেগে উঠল।

দরজা খুলতেই সে দেখতে পেল, বিব্‌বি তার বাড়ির দিকে আসছে। বেশি করে বুক কাঁপতে লাগল তার।

বিবৃবি দোরের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল ? সারা রাত ধরে অমন করে কাঁদছিলে কেন ? আঁধার রাতে অমন করে কাঁদতে আছে ? কি হয়েছিল ?'

ডিরিরির চোখ ফোলা, চোখ লাল। সারা রাত সে ঘুমোয় নি। ধরা-গলায় বলল, 'সারা রাত জেগে বসেছিলাম। মনে হল, কে যেন বাড়ির চারপাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। শুধু পায়ের শব্দ। খুব ভয় হচ্ছিল। বুক কাঁপছিল। আগে কোনোদিন এমন পায়ের শব্দ শুনিনি।' গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল তার।

বিবৃবি বলল, 'তুমি তো একা নও, সঙ্গে রয়েছে তোমার চার মেয়ে। পাঁচজন থাকতে ভয়ের কি আছে ? মিছিমিছি ভয়।'

দিন কাটল। এদিনও মা বাড়ি থেকে বেশি দূর গেল না। ভয় তার কাটেনি। বিকেল যত গড়িয়ে যাচ্ছে, তার ভয়ও বেড়ে যাচ্ছে। এমনি করে আঁধার নামল। গাছের সারির ওপারে সূর্য ডুবে গেল। আবার শুরু হল তার কান্না। একটানা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে, 'হায়! হায়! ডিরিরি!' সারা রাত এমনিভাবে সে কেঁদে চলল।

বিবৃবি শুনছে তার কান্না। সারা রাত। সে-ও ঘুমোতে পারল না। শেষকালে সকাল হলেই বিবৃবি ডিরিরির বাড়িতে চলে এল। এসেই বলল, 'কালও তো সারা রাত কেঁদেছ শুনতে পেলাম। ভয় ? আমায় বিয়ে কর। আমি থাকব তোমার কাছে। আর ভয় পাবে না।'

ডিরিরি মেয়েদের দিকে চেয়ে দেখল। কেমন মনে হল। মাথা নেড়ে সে 'না' বলল। ডিরিরি তাকে বিয়ে করতে পারবে না। মুখে আর কিছু বলল না।

বিবৃবি আর কিছু না বলে চলে গেল। সে মাঠের মাঝখানে গিয়ে কাজ করতে লাগল। একমনে কাজ করছে সে। সে একটা সুন্দর ধনুক তৈরি করল। ধনুকে অনেকগুলো রঙ। চোখ-জুড়োনো রঙ। আকাশের একদিক থেকে

অন্যদিকে ছড়িয়ে-পড়া ধনুক। এই ধনুক পৃথিবী থেকে তারার দেশে যাওয়ার রঙিন পথ। আঃ, কি সুন্দর !

ডিরিরি আকাশ-পানে চেয়েই ভয়ে কাঁপতে লাগল। সব জিনিসেই তার ভয় ! আর এমন অবাক-করা বিশাল ধনুক সে আগে কখনও দেখেনি। তার বুক আরও বেশি কাঁপতে লাগল। যদি বাছাদের কিছু হয় ? সে আরও জোরে কাঁদতে শুরু করে দিল। 'হায় ! হায়! হায় !'

ডিরিরি এদিক-ওদিক চাইল। আহা, যদি বিব্‌রিকে দেখতে পেত ! মনে সাহস পেত। বড় একা একা লাগছে। কিন্তু এধারে-ওধারে কোথাও সে বিব্‌রিকে দেখতে পেল না। সে তখন কোথায় কোন্ বনে চলে গিয়েছে ডিরিরি তা জানে না। জল-ভরা চোখে তবু সে পড়শীকে খুঁজতে লাগল। ডিরিরি আকাশের ঐ দৃশ্য আর সহ্য করতে পারছে না। এবার বোধহয় তার বুক ফেটেই যাবে। সে চার মেয়ের হাত ধরে অল্প দূরে পড়শীর বাড়ির দিকে হাঁটছে আর বারবার আকাশে ও পেছনের দিকে চাইছে। শেষকালে কোনোরকমে বিব্‌রির বাড়ির সামনে এল।

উঁকি মেরে দেখল, বিব্‌রি ঘরে বসে রয়েছে। একটা বুমেরাং বানাচ্ছে। ডিরিরি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ওটা কি ? কেন হল ? এখন কি করি ?'

বিব্‌রি ঠোঁটের কোণে একটু হেসে বলল, 'কি, ঐ রামধনু ? ও তো আমিই বানিয়েছি। তাহলেই বুঝে দেখ, আমি কত শক্তিমান। দেহে কত শক্তি থাকলে ওরকম বড় জিনিস বানানো যায় ! তাইতো বলছি, আমায় তুমি বিয়ে কর, তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো বিপদ আসতে দেব না। ভয়ে ভয়ে দিন আর রাত কাটাতে হবে না।'

ডিরিরি কিছুই বলছে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মধ্যে আকাশের দিকে চাইছে, আবার বিব্‌রিকে দেখছে। মুখে কিছুই বলছে না।

বিব্‌রি বলল, 'আর যদি বিয়ে না করো তবে এমন জিনিস বানাবো যা আরও অবাক-করা। সেই জিনিসটা এমন সাংঘাতিক হবে যে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কেউ বাঁচবে না। তাও আমি পারি।'

ডিরিরি কাঁপতে লাগল। তাহলে তো তার মেয়েরা মরে যাবে ! সে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেল। হ্যাঁ, সে বিব্‌রিকে বিয়ে করবে। বিব্‌রির চোখেমুখে হাসি ঝরে পড়ল।

সেইদিন ঘন গাছের নিচে ডিরিরি আর বিব্‌রির বিয়ে হয়ে গেল।

বিব্‌বির চোখে হাসি। মেয়েরা বাবা-মাকে ঘিরে আনন্দ করছে। অনেকদিন তারা এমন প্রাণ খুলে বাইরে দৌড়াদৌড়ি করে নি।

অনেক অনেক কাল তারা সুখে-শান্তিতে সংসার করল। কত নিশ্চিন্ত ডিরিরি, কত আনন্দ বিব্‌বির।

শেষকালে তারা একদিন বুড়ো হয়ে মরে গেল। মরবার পরে দুজনেই হয়ে গেল পাখি। ডিরিরি হল খঞ্জন পাখি। দুরন্ত গরমের নির্জন রাতে ডিরিরি আজও খঞ্জন পাখি হয়ে ডেকে চলে, 'হায়! হায়! ডিরিরি! হায়! ডিরিরি।' ভয়ে একদিন সে যেভাবে কাঁদত, খঞ্জন পাখি হয়েও সে ভয় সে ভুলতে পারেনি। তাই আজও খঞ্জন পাখি ওভাবেই ডেকে চলে আঁধারে।

আর বিব্‌বি হল কাঠঠোকরা। উঁচু উঁচু গাছের মাথায় থাকলে নখ ঢুকিয়ে সে ঠুক্‌রে চলে শক্ত গাছ। শক্ত ঠোঁটে আঘাত করে করে সে-ও চায় আর একটা রামধনু তৈরি করতে। পৃথিবী থেকে তারার দেশে ছড়িয়ে পড়বে সেই ধনুক। পারছে না, তাই বেদনায় আঘাত করে চলেছে। আজও তার সেই কাজের বিরাম নেই। রামধনু সে বানাবেই। আর একটা।

নারকেল গাছ

আমাদের দ্বীপ সবুজ গাছে ভরা। অল্প দূরে নীল জলের সাগর। অত বড় সাগর কোথাও নেই। সাগরের ওপার নেই। এই দ্বীপের পুব দিকে বয়ে গিয়েছে একটা নদী। পাহাড়ের কোল বেয়ে নদী বইছে। টলটলে জল। মিষ্টি ঠাণ্ডা জল। এমন নদীর জল আর কোথাও নেই।

সেই নদীর পারে যে গ্রাম সেই গ্রামে থাকত এক মেয়ে। অপরূপ সুন্দরী সেই মেয়ে। তার সবচেয়ে ভালো লাগত সাঁতার কাটতে। জলে নামলে তার মন সবচেয়ে ভালো থাকত। নদীর তীরে ঘন গাছ-গাছালি। গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের বড় বড় পাথরের কোল ছুঁয়ে নদী বয়ে চলেছে। আর সেই নদীতে প্রতিদিন চান করে সেই মেয়ে। মনের আনন্দে সাঁতার দেয়। আশপাশে কত রঙিন মাছ ভেসে ভেসে চলে, তারাও মেয়ের সঙ্গে খেলা করে।

একদিনও বাদ যায় না। সব দিন মেয়ে নদীতে যায়। ছোট্ট নদী, ভয় নেই। একা একাই সে যায়। প্রতিদিন তার আরও বেশি বেশি ভালো লাগে সাঁতার কাটতে। বড় আনন্দে দিন বয়ে যায়।

দুপুরে মেয়ে জলে নেমেছে। সাঁতার কাটতে কাটতে, জলে খেলা করতে করতে বিকেল হয়ে গিয়েছে। তবু জল ছেড়ে ওঠার নাম নেই। হঠাৎ মেয়ের মনে হল, কি যেন তার গায়ে লাগল। কে যেন আলতো করে তার দেহ বার বার করে স্পর্শ করছে। স্বচ্ছ টলটলে জল। নিচে তাকিয়ে দেখে, মস্ত বড় একটা মাছ তার পেছনে, সে-ই তাকে স্পর্শ করছে। মাছটির চোখ বড় বড়। ডাগর চোখ। মুখে কেমন হাসিহাসি ভাব। ভয়ে আঁৎকে উঠল মেয়ে। তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে তীরে উঠল। বুক কাঁপছে। জলের দিকে তাকিয়ে দেখল, মাছটা আস্তে আস্তে পাহাড়ের বড় বড় পাথরের ফাঁক দিয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়ল। পাহাড়ের ঐ এলাকায় যেখানে আঁধার আঁধার জল, সেখানে এরকম অনেক মাছ রয়েছে। মেয়ে তা জানে। কিন্তু ওরা তো কখনো পাথরের ফাঁক ছেড়ে টলটলে জলে আসে না? তবে? মেয়ে খুব ভয় পেয়ে গেল। মেয়ের সাঁতার দেবার এলাকায় ওদের তো আগে কখনও দেখেনি? ভাবল, আর আসবে না এখানে।

পরের দিন। দুপুর বেলা। মেয়ের মন ছট্‌ফট্‌ করছে। কতদিন ধরে এই সময়ে সে নদীতে যায়। না গিয়ে থাকতে পারে না। আজও পারল না। ভাবল, ও একদিন ওরকম হয়েছে। আর হবে না। মেয়ে চলল নদীর দিকে। একটু ভেবে জলে নেমে পড়ল। না, কিছুই তো হচ্ছে না? মনের আনন্দে সাঁতার কাটছে মেয়ে।

হঠাৎ কোমরের কাছে কিসের যেন ছোঁয়া লাগল? সেই বড় ডাগর চোখের মাছ নয় তো? মেয়ে ভয়ে আঁৎকে উঠল। ভয়ে ভয়ে জলের নিচে চেয়ে দেখল। মাছটি আস্তে আস্তে জলের ওপর মাথা তুলল। কি শান্তি তার চোখে-মুখে! মাছ চেয়ে রয়েছে মেয়ের ভেজা সুন্দর টল্‌টলে মুখের দিকে। এত সুন্দর এই মাছ, এত শান্ত ওর চোখ-মুখ, এত মিষ্টি ওর স্বভাব! মেয়ের আর একটুও ভয় করছে না। মাছ তাকে তো আঘাত করছে না? মাছ তো তার কোনো ক্ষতি করছে না? তবে আর ভয় কিসের? মেয়ে সাঁতার কাটতে লাগল, ডুবছে ভাসছে। মাছ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। অল্পক্ষণ পরে জলের নিচে চলে গেল মাছ। এঁকেবেঁকে পাথরের ফাঁক দিয়ে আঁধার জলে মিলিয়ে গেল মাছ। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। মেয়ে উঠে এল জল থেকে।

দিনের পর দিন চলল এই জলের খেলা। মেয়ে জলে নামলেই কোমরে মাছের ছোঁয়া লাগে। তারপরে মাছ মাথা তোলে জলে। মেয়েরও খুব আনন্দ। সে-ও মাছের সঙ্গে সাঁতার কাটে, ডোবে ভাসে। জলে মেয়ের সঙ্গী হয়ে গেল সেই মাছ। মেয়ের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আর একটুও ভয় করে না। মাছ ডাগর চোখে মেয়েকে চেয়ে চেয়ে দেখে.—মেয়ের খুব ভালো লাগে। এমনি করে অনেকদিন কেটে গেল।

একদিন। মেয়ের চান হয়ে গিয়েছে। বালুতীরে বসে সে বিশ্রাম করছে। চুল আর দেহের জলে সেখানকার বালি ভিজে উঠেছে। অল্প অল্প ফুর্‌ফুরে হাওয়া দিচ্ছে। হঠাৎ মেয়ে দেখল, সাঁতার কেটে মাছ তীরের কাছে এল। সেখানে অল্প জল। অল্প ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ছে। হঠাৎ মাছের দেহ পাল্‌টে গেল। কোথায় সেই মাছের দেহ? সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক কিশোর দেবতা। কি অপরূপ তার রূপ!

কিশোর দেবতা মানুষের ভাষায় বলল, 'সুন্দরী মেয়ে, আমি ঐ পাথরের ফাঁকের মাছেদের দেবতা। ওরা আমার প্রজা, ওদের রাজা আমি। বিপদে-

আপদে প্রাণ দিয়ে ওদের রক্ষা করি। ওদের কোনো বিপদ ঘটতে দি না। তাই ওরা সুখী।'

মেয়ে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কোনো কথাই সে বলতে পারছে না।

কিশোর দেবতা আবাব বলল, 'আমি আর আমার মাছেরা কখনও ঐ পাথরের আঁধার রাজ্য থেকে কখনও টল্‌টলে জলে আসি না। ওখান থেকেই সবকিছু দেখতে পাই। তোমাকেও রোজ দেখতাম। তোমাকে ভালোবেসে ফেললাম। পারলাম না লুকিয়ে থাকতে। তোমার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য অনেকদিন তোমার আশেপাশে ঘুরেছি। তোমার কোমব ছুঁয়ে জানিয়েছি আমি তোমায় ভালোবাসি। তোমার মতো রূপসী মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। তুমি আমায় ভয় পেয়ো না, আমি কিশোর দেবতা। আমি তোমায় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। তুমি বোঝ না?'

না, মেয়ে ভয় পায় নি। যখন মাছ হয়ে জলে খেলা করত তখনও ভয় পায় নি। আর এখন তাব সামনে বসে রয়েছে সুন্দব কিশোর দেবতা। তাকে ভয় পাবে কেন? মেয়ে কিশোরকে ভালোবাসল। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা।

এর পরদিন থেকে মেয়ে অনেক আগে আগে নদীতে চান করতে আসে। জলে মাছের সঙ্গে সাঁতার দেয়, খেলা করে। তারপরে তীরে উঠে আসে। তীরে এলে মাছ হয়ে যায় কিশোব দেবতা। বালুতীরে দুজনে বসে থাকে। চুল আর দেহের জল শুকিয়ে গেলে সবুজ বনে পথ হাঁটে। পাশাপাশি। হাত ধরাধরি করে। কি আনন্দ। কত সুখ। ঘন বনের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। পথে শুকনো পাতা। পাতাব আওয়াজ তুলে তারা পথ হাঁটে। এই সময়টা মেয়ের সবচেয়ে ভালো লাগে। কিশোর দেবতারও। এই পাশাপাশি হেঁটে চলার সময় দুজনের চোখ-মুখের চেহারাই কেমন পাল্‌টে যায়!

কিন্তু যে মুহূর্তে ফিরে যাবার সময় হয়, যে মুহূর্তে কিশোর দেবতা বালুতীর থেকে নদীর জলে পা দেয়, সেই মুহূর্তে সব অন্যরকম হয়ে যায়। কিশোর চোখের পলকে মাছ হয়ে যায়। এঁকেবেঁকে সাঁতার দিয়ে পাথরের অন্ধকার ফাঁকের মধ্যে মিলিয়ে যায়। মেয়ে জল ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে,—মেয়ের চোখ-মুখও পাল্‌টে যায়। বেদনায় কান্নায়।

যত দিন যায় মেয়ে বেশি বেশি করে কিশোরকে ভালোবেসে ফেলছে। এমন ভালোবাসা কেউ কোনোদিন দেখেনি, শোনেনি। প্রতিদিন একসাথে পথ হাঁটে। আগের দিনের চেয়ে আজ আরও ভাল লাগছে। প্রতিদিনই আগের দিনের চেয়ে বেশি ভালো লাগে।

একদিন মেয়ে চান করে তীরে বসে রয়েছে! মাছ সেদিন জলে আসেনি। মেয়ের সঙ্গে জলে সাঁতার কাটেনি। মেয়ের মন খারাপ। হঠাৎ মেয়ে দেখতে পেল, কিশোর দেবতা আসছে। মেয়ের চোখে হাসি ঝরে পড়ল। কিন্তু কিশোর আসছে খুব আস্তে আস্তে, চোখে-মুখে বর্ষাকালের কালো মেঘ। এমন তো কখনও হয়নি? মেয়ের বুক কেঁপে উঠল।

কিশোর এসে মেয়ের পাশে বসল। মেয়ের একটি হাত তুলে নিল নিজের কোলের ওপর। আস্তে আস্তে বলল, 'এবার বিদায় নেবার সময় হল। আর দুজনের দেখা হবে না। আমায় শেষ বিদায় দাও।'

'না, না, ও কথা বলতে নেই। ও কথা বোলো না। আমি তোমায় ছেড়ে বাঁচতে পারব না। বিদায়ের কথা বলতে নেই।' মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে কিশোরের বুকে মুখ লুকিয়ে ফেলল। কিশোরের বুক ভিজে যাচ্ছে।

একটু পরে কিশোর বলল, 'এ হল দেবতার আদেশ। আমাদের মন না চাইলেও এ আদেশ মানতে হবে। দেবতার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই। বিদায় নিতেই হবে, বিদায় তোমায় দিতেই হবে। দেবতাদের দেবতার ইচ্ছে নয়, আমাদের মিলন হোক। আমি দেবতা, আমার দেবতার কথা মানতেই হবে।'

কিশোরের চোখের জলে মেয়ের কপাল-মুখ ভিজে গেল। মেয়ে চেয়ে রয়েছে কিশোরের মুখের পানে। সে-ও কাঁদছে।

কিশোর বলল, 'এক্ষুনি আমি বিদায় নিয়ে চলে যাব। কিন্তু তোমায় দিয়ে যাব এমন এক অমূল্য রত্ন যাতে তুমি বুঝবে আমি তোমায় কত ভালোবাসি। সবসময় তোমার একথা মনে পড়বে। শুধু আজ আমি তোমায় যা করতে বলব, তা তোমায় করতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর আমার সেই কথা তুমি রাখবে। লক্ষ্মী-মেয়ে, তোমায় হ্যাঁ বলতে হবে।' কিশোর ঝর্‌ঝর্‌ করে কাঁদছে।

কান্নায় ভেঙে পড়েছে মেয়ে। কি কথা? কথাটা বলবার আগে কিশোর কেন এমনভাবে কাঁদছে? কি প্রতিজ্ঞা? কেন সে প্রতিজ্ঞা করাচ্ছে? তবু মেয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল। কিশোরের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কিশোর নদীর ওপারের সবুজ গাছের সারির দিকে চেয়ে মেয়েকে

সেই কাজের কথা বলল। মেয়েকে যা করতে হবে সব খুলে বলল।

পরের দিন এই দ্বীপে প্রলয় ঘটে যাবে। অবিরাম বৃষ্টি পড়বে। এমন বৃষ্টি আগে কেউ কখনও দেখেনি। নদীর জল ফুলে-ফেঁপে উঠবে, কূল ছাপিয়ে যাবে। দ্বীপের জমি ডুবে যাবে, উঁচু উঁচু গাছ ডুববে তার পরে। সব জলের নিচে। মেয়ে দেখতে পাবে, সব ডুবে গিয়েছে। তার নিজের বাড়ির চারপাশেও থৈ থৈ জল। কিন্তু মেয়ের বাড়ি ডুববে না, সে বাড়ি সেরকমই থাকবে। সেই সময় কিশোর দেবতা মাছের রূপ ধরে মেয়ের উঠোনে আসবে। সাঁতার কেটে আসবে। মেয়ের দোরের সামনে এসে মাছ মাথা তুলবে। জলের ওপরে। আর তখন....। তখন মেয়ে যেন ঘর থেকে ঘাস কাটার কাস্তে নিয়ে আসে। এক আঘাতে মাছের মাথা যেন কেটে ফেলে। সেই মাথাটা নিয়ে মাটিতে পুঁতে দেবে। সেখানটা নজর রাখবে।

মেয়ে লুইয়ে পড়ল কিশোরের বুকে। এ কি বলছে সে? না, না, কিছুতেই এই নিষ্ঠুর কাজ সে করতে পারবে না। এর চেয়ে মরণ ভালো। এ কথা মেয়ে সহ্য করতে পারছে না। কিশোর যেন অমন কথা আর না বলে। 'এ আমি কিছুতেই পারব না। তোমার সঙ্গে চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ হলেও এ কাজ আমি পারব না।'

কিশোর মেয়ের মুখ দুহাতে তুলে ধরে বলল, 'দেবতাদের দেবতার এ আদেশ। এ তোমাকে পারতেই হবে। না, না বলতে নেই। তুমি যে একটু আগে প্রতিজ্ঞা করলে? প্রতিজ্ঞা করে অমান্য করতে নেই। তাছাড়া দেবতার আদেশ, আমাদের ইচ্ছেয় কিছুই হবার নয়। এটাই হতে হবে।'

কিশোর দেবতা মেয়েকে আল্‌তোভাবে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হেঁটে চলল নদীর দিকে। একবার পেছন ফিরে চাইল। চোখের জলে মুখ-বুক ভেসে যাচ্ছে। জলে পা দিল কিশোর। মুহূর্তে দেহ পাল্‌টে গেল। সে মাছ হয়ে পাথরের আঁধার ফাঁকের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

মেয়ে আছড়ে পড়ল বালুতীরে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। দেহ কেমন অবশ হয়ে আসছে। বুকের মধ্যে বর্ষাকালের নদীর ঢেউ, চোখে পাহাড়ী ঝরনা।

রাত তখনও শেষ হয়নি। বৃষ্টি শুরু হল। সে কি বৃষ্টি। ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ আর থামছে না। ভোর হল। বৃষ্টি পড়েই চলেছে। নদীর জল তীর ছাপিয়ে

দ্বীপের মধ্যে ঢুকছে। নদীর জল, আকাশের জল। জল বাড়ছে। জমি ডুবল, বাড়িঘর ডুবল, গাছ ডুবল। সত্যিকার প্রলয়। মেয়ে সব জানে আগে থেকেই। কিশোর চলে যাবার পর থেকে সে ঘুমোয় নি, তার কান্নাও থামেনি।

গোটা দ্বীপ এখন মস্ত বড একটা পুকুর। এ পুকুরের কোনো তীরভূমি নেই। জল উঠল মেয়ের উঠোনে। কিন্তু তার বাড়ি ডুবল না। মেয়ে বসে রয়েছে দাওয়ায়। চোখ রয়েছে উঠোনের জলে। ঝাপ্‌সা চোখে মেয়ে বসে রয়েছে।

জলে ছলাৎ শব্দ হল। জল কেঁপে কেঁপে উঠল। মেয়ের বুক কেঁপে কেঁপে উঠল। হঠাৎ উঠোনের জলে দাওয়ার সামনে মাছের মাথা ভেসে উঠল। কিশোর দেবতা মাছের রূপে ডাগর চোখে চেয়ে রয়েছে মেয়ের পানে। চোখে কিসের যেন মিনতি। মেয়ে বুঝল, শেষ সময় এসে গিয়েছে। চিরবিদায়ের সময়। এখন তার কথা-দেওয়া প্রতিজ্ঞা রাখতেই হবে। বুক চৌচির হয়ে গেলেও প্রতিজ্ঞা রাখতেই হবে।

ঘরে ঢুকল মেয়ে। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আন্দাজে হাতে তুলে নিল ঘাস কাটার কাস্তে। দাওয়ায় এল। মাছ মাথা তুলেই রয়েছে। সবকিছু আবছা। এবার মেয়ের চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে এল। কাস্তে এধার থেকে ওধারে গেল। মাছের মাথা দেহ থেকে খসে পড়ল। মেয়ে জল থেকে তুলে নিল সেই মাথা। বুকের কাছে জড়িয়ে ধরল।

বাড়ির পাশে এক খণ্ড জমি জেগে রয়েছে। এত জলেও সে জমি ডুবে যায় নি। মাটি সরিয়ে গর্ত করে মেয়ে মাছের মাথা পুঁতে দিল সেখানে। কয়েক ফোঁটা নোন্‌তা জল গড়িয়ে পড়ল সেই মাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশে রোদ ঝল্‌মল্ করে উঠল। জল কমতে লাগল। গাছের মাথা জেগে উঠল, গাছের মাঝখানটা দেখা গেল। বাড়িঘর দেখা যেতে লাগল। সোঁ সোঁ শব্দে জল নদীর দিকে নেমে যাচ্ছে। বালি-ঘাস-ছোট গাছ-গাছালি সব দেখা যাচ্ছে। আবার সেই আগের দ্বীপ।

জল নেমে গেল। সবার মনে আনন্দ। কিন্তু মেয়ের মনে সুখ নেই, মুখে কোনো কথা নেই। সে সবসময় ভাবে কিশোর দেবতার কথা। কাস্তের কথা মনে হতেই মেয়ে আঁৎকে ওঠে। হায়! কোথায় হারিয়ে গেল সেইসব সুখের দিন! মেয়ে আর নদীতে যায় না চান করতে। সব আনন্দ শেষ।

প্রতিদিন ভোরবেলা উঠেই মেয়ে সেই জমিখণ্ডের পাশে গিয়ে বসে যেখানে মাটির নিচে রয়েছে কিশোর দেবতার মাথা। প্রায় সারাদিনই মেয়ে সেখানে বসে থাকে আর ভাবে।

কিশোর দেবতা নজর রাখতে বলেছিল। তাই তাকিয়ে থাকে মেয়ে। কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। কিছুই দেখতে পেল না মেয়ে। তবু কিশোরের আদেশ সে মেনে চলে।

হঠাৎ মেয়ে একদিন ভোরবেলা দেখল, মাটির ওপর সবুজ মতন কি যেন দেখা যাচ্ছে। চোখ আরও কাছে নিয়ে দেখল,—সবুজ চারার কচি পাতা। পরের দিন দেখল,—কচি পাতা দুভাগ হয়ে অল্প বড় হয়েছে। আরও সবুজ হয়েছে। দিনে দিনে চারা ভালোভাবে মাথা তুলল। মাটি ফুঁড়ে বড় হচ্ছে চারা। এমন গাছ মেয়ে আগে কখনও দেখেনি। এই দ্বীপে এরকম গাছ নেই। নতুন গাছ। গাছ বড় হচ্ছে। গাছের মাথায় শুধুই বড় বড় শক্ত পাতা। মাথার নিচে কোনো ডালপালা নেই, গোল কালো শক্ত খুঁটির মতো শুধুই দেহ।

দেখতে দেখতে সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে সে গাছ ওপরে উঠল। এত লম্বা গাছ দ্বীপে আর নেই। একদিন গাছের মাথায় সাদা ফুল দেখা দিল। ফুল ঝরে পড়ল। ছোট্ট ছোট্ট ফল দেখা দিল। সবুজ ফল। এক ডালে অনেক ফল। এমন আকারের ফল মেয়ে আগে কখনও দেখেনি। ফল বড় হচ্ছে। ফলের সবুজ রঙ আরও গাঢ়-ঘন হচ্ছে। একসময় সবুজ আভা মিলিয়ে গেল। কেমন শুকনো হয়ে এল ফলের দেহ। আরও শুকনো। হঠাৎ একদিন ঝড়ো হাওয়ায় কয়েকটা ফল বালির ওপর আছ্‌ড়ে পড়ল। মেয়ে ফলগুলো নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কিশোর দেবতার দান।

সবাই এল। দ্বীপের সবাই। অবাক হয়ে সেই গাছকে দেখতে লাগল। মেয়ের হাতের ফলগুলো পরখ করল। মেয়ে বলল, 'জলের মাছেদের কিশোর দেবতা এই গাছ দিয়েছে, ফল দিয়েছে।' আর কিছু বলল না।

দ্বীপের একজন বুড়ো মানুষ ধারাল অস্ত্র দিয়ে ফলের খোসা ছাড়িয়ে ফেলল। মানুষের মাথার মতো শক্ত ফল বেরিয়ে এল। ফল ফাটিয়ে দিতেই বেরিয়ে পড়ল ভেতরের শাদা শাঁস আর কিছুটা জল। বুড়ো সবাইকে একটু একটু শাঁস দিল। মুখে দিয়ে সবাই অবাক হয়ে গেল।

এমন সুস্বাদু ফল তারা আগে কখনও খায়নি। নতুন অভিজ্ঞতা। মেয়ে কিন্তু খেল না, শাঁস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তাকিয়ে রইল ছাড়ানো ফলের শক্ত খোলাটির দিকে।

মেয়ে মাটি থেকে তুলে নিল ফলের শক্ত খোলাটি। খোলার গায়ে দুটি চোখ আর একটি মুখ। কিশোর দেবতা নিজের জীবন দিয়ে যে অমূল্য রত্ন তাদের দিয়ে গেল, সেই ফলে তার চোখ আর মুখের চিহ্ন রেখে গেল। সাঁতার কাটবার সময় মেয়ে মাছের যে চোখ আর মুখ দেখেছিল, সেই চোখ-মুখ এই ফলের গায়ে আঁকা হয়ে রইল। কিশোর দেবতা বলেছিল, কোনোদিন ভুলতে পারবে না। সত্যি তাই। চিরকালের জন্য মনে পড়বে।

এই হল নারকেল গাছ আর তার ফল। দ্বীপের অমূল্য রত্ন। সেদিন থেকে পৃথিবী এই ফল পেল। এ গাছ অমূল্য রত্ন। কেননা, গাছের সব কিছু মানুষের কাজে লাগে। ফলের শাঁস, ফলের জল, বাড়ির ছাদ করার জন্য গাছের পাতা, ঝাঁটার জন্য পাতার মধ্যেকার শক্ত কাঠি, বাড়ির খুঁটির জন্য গাছের দেহ, মাছ ধরবার সরু নৌকোর জন্য গাছের দেহ। কিশোর দেবতা ঠিকই বলেছিল, অমূল্য রত্ন।

এই অমূল্য নারকেল ফলের জল কিন্তু একটু নোনতা। মেয়ে যখন তার প্রিয়তম কিশোর দেবতার মাছ-দেহের মাথা পাশের জমিখণ্ডে পুঁতে দিয়েছিল, সেই সময় মাটির ওপরে কয়েক ফোঁটা নোনতা জল পড়েছিল। দুঃখী মেয়ের কান্নাঝরা চোখের জল। সেই থেকে ফলের জলও নোনতা হয়ে রইল।

মেয়ে আর নেই। কিশোর দেবতা আজ আর নেই। কিন্তু দুজনে মিলে রয়েছে এই নারকেল ফলের মধ্যে। কিশোরের আত্মত্যাগ আর মেয়ের চোখের জল। কিশোরের দেহ থেকে হয়েছে শাঁস আর মেয়ের চোখের জলে হয়েছে ফলের নোনতা জল। দুজনেই একসঙ্গে বেঁচে রয়েছে। ভালোবাসায় বিচ্ছেদ নেই।

আদিবাসী লোককথা (দ্বিতীয় খণ্ড) : পরিশিষ্ট

যে গল্পের শেষ নেই। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ফিলিপাইন্‌স্‌ দ্বীপপুঞ্জের বাগোবো আদিবাসী গোষ্ঠীর পশুকথা। আপো আগ্নেয়গিরি পর্বতের পুবপারে দাভাও উপসাগর এলাকায় এদের বাস। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসবার পর থেকে এদের সংখ্যা বিস্ময়করভাবে হ্রাস পেতে থাকে। বর্তমান জনসংখ্যা মাত্র আড়াই হাজার। এই ধরনের লোককথা গোটা ইউরোপে রয়েছে, তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় হাঙ্গেরিতে। জাপানের হনশু ও শিকোকু দ্বীপপুঞ্জে এ রকম অনেক গল্প সংগৃহীত হয়েছে। ভারতীয় লোককথায় অসংখ্য নিদর্শন মিলবে। বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় এ গল্পের অনেক রকম রূপ আছে। ইঁদুর ছাড়াও অন্যান্য অনেক ছোট পশু গল্পে এসেছে। লোককথাটির মধ্যে আপাত হাল্‌কা রসের আড়ালে সামাজিক এক গভীর বেদনা লুকিয়ে রয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানুষের জীবনে কিভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে তারই প্রতীক যেন আত্মহননের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। খরা-বন্যা-ঝড় লোকসমাজের নিত্য সঙ্গী। এর বিরুদ্ধে লড়াই করেই বাঁচতে হয়। তবু অসহায়তা মাঝে-মধ্যে বড় দুর্বল করে দেয়। সামাজিক কাঠামো যেন ভেঙে পড়ে। সেই মানসিকতার উজ্জ্বল প্রকাশ এই লোককথাটি।

আমরা এলাম কোথা থেকে। একটি সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণ। মিনদানাও দ্বীপের বিসায়া আদিবাসী গোষ্ঠীর লোককথা। এই দ্বীপ ফিলিপাইন্‌স্‌-এর দক্ষিণে। ফিলিপাইন্‌স্‌-এর তাগালোগ আদিবাসীদের মধ্যেও এটি প্রচলিত রয়েছে। এই গল্পে দ্বীপ, সূর্য ও চন্দ্রের সৃষ্টির পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। আকাশের বাসিন্দা কিভাবে এই পৃথিবীতে এল তারও কাল্পনিক ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। ভারতের সাঁওতাল আদিবাসী গোষ্ঠীর সৃষ্টিবিষয়ক লোক-পুরাণের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষ করে বুনো হাঁস এবং জলের তলা থেকে মাটি তুলে আনবার অংশের সঙ্গে। পৃথিবী-জোড়া সমস্ত জনগোষ্ঠীর লোকপুরাণে রয়েছে, আগে পৃথিবীতে মানুষ-সূর্য-চন্দ্র-মাটি-দেশ-বনভূমি ছিল না, ছিল শুধু অকূল দরিয়া। তারপরে সব হল। কিভাবে

সৃষ্টি হল এই 'কেন'-র উত্তর খুঁজতেই সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের জন্ম। গাছ-গাছড়া থেকে ওষুধ পাওয়ার বাস্তব সত্যটিও গল্পে এসেছে। গল্পটির শেষাংশে কাব্যময় বর্ণনার মধ্যে লোকসমাজের কবি-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। পড়ে যাওয়া মেয়েকে রক্ষা করবার আকুতির মধ্যে মানবিকতা সুস্পষ্ট।

ভুল খবর। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার মাইক্রোনেশিয়ার উলিথি দ্বীপের উলিথি আদিবাসী লোককথা। অল্প দক্ষিণের ইয়াপ ও পালাউ দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যেও বহুল প্রচলিত গল্প। আফ্রিকার দাগোম্বা আদিবাসীর মধ্যে একই রকম গল্প প্রচলিত রয়েছে। সেখানে দেবতার নাম হল উনি। এই ছোট্ট লোককথাটির মধ্যে সামাজিক বেদনা ও অবিচারের এক মর্মান্তিক কান্না ঝরে পড়েছে। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় ও করুণ অভিশাপ হল দাসত্ব। সামন্তপ্রভুর অধীনে তারা ক্রীতদাস। এই দাসকে কিছুর বিনিময়ে কিনতে হয় না, জন্মলগ্ন থেকেই সে শৃঙ্খলিত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খল। এই বন্ধন থেকে তারা মুক্তি চেয়েছিল, কিন্তু আজও পায়নি। সেই জীবন একইভাবে বয়ে চলেছে। অন্যদিকে, মানুষের কদর্য শত্রুদের মধ্যে একটি হল লোভ। এই লোভের তাড়না যে কত ভয়াবহ দুর্বিপাক ঘটাতে পারে তাও প্রকাশ পেয়েছে কুকুরের আচরণে। প্রতীকের আড়ালে এই লোকককথায় মানুষের সামাজিক পরাধীনতার এক করুণ ইতিহাস লুকনো রয়েছে।

অতৃপ্ত হৃদয়। মাইক্রোনেশিয়ার উত্তরে মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের ছামোরো আদিবাসী গোষ্ঠীর লোককথা। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি যে অবিচার-অত্যাচার ছামোরো গোষ্ঠির ওপর করেছে, একমাত্র তাসমানিয়ার আদিবাসী গোষ্ঠি ছাড়া আর কেউ তেমন সহ্য করেনি। অল্প দক্ষিণে গুয়াম দ্বীপের ছামোরো গোষ্ঠির মধ্যেও গল্পটি প্রচলিত রয়েছে। চীনের দং আদিবাসীর হুবহু এরকম লোককথা আছে। লোককথাটির মধ্যে যে পুরোহিত রয়েছেন তার আচরণ ও দেবার্চনার রীতি বৌদ্ধ শ্রমণকে মনে করিয়ে দেয়। সামাজিক বৈষম্য ধরা পড়েছে সর্দারের আচরণে। বাস্তব পরিবেশে রাখালের প্রেম পূর্ণতা পায়নি, সর্দার-কন্যার মর্যাদার প্রশ্নটি প্রাচীর তুলে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পবিত্র প্রেম শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। এ জীবনে না হলেও আত্মারূপে

সে পরিতৃপ্তি পেয়েছে। এটি একটি ব্যক্তিগত ব্যর্থ প্রেমের কান্না-ঝরানো গাথা। বলবার ভঙ্গিতে লোককথাটি একটি কবিতা হয়ে উঠেছে। রাখালের পিতা যখন বলে,—আমিও পিতা—,তখন মানুষের মানবিক শাশ্বত একটি সত্য উচ্চারিত হল। মূলত ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী হলেও লোকসমাজ সামাজিক অবস্থার কথাও প্রকাশ করেছেন। কেননা, সমাজ ও সামাজিক মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ ছাড়া এদের মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

আমাদের ছোট বোন। মাইক্রোনেশিয়ার একেবারে পুবে গিলবার্ট দ্বীপ-পুঞ্জের তাবুতেইউ আদিবাসী গোষ্ঠির লোকপুরাণ। দক্ষিণে বের দ্বীপেও গল্পটি প্রচলিত রয়েছে। উত্তর সেলিবিসের গালেলা আদিবাসী গোষ্ঠির মধ্যে একই ধরনের লোকপুরাণ আছে। গল্পটির প্রথমাংশ রূপকথা ও শেষাংশ লোকপুরাণ। রূপকথা—লোকপুরাণ মিশে বেশ কিছু লোককথা তাবুতেইউদের মধ্যে রয়েছে। বিচিত্র ধরনের ধান, ভুট্টা, নারকেল কিভাবে দ্বীপে প্রথম জন্মাল তারই পুরাণনির্ভর কাহিনী। ছোট বোন সমস্ত সমাজেই এক বিশেষ মোটিফ, যেমন ভাগ্যবান ছোট ছেলে। পরিবারে ছোট মেয়ে বা ছেলে সবচেয়ে আদরের। বড় ছয় বোন পাহাড়ী ঢালুতে গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ছোট বোনের প্রতি মমতা বেশি প্রকাশ পেল। আবার জীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণও ফুটে উঠেছে ছোট মেয়ের মানসিকতার মাধ্যমে। কি সুন্দর দিন, নিথর হতে ইচ্ছে করছে না। জীবনের প্রতি এই অনুরাগ কত বাস্তব, কত সত্য। লোকপুরাণেও তা সুপ্ত থাকে নি। মানুষের সমাজে যা কিছু মহৎ সৃষ্টি তা আত্মোৎসর্গের মাধ্যমেই আসে। এ ধারণার অভিব্যক্তিও রয়েছে।

স্মৃতি-ঘেরা পাথর। মেলানেশিয়ার পাপুয়া নিউ গিনির নামাউ আদিবাসী গোষ্ঠীর রূপকথা। এরা পাপুয়ার উপসাগরে পুরারি ব-দ্বীপ এলাকায় বাস করেন। নিউ গিনির তাংগু, কেরেওয়া ও এলেমা আদিবাসীদের মধ্যেও এই রূপকথা প্রচলিত আছে। জাপান ও চীনে এই রূপকথা শোনা যাবে। জাপানে এই রূপকথার তিরিশটি বিভিন্ন রূপ সংগৃহীত হয়েছে। সেখানে রাক্ষসের নাম ওনি। ইউরোপে এই জাতীয় রূপকথা নেই। সাধারণ রূপকথার মোটিফ থেকে এই রূপকথাটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। রাজকন্যা বা হারানো মেয়েকে খুঁজতে যায় রাজপুত্র কিংবা রাজকন্যার ভাই অথবা পিতা। কিন্তু এখানে মেয়েকে

উদ্ধার করতে বিপদের মুখে এগিয়ে গিয়েছে মা। এবং শেষ পর্যন্ত মা সফল হয়েছে। রূপকথার জগতে মায়ের এই অভিযান অভিনব! আদিবাসী সমাজে মেয়েরাও যেহেতু পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে কাজ করে হয়তো মেয়েদের মর্যাদাও নামাউ সমাজে সমান, তাই মা-ই গিয়েছে অভিযানে। কিংবা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের চিন্তা চেতনার রেশ থেকে যেতে পারে এই রূপকথায়। পূজারিণী, মা ও মেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ছ'টি বুক দেখিয়ে রাক্ষসকে বোকা বানিয়েছে। রূপকথাটির জাপানী রূপে রয়েছে, ওরা রাক্ষসকে দেখিয়েছে তাদের 'গোপন অঙ্গ, জঘন অংশ.—সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ।' নারীদেহের এই অংশ দেখলে অশুভ শক্তি পরাভূত হয় বলে তাদের বিশ্বাস। নামাউ গোষ্ঠীতেও এই বিশ্বাস রয়েছে। পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কল্পনাটি অসাধারণ গীতিময়।

অগ্নিকুমার। মেলানেশিয়ার সোলোমন দ্বীপপুঞ্জের বোগেনভিল অঞ্চলের দক্ষিণে ছোট্ট দুটি দ্বীপের মোন্-আলু আদিবাসী গোষ্ঠীর রূপকথা। এরা এখনও অনেকাংশে যাযাবর। তার প্রভাব পড়েছে এই গল্পটিতেও। ফিলিপাইন্স্-এর মিনদানাও এলাকার কুলামান আদিবাসীর মধ্যে ও জাপানের ওকিয়েরাবু দ্বীপে অনুরূপ রূপকথা রয়েছে। সৎ মা. অজেয় নায়ক, পুরুষ সিণ্ডেরেলার ঐতিহ্য, নায়কের বিপদে সাহায্যকারিণী মেয়ে ও দুষ্টের দমন মোটিফগুলি এই গল্পে খুব স্পষ্ট। সৎ মায়ের অত্যাচারে অগ্নিকুমার ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। সে দূরের পথে ভাগ্য অন্বেষণে গিয়েছে। অধিকাংশ রূপকথায় দেখি, ছেলে অন্য রাজ্যের মেয়েকে বিয়ে করে অর্ধেক রাজত্ব ও বৌ পেয়ে সেখানেই থেকে যায়। আর ফেরে না সে। দু-একটি ব্যতিক্রম অবশ্য রয়েছে। বাংলার রূপকথায়ও আছে। এবং সেখানেই গল্প শেষ হয়,—রাজপুত্র ও রাজকন্যা সুখে শান্তিতে রাজত্ব করতে লাগল। এই রূপকথায় অগ্নিকুমার ফিরে এসেছে,—বাবা-মাকে সে দেখতে চায়। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য সৎ মাকে শাস্তি দেওয়া। দুষ্ট মা বেঁচে রয়েছে। এটা লোকসমাজের ঠিক পছন্দ নয়। হতচ্ছাড়া ছেলেটা ফিরে এল নাকি? সৎ মা উদ্বিগ্ন। সমুচিত শাস্তি সে পেল। লোকসমাজ মনে মনে যা চায়, বাস্তব পরিবেশে তা সফল না হলেও গল্পের মধ্যে সে আশা মিটিয়ে নেয়। ইচ্ছাপূরণের ব্যাপ্ত বিচরণ-ক্ষেত্র হল লোককথা। সৎ মায়ের কাছে বাবার অসহায়তাও বড় করুণ। ছেলের প্রতি স্নেহ থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কাছে স্বামী অসহায়। চরম সামাজিক

বাস্তব চিত্র। অগ্নিকুমার যখন বৌকে নিয়ে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে তখন সর্দার-পিতার কামনাটি বড মানবিক, বড পবিত্র: ওরা সুখে থাকুক, ভালে থাকুক। চিরন্তন পিতৃত্বের অসাধারণ চিত্র।

পুরনো বাডির ফুটো ছাদ। মেলানেশিয়ার একেবারে দক্ষিণে টোরেস প্রণালীর পাশে ইয়াম দ্বীপের কেবাকি আদিবাসীদের রূপকথা। ফরমোজার পাইওয়ান আদিবাসী, চীনের হুনান প্রদেশের মিয়াও আদিবাসী গোষ্ঠির মধ্যে এই রূপকথা আছে। জাপানে এই গল্পের সাতাত্তরটি ও চীনে ছয়টি রূপ সংগৃহীত হয়েছে। ভারত ও কোরিয়ায় এ ধরনের অসংখ্য গল্প আছে। এই রূপকথার প্রথম অংশে নেকড়ে বাঘের ভয় পাওয়া পর্যন্ত কাহিনীটি বাংলার রূপকথায় খুব পরিচিত। পশুপাখির দেহের বিভিন্ন অঙ্গের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য কেমন করে হল তা নিয়ে দুনিয়া-জোড়া বিচিত্র সরস পশুকথা রূপকথা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে মানুষের 'কেন'র উত্তর খোঁজার কৌতূহল, অন্যদিকে লোকসমাজের রসসিক্ত মনের পরিচয়। বানরের মুখে কোন লোম নেই, মুখ কেন লাল, লেজ কেন ছোট,—এইসব নিয়ে অজস্র কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। এই রূপকথার কাহিনীটি বলবার ভঙ্গিতে অপরূপ মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

জোনাকি। মেলানেশিয়ার নিউ হেব্রাইডিস ও তাননা দ্বীপের মালেকুলা আদিবাসী গোষ্ঠির রূপকথা। চীনের ঝুয়াঙ আদিবাসী ও লাওস এর লামেত আদিবাসীদের মধ্যেও এ রূপকথা রয়েছে। এই রূপকথায় জোনাকির পিটপিট করে আলো দেবার কারণ খুঁজতে গিয়ে লোকসমাজ একটি করুণ সমাজচিত্র এঁকেছেন। এখানেও সেই সৎ মায়ের মোটিফ। মায়ের অত্যাচার সহ্য করেছে ছেলে, আতঙ্কিত দিন যাপন করেও সে অসহায়ভাবে মায়ের কাছে থাকতে বাধ্য হয়েছে। খিদের অসহ্য যাতনা ছেলে অনুভব করেছে। তবু কিছু করার নেই। সামাজিক ও পারিবারিক প্রথায় সে শৃঙ্খলিত। বাবাও স্বাভাবিকভাবেই সৎ মায়ের পক্ষে। ছেলের জীবনে চরম অভিশাপ হল ভয়। মায়ের ভয়ে তাকে দিন-রাত কম্পমান থাকতে হয়। যে ভয়ের চরম পরিণতি হল মৃত্যুতে। মৃত্যুতেই রূপকথা শেষ হল না। সে জোনাকি হয়ে পয়সা খুঁজছে। আশ্চর্য প্রতীক। সমাজের নিষ্ঠুরতা কি মৃত্যুতেই শেষ

হয়ে যাবার নয়? লোকসমাজ যেন এই অবিচারকে মূর্ত করে রেখেছেন এই রূপকথায়। জোনাকির মতো সুন্দর একটি পতঙ্গের আলো জ্বালার কারণ খুঁজতে সমাজের চিত্রই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ছায়াপথ। মেলানেশিয়ার অ্যাসট্রোলের উপসাগরীয় এলাকার বিলিবিল আদিবাসী গোষ্ঠির রূপকথা। নিউ ব্রিটেন ও তামি দ্বীপের উপকূলভাগে এদের বাস। মালয়েশিয়ার পশ্চিমে টোরাজা দ্বীপের পালু-গুমবাসা উপত্যকার কাইলি আদিবাসী, চীনের দাই আদিবাসী, মঙ্গোলিয়ার দাউর আদিবাসী গোষ্ঠির মধ্যে একই গল্প রয়েছে। রূপকথাটি মৌখিক গদ্যে বিবৃত, কিন্তু একটি গাথাকাব্য হয়ে উঠেছে। সহজ পবিত্র প্রেম, মেঠো ভালোবাসা ও করুণ সমাপ্তি রূপকথাটিকে কাব্যময় করে তুলেছে। এ যেন চিরন্তন ব্যর্থ প্রেমের মেঠো গান। আকাশে ছায়াপথ দেখা দেয়, তার কাল্পনিক উৎস-সন্ধান করতে গিয়ে লোকসমাজ এই রূপকথা সৃষ্টি করলেন। প্রতীক্ষার পরে মিলন অনেক আনন্দের। প্রতিদিনের মেলামেশায় যা একঘেয়ে হয়ে ওঠে, বছরের মাত্র একটি দিনে সেই মিলন স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রতীক্ষাতেই প্রেম গাঢ় হয়। কিন্তু মিলনের মুহূর্তেই আবার বেদনা, বিচ্ছেদের কান্না। তারা মিলিত হচ্ছে আর কাঁদছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই মিলন-মুহূর্তে'র বিচ্ছেদ ভাবনা রাধা-কৃষ্ণকে ব্যাকুল করেছে। চিরন্তন মানবমন অসম সামাজিক বিকাশ সত্ত্বেও একইভাবে অনুভূতি প্রকাশ করেন। এইখানেই সব মানবিক সত্তা একাকার হয়ে যায়।

এসব আমাদের মা দিয়েছে। মেলানেশিয়ার সান্টা ইসাবেল ও মালাইতা দ্বীপের রোরো আদিবাসী রূপকথা। ফরমোজার কানাকানাবু আদিবাসী ও চীনের ইয়াও আদিবাসীর মধ্যেও প্রচলিত। এই রূপকথার শেষাংশে সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের আভাস রয়েছে। মায়ের কাছে সন্তান কি তা যেমন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তেমনি সন্তানের কাছে মা-ও এক অব্যক্ত অনুভবের বস্তু। দুটি সম্পর্কই অনুভূতির। বিশেষ করে গ্রামীণ লোকসমাজে যেখানে সামাজিক বন্ধন ও মূল্যবোধ খুব নিবিড় ও দৃঢ়। দুই ছেলে মাকে হারিয়ে ও পিতা স্ত্রীকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সমাজে যা কিছু বৈভব ও সম্পদ তা এসেছে মায়েরই অকৃপণ দানে ও আত্মত্যাগে। দ্বীপে গোলাভরা শস্য, মাটিতে উর্বর ফসল, টলটলে পানীয় জল, গৃহপালিত পশুর-

জল—সবই মা দিয়েছে। মা আশিস্ জানিয়েছে, আমি আর ফিরব না, কিন্তু তাতে দুঃখ নেই। তোমরা সুখী হবে। মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ তো সন্তানদের সমৃদ্ধি কামনায়। চিরন্তন মাতৃত্বের অনন্য চিত্র।

শিকারী ও কুকুর। মেলানেশিয়ার পাপুয়া উপসাগরীয় এলাকার গোয়ারিবারি দ্বীপের কেরেওয়া আদিবাসী রূপকথা। এরা দুর্ধর্ষ শিকারী গোষ্ঠী, নির্ভীক ও বলিষ্ঠ। শোনা যায় এরা একসময় নরমুণ্ড শিকার করতেন। উৎসব গৃহ কিংবা নৌকো নতুন বানাবার পরে তার উদ্‌বোধনের দিনে নরমুণ্ড শিকার করা হত। এদের অধিকাংশ লোককথাই শিকারকে কেন্দ্র করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের একেবারে উত্তরাংশে নেনেত্‌ আদিবাসী গোষ্ঠির মধ্যেও এই রূপকথা একইভাবে পাওয়া যায়। ভীত বুনো কুকুর নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দোরে দোরে ঘুরেছে। কিন্তু সে বুঝেছে, সকলেই অন্য শক্তির কাছে ভীত। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু একজন রয়েছে যে অজেয়। সবচেয়ে বিস্ময়ের, এই অজেয় জীবটির নখ নেই, থাবা নেই, ধারাল দাঁত নেই, দেহের শক্তিও তেমন নয়। কিন্তু, এই প্রাণীটি বাড়তি কিছু ব্যবহার করতে জানে যা অন্য কেউ পারে না। দশটি আঙুলে সে বাড়তি যা ব্যবহার করে সেই অস্ত্র-শস্ত্র অন্যের নেই। এই মানসিকতা থেকেই রূপকথাটির জন্ম। কুকুর কিভাবে মানুষের সঙ্গী হল সেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়েই অপরাজিত নির্ভীক শিকারীর চিত্র এল। অনুরূপ রূপকথা: আদিবাসী লোককথা (প্রথম খণ্ড), খাসি-জয়ন্তিয়া আদিবাসী গল্প: বনের কুকুর গাঁয়ে এল। পৃষ্ঠা ৯৬।

যাদু থলে ও রুপোর শিঙ। মেলানেশিয়ার মাসিম দ্বীপের দোবু আদিবাসী রূপকথা। অল্প দূরে ট্রোব্রিয়াণ্ড দ্বীপপুঞ্জেও একই গল্প রয়েছে, এই দুই এলাকার আদিবাসী গোষ্ঠি একই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণাংশে ও চীনের সীমান্ত এলাকার কাজাক আদিবাসী গোষ্ঠির মধ্যেও রূপকথাটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে রূপকথাটির মধ্যে অতি-পরিচিত এক সরস কাহিনী রয়েছে বলে মনে হবে। কিন্তু অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করলে উদঘাটিত হবে সামন্ত-সমাজের এক করুণ নির্মম চিত্র। যে সমাজে গোষ্ঠিপতি কিংবা সামন্তপ্রভু সর্বেসর্বা, সেখানে তিনিই আইন। তার ইচ্ছার বিরোধিতা করে সমাজে বসবাস করা অসম্ভব।

বুড়ো যে সম্পদ দান হিসেবে পেয়েছিল সর্দার তা কেড়ে নিয়েছে। তার ইচ্ছাই জয়ী হয়েছে। বুড়ো বুড়ির অবর্ণনীয় দারিদ্র্য ও বেদনার মধ্যে সামন্ত সমাজের কৃষকের প্রাণের কান্না ধ্বনিত হয়েছে। সমশ্রেণীর প্রতি দুর্বলতা, অনুরাগ, আকর্ষণ ও পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক সামাজিক অর্থনৈতিক নিয়ম। গরিব বুভুক্ষু বুড়োবুড়ি অন্নের উৎসের সন্ধান পেয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সমশ্রেণীর মানুষদের, গাঁয়ের না-খেতে-পাওয়া পরিবদের। অন্যদিকে সর্দার সমশ্রেণীর সামন্তপ্রভুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। যে সমাজ এই রূপকথা বলেছেন, তারা সচেতনভাবেই এই চিত্র এঁকেছেন। কেননা, এ তাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, অতিচেনা সামাজিক অভিজ্ঞতা। সাধারণ হাট-বাটের গ্রামীণ মানুষ বাস্তবে সেই অত্যাচারী সর্দারের বিরুদ্ধে হয়তো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু সে মনে মনে প্রতিশোধ নিয়েছে। এখানেও ঘটেছে তার ইচ্ছাপূরণ। নিজেদের শক্তিতে যখন প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তখন অতিলৌকিক অবাস্তব শক্তির মাধ্যমেই মানসিকভাবে প্রতিশোধ নিয়ে সে কিছুটা শান্তি পায়। কিন্তু মনোগত ইচ্ছাটি চাপা পড়েনি, শুধুমাত্র রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। নির্মম অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কাল্পনিক প্রতিশোধ গ্রহণের এ এক অনন্য সাহিত্যিক প্রকাশ।

কেশবতী কন্যা। পলিনেশিয়ার সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের আরিওই আদিবাসী গোষ্ঠির রূপকথা। চীনের দং আদিবাসীদের মধ্যেও রূপকথাটি পাওয়া গিয়েছে। বাংলার রূপকথায় কেশবতী কন্যার অনেক কাহিনী রয়েছে, কিন্তু তার আখ্যান-বস্তু অন্য ধরনের। এই রূপকথায় লোকপুরাণের কিছুটা আভাস রয়েছে। গাঁয়ের পাশ দিয়ে কিভাবে জলধারা বয়ে গেল সেই সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের কথা বলতে গিয়ে রূপকথার আদলে কন্যার আত্মত্যাগের কাহিনী শোনানো হয়েছে। এখানেও কেশবতী কন্যার চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমেই চাষের সম্পদ জলধারা বয়ে এসেছে। কন্যা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেনি। এখানে একজন শিল্পীর কথা রয়েছে, যিনি অপরূপ দক্ষতায় পাথরের নারীমূর্তি গড়েছেন। লোককথায় শিল্পীদের উল্লেখ সাধারণত থাকে না। খুব অল্প গল্পেই শিল্পীরা লোককথায় স্থান করে নিতে পেরেছেন। অথচ প্রতি লোকসমাজেই অনন্য সব লোকশিল্প রয়েছে। 'বোকা স্বামী' লোককথায় (পৃষ্ঠা ১২২) একজন শিল্পীর কথা আছে। পারিবারিক দুঃখের কথাও এসেছে। বুড়ি মাকে ঘিরে কন্যার কষ্টের সংসার। তবু প্রকৃতির বুকে, পালিত

পশুকে নিয়েই সুখী ছিল। এই মেয়ে যেন প্রকৃতি-কন্যা। প্রকৃতি থেকে তার আলাদা কোনো সত্তা নেই। মেয়ের মনে করুণার ঝরনা ধারা। তাই বুড়োর জলের পাত্র ভেঙে যাওয়ায় সে ব্যক্তিগত যন্ত্রণা সহ্য করেও জলধারা বইয়ে দিয়েছে। গাঁয়ের কাউকে সে যন্ত্রণার অংশীদার করেনি। জলধারা বয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই সবুজ ফসলে ক্ষেত ভরে যায়নি। কিন্তু মেয়ের চোখে এটি আগামীদিনের বাস্তব ছবি,—এই মুহূর্তের স্বপ্ন। গাঁয়ের মানুষের দুঃখ ঘোচাতে পেরেছে বলেই মেয়ের এমন আনন্দ।

মানুষ ওষুধ পেল কেমন করে। পলিনেশিয়ার সামোয়া দ্বীপের কাবোওগোয়া আদিবাসী গোষ্ঠীর লোককথা। পাশের দ্বীপ উপোলু ও সাভাই-এও এই গল্প রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশেও এই লোককথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই লোককথায় কয়েকটি স্পষ্ট ভাগ রয়েছে। আদিকালে মানুষ ও পশু একই সঙ্গে বনে বাস করত। পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। এই একটি বিষয় নিয়েই অসংখ্য লোককথা আছে, বিশেষ করে আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে। বিরোধিতা চলছিল কিন্তু শত্রুতা চরমে উঠল বুড়োর চামড়া আনার দিন থেকে। মানুষ পশুশিকার শুরু করল। পশুর চামড়ায় মানুষের পোশাক হল, এই স্মৃতিও রয়েছে এখানে। পরের অংশে পশুরা প্রতিশোধ নিতে চাইল। লোকসমাজ নানাভাবে পশুর ওপরে নির্ভরশীল। পশুরা তাদের দেবতা, রক্ষাকারী, পরলোকের পথপ্রদর্শক, চিকিৎসক। পশুদের মধ্যে অনেক রহস্যের সন্ধান করেছে লোকসমাজ। তাই পশু যে যাদু জানে এই বিশ্বাস বহু পুরনোকালের। এখানেও তার কথা রয়েছে। গল্পের শেষে কথক বলছেন,—ছেলেমেয়েরা, তোমরা যদি চোখ মেলে চেয়ে দেখ, দেখতে পাবে সব গাছ-গাছালি থেকেই ওষুধ তৈরি হয়। গ্রামীণ মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ এ জ্ঞান প্রাচীন ভারতের জীবকের কথা মনে করিয়ে দেয়। সমস্ত বনভূমি ঘুরে এসেও জীবক এমন কোনো গাছ গাছালি খুঁজে পায়নি যা থেকে ওষুধ তৈরি হয় না। গুরু সেদিন উপলব্ধি করলেন যে শিষ্য জীবকের চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে থাকার ফলেই এই অভিজ্ঞতা তাদের জন্মেছে।

শেয়াল ও সিংহ। পলিনেশিয়ার রাইয়াতিয়া দ্বীপের রারোটোঙগা আদিবাসী গোষ্ঠীর পশুকথা। আফগানিস্তানের কাফির ও আফ্রিদি আদিবাসীদের মধ্যেও

পশুকথাটির সন্ধান মিলেছে। পলিনেশীয় লোককথায় সিংহের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। এই হিসেবে এই পশুকথাটি ব্যতিক্রম। পৃথিবী-ব্যাপী সমস্ত লোকসমাজের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যখন তারা লোককথা বলেন, প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে দুর্বল ছোট পশুপাখিকে জয়ী করেন। হিংস্র-শক্তিশালী বৃহদাকার পশু-পাখি পরাজিত হয় ছোটদের কাছে। অবশ্য কখনই শক্তিতে এই জয় আসে না, জয় আসে বুদ্ধি-কৌশলে। বাংলার রূপকথায় টুনটুনি, পঞ্চতন্ত্রের শেয়াল এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানেও বোধহয় ইচ্ছাপূরণের বিষয়টি সক্রিয় থাকে, তার সঙ্গে মেশে দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি। এইসব পশুকথায় বলবার ভঙ্গিতে বেশ কৌতুক থাকে যার ফলে পশুকথাগুলি সরস ও মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। শেয়ালের আচরণেও এই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। অসম বন্ধুত্বের উপদেশটিও বলা হয়েছে।

আদাপা আর দখিনা বাতাস। পলিনেশিয়ার হাতুতু, হিভা-ওয়া দ্বীপের মারকুইসা আদিবাসী গোষ্ঠীর রূপকথা। হাজার হাজার বছর আগের আসিরীয় সভ্যতার আমলে পাথরের ওপরে উৎকীর্ণ রয়েছে এই রূপকথাটি। কিভাবে আদাপা নামসহ এই রূপকথাটি পলিনেশীয় আদিবাসীদের মধ্যে পাওয়া গেল তা আজও নৃবিজ্ঞানীদের কাছে এক পরম রহস্য হয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, যে কালে স্বর্গ ও দেবতা ছিল মানুষের সবকিছুর নিয়ামক, সেই আসিরীয় লোককথায় বলা হচ্ছে.—পৃথিবী বড় সুন্দর। মানুষের পৃথিবী। জীবনের প্রতি এমন প্রগাঢ় ভালোবাসা ও আকর্ষণ সেই প্রাচীনকালে কিভাবে রূপ পেল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। মারকুইসা আদিবাসীদের লোকপুরাণে পারলৌকিক জীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ রয়েছে, স্বর্গকামনায় তারা অতি আগ্রহী। তা সত্ত্বেও আদাপার মতো আশ্চর্য চরিত্র তারা লোককথায় সৃষ্টি করেছেন, যে স্বর্গের দেবরাজকে বিনীতভাবে জানিয়েছে, বাবার কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছে পৃথিবীতে ফিরে যাবে। পৃথিবীর জীবনে অনেক কষ্ট, তবু স্বর্গের অমৃত চায় না। কেননা, পৃথিবী সুন্দর। দেবরাজের ভিক্ষা ফিরিয়ে দেওয়ার মতো বলিষ্ঠ মানসিকতা যে সমাজের মানুষ প্রকাশ করতে পারেন তাদের জীবনবোধ কত গভীর তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। লোককথার বিশ্বে এ এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

কাঠবাদামের গাছ। পলিনেশিয়ার টোঙগা দ্বীপপুঞ্জের হাপাই আদিবাসী গোষ্ঠীর পশুকথা। ভাভাও দ্বীপেও গল্পটি প্রচলিত আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের এশিয়া অংশে কয়েকটি আদিবাসীদের মধ্যে থেকেও এই গল্প সংগৃহীত হয়েছে। কাঠবাদামের গাছ একসঙ্গে অনেকগুলো থাকে। কেন এমন হল এই উত্তর দিতে গিয়ে হাপাইরা কাহিনীটি বলেছেন। একটি ছোট্ট ঘটনার সূত্র ধরে কাহিনী বেড়ে চলে, এরকম কাহিনী-বিস্তার লোককথায় খুব বেশি। সমস্ত লোকসমাজেই এই বিশেষ ভঙ্গিটি রয়েছে। কাঠবেড়ালকে নিহত করল খেঁকশেয়াল,—পরের পর এই একই ঘটনা ঘটতে লাগল। কিন্তু গল্পের শেষাংশে অন্য বক্তব্য। কাঠবাদামের গাছ মাটিতে মিশে অনেক সন্তানের জন্ম দিল। সূত্র ধরে কাহিনী বিস্তারে এই ধরনের কাব্যিক পরিণতি অন্য কোনো গল্পে দেখা যায় না। শেষাংশে একটি উপদেশও রয়েছে, ওরা একা নয়, তাই ভয়ও নেই। সংঘবদ্ধ জীবনের কামনা।

ধ্রুবতারা ও শুকতারা। পলিনেশিয়ার তাতাকোতো দ্বীপের তুয়োমোতু আদিবাসী রূপকথা। সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় চীনের তারিম নদীর পশ্চিমে সীমান্ত এলাকার কিরঘিস্ আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেও রূপকথাটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পলিনেশীয় লোকপুরাণ ও রূপকথায় ধ্রুবতারা, শুকতারা সপ্তর্ষিমণ্ডল, রামধনুর প্রভাব খুব বেশি। অসংখ্য লোককথায় বারবার এদের কথা ঘুরে ঘুরে এসেছে। এই লোককথাটির মধ্যে একজন গোষ্ঠিপতির দুরন্ত ছেলের জীবনের কথা রয়েছে। একটি অন্যায় কাজ তার চিন্তাকে সম্পূর্ণ অন্য খাতে বইয়ে দিল। সে অভিযানে বেরিয়েছে, মাঝে-মধ্যে তার দুষ্টুবুদ্ধি জেগে উঠেছে। স্বভাবকে সহজে বদলানো যায় না। কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছে। অজেয় মানুষ প্রকৃতিজগৎকে বশীভূত করেছে, কিন্তু মৃত্যুর কাছে হেরে গিয়েছে। তাকে কিভাবে জয় করা যায় সে ভাবনা বহু পুরনোকালের। এই দুষ্টু ছেলেকে মৃত্যু ধাওয়া করেছে, কি অসাধারণ বেদনাময় অভিব্যক্তি। মৃত্যুকে সে বারবার ঠেকিয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি। বাস্তব অভিজ্ঞতা। লোকসমাজের কাব্যিক মনের অনন্ত প্রকাশ ঘটেছে এখানে। সব কিছুই ব্যাখ্যা দেবার প্রবণতাই মানুষের বিজ্ঞান-চেতনার প্রথম উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করেছে। আকাশের উজ্জ্বল তারকা ধ্রুবতারা ও শুকতারার সৃষ্টির পেছনে সে নিজের মতো করে উত্তর খুঁজেছে। লোককথাটি শেষ পর্যন্ত একটি করুণ গাথাকাব্য হয়ে উঠেছে। অমর রাজ্যের রাজা স্বভাবতই নিষ্ঠুর।

সে দুষ্টু ছেলেকে বারবার হত্যা করতে চেয়েছে। গোষ্ঠীপতিদের মানসিকতা এরকমই হয়। মেয়েরা তার ব্যক্তিগত সম্পদের মতো, সহজে সে তাদের অন্যের হাতে তুলে দিতে চায় না। প্রাচীন বহু সমাজই ছিল মাতৃতান্ত্রিক। তার রেশ রয়ে গিয়েছে এই রূপকথায়। দুষ্টু ছেলে রাজকন্যাকে বিয়ে করে অমররাজ্যেই রয়ে গেল। সামাজিক ইতিহাস এভাবেই লুকিয়ে থাকে লোককথার মধ্যে। রূপকথার শেষাংশে লোকপুরাণের আমেজ লক্ষ্য করা যায়।

কার ফসল কে ঘরে তোলে। পলিনেশিয়ার অস্ট্রাল দ্বীপপুঞ্জের রুরুতু আদিবাসী গোষ্ঠীর পশুকথা। আফ্রিকার বাভেন্দা ও হকোহ আদিবাসীদের মধ্যেও পশুকথাটি রয়েছে। সমাজের একটি নির্মম সত্য রূপকের মাধ্যমে এখানে প্রকাশিত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ সমাজে কিছু মধ্যশ্রেণী থাকে যারা সমাজের অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। পরিশ্রম না করেও শুধু দেহের শক্তিতে কিংবা কৌশলে সম্পদ ভোগ করে। যে কৃষক ফসল ফলায়, অনেক সময়েই ফসল তার গোলায় ওঠে না। এখানে মাকড়সা ও শেষকালে বাজপাখি ফসল অধিকার করেছে। অধিকার করার পেছনে দুজনেরই যুক্তি রয়েছে। শুধু যুক্তি নেই কাঠবেড়ালের। যে কাঠবেড়াল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে ফসল ফলিয়েছে, সে-ই কেবল নীরবে সরে দাঁড়িয়েছে। সর্দার পশুরাও স্বাভাবিক কারণেই শক্তিমানের পক্ষে। কৃষক কাঠবেড়াল শূন্য হাতে ঘরে ফিরল, —বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। সে ভয় পেয়েছে থাবা-নখ-ওয়ালা পশুদের। আবার মাকড়সা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরে দাঁড়িয়েছে বাজপাখির রক্তচক্ষুর সামনে। এভাবেই দুর্বলের কাছ থেকে সবলেরা সম্পদ লুঠ করে। প্রতি সমাজের এই তো চিত্র। রূপকের আড়ালে জীবনের কথা।

সাতরঙা রামধনু। পলিনেশিয়ার সর্ব দক্ষিণে নিউজিল্যাণ্ডের মাওরি আদিবাসী রূপকথা। মাওরি আদিবাসী গোষ্ঠীর তুহোয়ে শাখার রূপকথা। এরা থাকেন উরেওয়েরা এলাকায়। নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা, ১০৩০ খ্রীস্টাব্দে পলিনেশিয়ার মধ্যাঞ্চল থেকে মাওরি আদিবাসীরা নিউজিল্যাণ্ডে নয়া বসতি গড়ে তোলেন। তাই অনেক দূরত্ব সত্ত্বেও পলিনেশীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য এরা এখনও বহন করে চলেছেন। প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রাখার এক অনন্য ক্ষমতা

রয়েছে আদিবাসী লোকসমাজের। সাতরঙা রামধনুর জন্ম কিভাবে ঘটল তার কাহিনী বলতে গিয়ে একটি করুণ রূপকথার সৃষ্টি হল। শর্ত না মানার ফলে মিলনে এল ব্যর্থতা। আকাশী মেয়ে মাটির পৃথিবীর ছেলেকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। সে যেতে চায়নি, কিন্তু তবু যেতে হল। শর্ত ভাঙবার ফলে জীবনে যে নানাবিধ বিপর্যয় ঘটে তার অনেক কাহিনী রয়েছে পৃথিবী জোড়া রূপকথার বিশ্বে। প্রেমের প্রতি কিশোরের নিষ্ঠা গভীরভাবে অঙ্কিত হয়েছে, —মনে শুধু একটি ছবি, সে ছবি কুয়াশাকুমারীর। প্রভাতে প্রকৃতিক পরিবেশে যে চিত্র প্রতিনিয়ত দেখা যায়, তারই ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটেছে শেষ অংশে। প্রাণের প্রেমিকাকে হারিয়ে প্রেমিক অশান্ত হয়ে উঠেছে, যতদিন তাকে না পাবে আকাশপথে প্রেমিক খুঁজে চলবে দয়িতাকে। নৈসর্গিক বস্তুর গীতিময় ব্যাখ্যায় কি অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন এই আদিবাসী গোষ্ঠি।

বোকা স্বামী। পলিনেশিয়ার মানগাইয়া দ্বীপের নগারিকি আদিবাসী রূপকথা। জাপানের মৌখিক লোককথায় একই ধরনের গল্প খুব জনপ্রিয়। জাপানে এই রূপকথার উনচল্লিশটি রূপ পাওয়া গিয়েছে। পলিনেশীয় লৌকিক সংস্কৃতিতে দেবদারু ও বাঁশ গাছ দীর্ঘ জীবনের প্রতীক। তাই বিশেষ বিশেষ উৎসবে এই দুই গাছের পাতা দিয়ে বাড়ি-মন্দির সাজানো হয়। এই রূপকথার মধ্যে বলবার ভঙ্গিতে কৌতুক প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই সামন্ত সমাজের বীভৎসতার ইঙ্গিতও রয়েছে। সামন্তপ্রভু সমাজের কর্তা ও আইন। যে মেয়েকে তার পছন্দ হবে তাকে সে নিজের ঘরে নিয়ে আসবে বৌ হিসেবে কিংবা শুধুমাত্র দেহসঙ্গী হিসেবে। এটাকে না মেনে উপায় নেই। বৌ বলেছে, কেঁদেকেটে কোনো লাভ নেই, আমাকে নিয়ে যাবেই, ওরা এরকমই। বুদ্ধিমতী বৌ জানে, বিরোধিতা করলে স্বামীর প্রাণ যাবে। কাহিনীর শেষাংশে যা ঘটেছে তা ইচ্ছাপূরণের চাহিদায়। বাস্তবে তা ঘটে না, কিন্তু অসহায় মানুষ গল্পের মধ্যেও জয়ী হয়ে শান্তি খুঁজেছে। কাল্পনিক এই পাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে জীবন যে মরুময় হয়ে উঠবে। বাস্তব সংসারের বেদনাও আছে, আবার কল্পনার আকাশও রয়েছে।

সাগরকন্যা ও আকাশের চাঁদ। পলিনেশিয়ার হাওয়াই দ্বীপের হাওয়াই আদিবাসী রূপকথা। পলিনেশিয়ার উত্তরাংশে এই হাওয়াই দ্বীপের

কাছাকাছি কাউয়াই, ওয়াহু, নাইহাউ প্রভৃতি দ্বীপেও রূপকথাটি খুব জনপ্রিয়। এই রূপকথার নায়িকার নাম হিনা। পলিনেশীয় লোকসংস্কৃতিতে হিনা একটি আশ্চর্য নাম। হিনা নানা রূপে নানাভাবে লোককথায় ও লোকসংস্কারে এসেছে। পলিনেশীয় লোকপুরাণকে বুঝতে হলে হিনা ও আগ্নেয়গিরির আগুনের দেবী পেলেকে জানতেই হবে। হিনা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত চাঁদের সঙ্গে, হিনা উর্বরতার আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, সুগন্ধযুক্ত ফুলের মালার সঙ্গে হিনার সম্পর্ক, হিনা সবকিছু গচ্ছিত রাখে, হিনার গর্ভ থেকেই সব পশু-পাখি-মাছ জন্মেছে। এই রূপকথার প্রথম অংশে রাজা ও হিনার অপরূপ মিষ্টি প্রেমের কাহিনী রয়েছে। রাজা হিনাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। এই প্রেম সত্য। কিন্তু রাজা যে সামন্তপ্রভু। প্রেম ভেঙে যেতেও সময় লাগে না। দ্বীপে যে বিপর্যয় নেমে এল তার সব দায়-দায়িত্ব নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল। প্রেম গেল ছুটে। নারী হল দাসী। পৃথিবীর সমস্ত সমাজেই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করা হয় নারীকে। ডাইনী-হত্যার পেছনে একই মানসিকতা। ভারতবর্ষের মতো ঐতিহ্যশালী উন্নত হিন্দু দর্শনের অধিকারী সমাজও নারীকে নির্যাতন করেছে এই একই কারণে। মধ্যযুগের ইউরোপেও একই মনোভাব সক্রিয় ছিল। সামন্তপ্রভু হিনাকে রানীর আসন থেকেই সরায় নি, প্রতিশোধ-পরায়ণ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে কঠিন কঠিন কাজ হিনাকেই করতে হয়। সামন্তসমাজে নারীর এই তো ভবিতব্য। হিনা মুক্তি চেয়েছে মুক্তি সে পেয়েছে। নারী মুক্তি পায় মৃত্যুতে, এখানে হিনার সুন্দর মুক্তির মধ্যে লোকসমাজের নারীর ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষাটি প্রকাশিত হয়েছে। আকাশী কন্যার সুখের জীবনের মধ্যে নিজেদের শৃঙ্খলিত জীবনের শান্তি খুঁজেছে।

উলা আর উইম্‌বো। অস্ট্রেলিয়ার আরাণ্ডা আদিবাসী পশুকথা। আরাণ্ডা আদিবাসী মধ্য অস্ট্রেলিয়ার ফিন্‌কে নদীতীরে ও ম্যাকডোনেল রেঞ্জ এলাকায় বসবাস করেন। এরা মূলত শিকারজীবী ও মৎস্যজীবী। এই পশুকথায় সাদা ও কালো টিকটিকির কথা আছে। আসলে এরা দুই আদিবাসী গোষ্ঠী সাদা ও কালো টিকটিকি এদের টোটেম। গল্পটি পড়লেই দুই আদিবাসী গোষ্ঠির কথা স্পষ্ট হবে। আদিবাসী সমাজে যেমন এক টোটেমের ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিয়ে হয় না, তেমনি অন্য গোষ্ঠির সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন সাধারণত সুনজরে দেখা হয় না। সর্দার বিরক্তি প্রকাশ করেছে, গাঁয়ে

কি সাদা মেয়ের অভাব আছে? তবু এক গোষ্ঠির মেয়ে অন্য গোষ্ঠিতে বৌ হয়। ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়, যেমন হয়েছে উলা। কিন্তু তখনই বাধে দুই গোষ্ঠিতে সংঘর্ষ, পরিণামে রক্তক্ষয়। এখানেও একই কারণে দুই গোষ্ঠিতে লড়াই বেধেছে। অবশ্য এক গোষ্ঠীর মাত্র একজনই লড়তে গিয়েছে। বুদ্ধিবলে সে জয়ী হয়েছে। ঠিক জয়ী নয়, কৌশলে অন্য গোষ্ঠিকে নিজেদের গাঁয়ে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। এই রূপকথায় মুখোশ ব্যবহারের চিত্র রয়েছে। খুব কম লোককথায় এই মুখোশ ব্যবহারের চিত্র দেখেছি। বহু পুরনো কাল থেকেই সর্দার বা গোষ্ঠিপতির পদটি উত্তরাধিকার সূত্রে সর্দারের বড় ছেলেই পায়। মানব-সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে এই বিষয়টি বহু আলোচিত। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এখনও এমন আদিম সমাজ ব্যবস্থা বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছেন যে সেখানে যোগ্যতর কোনো ব্যক্তিই সর্দারের পদ পান। উইম্‌বোর অসাধারণ বুদ্ধি ও দক্ষতায় বর্তমান সর্দার স্বেচ্ছায় তার পদ ত্যাগ করে উইম্‌বোকে করেছেন নতুন সর্দার।—নতুন সর্দার আমাদের, আমাদের উইম্‌বো।

সাত বোন। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর এলাকার ওয়ারামুন্‌গা আদিবাসী রূপকথা। উত্তর কুইন্সল্যাণ্ডের আরুনটা আদিবাসীদের মধ্যেও এই রূপকথা রয়েছে। নিউ গিনির গেন্‌দে আদিবাসী ও দক্ষিণ-পূর্ব বোর্নিওর ন্‌গাজু দায়াক আদিবাসীদের মধ্যে এই রূপকথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পলিনেশীয় লোকসংস্কৃতির মতো এই রূপকথায় সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ ও শুকতারার কথা রয়েছে। এই রূপকথায় কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে সাত বোন থাকলেও টুক্‌রো টুক্‌রো কাহিনীসূত্র দিয়ে গোটা রূপকাথার জাল বোনা হয়েছে। সাত ভাই সাত বোনের প্রেমে পড়েছে, কিন্তু সাত বোন বিয়ে করতে অস্বীকার করায় তারা আড়ালে চলে গেল। এল আবার কাহিনীর শেষাংশে। সাত ভাইয়ের পরে এল শিকারী, তারও তিনটি জীবন, একটি পারিবারিক, তার পরে যাযাবর, আবার দুই বোনকে বিয়ে করে পারিবারিক সংসার। সাত বোন থেকে দুই বোন বিচ্ছিন্ন হয়েছে, আবার শেষদিকে আকাশ-রাজ্যে মিলিত হয়েছে। কাহিনীর জাল বোনাটি বড় বিচিত্র। এই রূপকথার মধ্যে সমাজের ছবিটি বড় নিখুঁতভাবে এসেছে। শিকারী ঘর ছেড়েছে দুটি কারণে, ক্ষুধার জ্বালায় মায়ের প্রতি বিরক্তিতে আর পড়শীদের নীচতায়। কেউ তাকে ক্ষুধার অন্ন ধার দেয়নি। ক্ষুধা যে মানুষকে

কিভাবে দিশেহারা করে দেয় তার চিত্র রয়েছে। এই আদিবাসী গোষ্ঠির কাছে ক্ষুধা যে নিত্যদিনের সঙ্গী। সাত বোন বড় বিচিত্র, একা একা থাকে, কারও সঙ্গে মেশে না। বৌ হয়েও সবসময় পালাবার চেষ্টা করেছে। এরকম বিচিত্র নারী-চরিত্র সাধারণত আদিবাসী লোককথায় দেখা যায় না। কেননা আদিবাসীদের সংহত গোষ্ঠিবদ্ধ সমাজে একাকীত্বের স্থান নেই। বড় বিচিত্র এই চরিত্র-চিত্রণ। শিকারী বর্শা নিয়ে যে এমুকে মেরেছে, আসলে সেই গোষ্ঠির টোটেম হল এমু পাখি। সাত বোনের মেটে আলুর কাঠির কথা আছে। এই কাঠি তাদের লোকসংস্কারের সঙ্গে যুক্ত। একদিকে মেটে আলু তাদের জীবনধারণের অন্যতম খাদ্যসম্পদ, অন্যদিকে প্রধান খাদ্যসম্পদের একটি অংশ সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। লোকসমাজে গাছ-গাছালি সংস্কারের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। স্বামীর কাছে বৌ হল অধীনস্থ প্রাণীর মতো। স্বামীর মতামতকে মেনে চলাই বৌয়ের একমাত্র কর্তব্য। সামন্ত-প্রভুদের মানসিকতা। তাই দুই বৌ যখন দেবদারু গাছের বাকল কাটতে চায়নি, তখন স্বামী রেগে গেল, স্বামীর কথা অমান্য করা? আগুন নিবে যাওয়ার একটি ঘটনা রয়েছে। নতুন করে আগুন জ্বালানো যাবে না। কেননা, সে কৌশল সে জানে না। এখনও পৃথিবীর আনাচে কানাচে বহু আদিবাসী গোষ্ঠি রয়েছে, যারা অবিরাম আগুন জ্বালিয়ে রাখে। কোনো এক সময়ে আগুন পেয়েছিল দাবানল কিংবা অন্য কোনো উৎস থেকে, তাকে আর নিবতে দেয়নি। কেননা, নতুন করে আগুন জ্বালাবার কৌশল তারা জানে না। এভাবেই লোককথার মধ্যে পুরনো কালের সমাজের ইতিহাস লুকিয়ে থাকে।

ডিরিরি আর বিবুবি। অস্ট্রেলিয়ার একেবারে উত্তরে আর্নহেম ল্যাণ্ডের মুলাম্বা আদিবাসী গোষ্ঠির রূপকথা। পলিনেশীয় লোকসংস্কৃতিতে বার বার যেমন রামধনুর কথা এসেছে, এই রূপকথাতেও তেমনি রামধনু রয়েছে। তবে ভিন্ন প্রসঙ্গে। একজন পুরুষ তার অসাধারণ শক্তির প্রকাশ দেখাতে রামধনুর সৃষ্টি করেছে। জাগতিক মৃত্যুর পরেও সে চেষ্ট করে চলেছে আর একটা রামধনু তৈরি করতে। কিন্তু এখনও পারে নি। এই রূপকথায় একটি নিঃসঙ্গ নারী ও একটি নিঃসঙ্গ পুরুষ রয়েছে। নারী ডিরিরি স্বামীর মৃত্যুর পরে চার মেয়েকে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। মেয়েদের প্রতি স্নেহে

সে অন্য কোনো পুরুষকে আর গ্রহণ করতে সাহস পায়নি। কিংবা পূর্ব স্বামীর প্রতি ভালোবাসায়। নতুন পড়শী বিব্ব আসাতে সে আরও ভীত হয়েছে। আবার চরম ভয়ের মুহূর্তে বিব্বর সন্ধান করেছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে একা একা বাঁচা যায় না। নারীর দরকার পুরুষ, পুরুষের দরকার নারীকে। এটাই স্বাভাবিক। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে ডিরিরি বিব্বিকে গ্রহণ করতে চায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিব্বির শক্তি দেখে ও তার ভয় পাওয়ানো কথায় ডিরিরি তাকেই বিয়ে করেছে। তারা সুখী স্বামী-স্ত্রী হয়েছে। যে সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পরে বিয়ে করায় কোনো সামাজিক বিধিনিষেধ নেই সেখানে একা জীবনযাপন করা নিরর্থক। বিশেষ করে বৌয়ের বয়স যখন কম তখন অকারণ ভয়ে ভয়ে থাকবার কোনো কারণ নেই। কাঠঠোকরার বিচিত্র সুন্দর দেহ ও গাছে ঠোঁট দিয়ে আঘাত করা নিয়ে আদিবাসী সমাজে অনেক পশুকথা-রূপকথা আছে। খঞ্জন পাখি ও কাঠঠোকরার চিত্র দুটি বড় সুন্দর। একজন মৃত্যুর পরেও ভয়ে কেঁদে চলেছে, অন্যজন অসীম ধৈর্যে আর একটি সৃষ্টিকার্যে জীবনপাত করছে।

নারকেল গাছ। এই রূপকথাটি হাওয়াই দ্বীপ ছাডা পলিনেশিয়ার প্রতিটি দ্বীপের আদিবাসীদের সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্প। এখানে যে মাছের কথা আছে তা হল বাইন মাছের মতো সর্পাকৃতি ঈল মাছ। পলিনেশিয়ার পুবদিকের প্রত্যন্ত দ্বীপ ঈস্টার দ্বীপে নারকেল গাছ ও ঈল মাছ নেই, সেখানেও রয়েছে এই রূপকথাটি। অর্থাৎ হাওয়াই দ্বীপ ছাড়া উত্তরে মোরেল, দক্ষিণে কারমাডেক, পশ্চিমে নানোমিয়া এবং পুবে ঈস্টার দ্বীপ সর্বত্র এই রূপকথা ছড়ানো। এই বিশাল বিচ্ছিন্ন দ্বীপময় এলাকায় এই রূপকথার যে জনপ্রিয়তা' তা আর কোনো একটি রূপকথার ক্ষেত্রে দেখা যাবে না। 'নারকেল গাছ রূপকথায় যে সুন্দরী মেয়ে রয়েছে সে ভয় ভাঙবার পরে মাছরূপী দেবতাকে ভালোবেসেছে। এই প্রেম বড় মধুর। মধুর প্রেমের পরিণতি বড় ভয়াবহ হল নিঃসন্দেহে, কিন্তু প্রেমিক জীবন দিয়ে যে অমূল্য সম্পদ দিয়ে গিয়েছে তারও তুলনা নেই। কেননা, পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের মানুষের কাছে নারকেল গাছ হল জীবন। 'The coconut tree is a great provider. The young leaves can be plaited into baskets, hats and fans ; the husks used to make sennit for caulking canoes and for making ropes and mats. The scooped out dry

shells make containers and cups. The flesh can be eaten, the milk drunk and the oil rnbbed on the body. Even broken skulls were mended with a piece of coconut shell. (Oceanic Mythology : Roslyn Poignant. Page 48) রূপকথার মধ্যেও এর ইঙ্গিত রয়েছে। এই অর্থকরী ফলটিকে ঘিরে তাই জনপ্রিয় রূপকথাটির ব্যাপ্তি ঘটেছে। টোঙগা আদিবাসী তাদের কাভা উৎসবে সুর করে এই রূপকথা বলেন। সেখানে সুন্দরী মেয়ের নাম হিনা, হিনা উচ্চ বংশের পবিত্র কুমারী। থাকে সামোয়া দ্বীপে। কিন্তু স্বচ্ছ সরোবরে স্নান করবার সময় ঈল মাছ হিনাকে অপবিত্র করে, তার কুমারীত্বের অবসান ঘটায়। দ্বীপের ক্রুদ্ধ মানুষ ঈলকে হত্যা করে। তারা বেদনার গান গায় রূপকথার আদলে :

Kaloafu and Teuhie
It is said had a pet child,
But it was a god,
Fled they madly because of their fear.
They fled into the foaming sea.
The eel went to Samoa
And lived in Hina's water of life ;
By and by Hina became pregnant.
'Oh Hina ! Tell me who is your man ?
'It is the eel, the Shining One'.
Came all Samoa and cleaned,
And bailed the pool till it was empty ;
Lifted out the eel and cut it to pieces,
Cut up and ate while Hina wept.
'Bring here the head to me,
Then bury it in the burying place.
Nights five passed and then it appeared :
First came the leaf pod and fibre;
It was wonderful the way it grew ;

And the coconut with light husks
Were heavy with oil for their child.
Cut down its body for a sun shelter.
(Tongan Myths and Tales : E. W. Gifford.
Page 122.)

তাহিতি দ্বীপে অন্য একটি রূপ রয়েছে। হিনা ও তার প্রেমিক ঈল মাছ তুনার কাহিনী। পলিনেশীয় পৌরাণিক বীর মাউই ঈলকে হত্যা করে ঈলের মাথাটি হিনাকে দেয়। বলে, এটা মাটিতে পুঁতে দিও, এর থেকে যে গাছ হবে তাতে দ্বীপ সম্পদে ভরে যাবে। হিনা মাথাটি নিয়ে সরোবরের পাশে রেখে দিল। প্রেমিকের বিচ্ছেদে সে মাউই-র কথা ভুলে গেল, আনমনে স্নান করতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে তার সে কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি জল থেকে নিরাবরণ দেহে উঠে এল। ততক্ষণে ঈলের মাথা থেকে শেকড় বেরিয়ে মাটিতে ঢুকে পড়েছে। ছোট্ট নারকেল গাছের চারা জন্মেছে। যে সম্পদ হিনার একার হতে পারত, তা দ্বীপের সকলের সম্পদ হয়ে গেল।
এইভাবে হিনা ও ঈলকে ঘিরে নারকেল গাছ হবার রূপকথাটির নানা রূপ রয়েছে। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত রূপকথাটি সোসাইটি, কুক, অস্ট্রাল দ্বীপপুঞ্জের। এই রূপটির মধ্যেই মধুর প্রেমের কথা রয়েছে, দেবতার অপরূপ আত্মোৎসর্গের বিবরণ রয়েছে। কোনো প্রতিশোধ-স্পৃহা নয়, কোনো হত্যা নয়। আত্মবিসর্জনের কাহিনী। মৃত্যুর পরেও দয়িত-দয়িতা এক দেহে রয়ে গেল। নারকেল জল নোনতা। মেয়ের অশ্রুবিন্দু ও দেবতার মাথা দুয়ে মিলে প্রেম সম্পূর্ণতা পেল। এমন মধুর কাহিনী রোমান্টিক ভাবনা ছাড়া সম্ভব নয়। বাস্তবের একটি অতি-প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্মের কাহিনী বলতে গিয়ে লোকসমাজ নিবিড় পবিত্র অনন্ত চিত্র এঁকেছেন। লোককথার মধ্যে লোকসমাজের মৌখিক সাহিত্যের মহান ঐতিহ্যের পরিচয় এভাবেই পাওয়া যায়।

মোটিফ-ইনডেক্স

আদিবাসী লোককথা দ্বিতীয় খণ্ডে যে সাতাশটি লোককথা রয়েছে তার মোটিফ ইনডেক্স দেওয়া হল। লোকসমাজের মন ভৌগোলিক সীমারেখা, কৃত্রিম রাজনৈতিক মানচিত্রের বিভাজন কিছুই মানে না। এক বিশ্বজনীন লোকমানসের চিত্র ফুটে ওঠে মোটিফের মাধ্যমে। মানুষ একই বিবর্তনের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন। তাদের আসল পরিচয় গড়ে উঠেছে মানসিক ও মানবিক সেতুবন্ধনের মাধ্যমে। একটি লোককথাকে বিশ্লেষণ করলে একটি মূল বা একাধিক কাহিনী-অংশ পাওয়া যাবে, এই মূল কাহিনী-অংশই হল মোটিফ। এই খণ্ড খণ্ড মৌলিক কাহিনী-অংশই সমগ্র লোককথাকে অখণ্ড সূত্রে গড়ে তোলে। আবার প্রত্যেকটি কাহিনী-অংশেও একটি স্বাধীন বৈশিষ্ট্য থাকে। এই মোটিফ হল বিশ্বজনীন। লোককথার বিশ্বজনীনতা এভাবে সুস্পষ্ট হয়। এখানে Origin of milky way A 778 মোটিফটির উল্লেখ রয়েছে গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠার ছায়াপথ লোককথাটির মধ্যে। এইভাবে এই গ্রন্থের গল্পগুলির মধ্যে মোটিফগুলির সন্ধান মিলবে। স্টিথ টমসনের মোটিফ-ইনডেক্স অব ফোক লিটারেচার (৬ খণ্ড, ব্লুমিংটন, ১৯৫৫-৫৮) গ্রন্থ থেকে মোটিফগুলো নেওয়া হয়েছে।

Animal Kingdom	B 220
Animal in service to man	B 292
Animals carry men	B 550
Ascent to stars	A 761
Bridge of the gods	A 986
Clever dealing with a King	J 1675
Clever pratical retort	J 1500
Creation of the stars	A 760
Creation of man	A 1200
Creation of the Sun	A 710
Creation of animals	A 1700
Cruel stepmother	S 31
Cruel father	S 11
Cureses	M 400
Deluge	A 1010
Deeds punished	Q 200
Extraordinary companions	F 601
Extraordinary castle	F 771
Escape from deluge on mountain	A 1022
Escape by false plea	K 550
Endless tales	Z 11
Escapes	R 210
Flood as punishment	A 1018
Giant	F 531
Girl as helper	N 831

Beckwith, Martha Warren : Hawaiian Mythology. Yale University Press, 1940

Best, Elsdon : The Maori as he was. Wellington, New Zealand, 1952

Blackwood, B ; Both sides of Buka passage. Oxford, 1935

Burrows, E. G : A flower in my ear. University of Washington Press, Seattle, 1935

Chiera : Sumerian epics and myths. Chicago University Press, 1934

Christiansen, Reidar : The migratory legends, Helsinki, 1958

Crozet, Lieutenant : A Voyage to Tasmania New Zealand. (Eng. translation by H. Ling Roth), 1891

Demetrio, F ; Creation myths among the early Filipinos. Asian Folklore Studies, XXVII—I, 1935

Dixon, R. B : Mythology of Oceania (Vol 9) Cooper Square Pubs. Inc. New York, 1922

Eberhard, Wolfram : Chinese fairy-tales and folk-tales. London, 1937

Elkin, A. P : The Australian aborigines. Sydney, 1938

Gifford, E. W : Tongan myths and tales, Bernice P. Bishop Museum, Honolulu, 1924

Gill, W. W : Myths and songs from the south Pacific. London, 1876

Grey, George : Polynesian mythology. Whitcombe and Tombs, London, 1935

Hackin, J : Asiatic mythology (Eng. translation by F. M. Alkinson) George G, Harrap, London, 1935

Handy, E. S. C : Ancient Hawaiian civilization. Honolulu, 1933

Howitt, A. H : The native tribes of south-eastern Australia. Macmillan and co Ltd, London, 1904

Humphreys, C. B : The Southern New Hebrides. Cambridge University Press, 1926

Keigo Seki : Folktates of Japan (Eng. translation by Robert J. Adams) Chicago University Press, 1935

Landtman. G : Folktales of the Kiwai Papuans. Finnish society of literature, Helsinki, 1917

Lessa, W. A ; Tales from Atoll. Universiy of Californi 1935

Lim Siam-Tek : Tales from China. John Day Company, New York, 1944

Paskar, K. L : Australian legendary tales. London, 1897

Poignant, Roslyn : Oceanic mythology. Paul Hamlyn, London, 1935

Seligmann, C. S : The Melanesians of British New Guinea. Cambridge 1914

Smith, Evelyn : Myths aad legends of many lands, Thomas Nelson Ltd, London, 1930

Smith. S, P : Howaiki, London, 1921

Stair, J. B : Old Samoa. London, 1897

Streholw, T. G. H : Aranda traditions, Melbourne University Press, 1947

Thomson, B : The Fijians. London 1908

Thrum, T. G : Hawaiian Folktales, Chicago, 1907

Wheeler, G. C : Mono-Alu Folklore, Routledge, Kegan Paul Ltd, London, 1926

white, J : Ancient history of the Maori, Wellington, 1887